বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিসডিকশান)

রীট পিটিশন নং ৪৩১৩/২০০৯

ইন দি ম্যাটার অফঃ

ইহা বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি আবেদনপত্র;

এবং

ইন দি ম্যাটার অফঃ

মেজর জেনারেল কে, এম, শফিউল্লাহ ও অন্য একজন।

----দরখাস্তকারীদ্বয়

বনাম

বাংলাদেশ গং

----প্রতিবাদীগণ

জনাব মনজিল মোরসেদ, এ্যাড্‌ভোকেট্

----দরখাস্তকারীদ্বয় পক্ষে

জনাব মাহবুবে আলম, অ্যাটর্নি-জেনারেল সঙ্গে
জনাব মোস্তফা জামান ইসলাম, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল,
জনাব ইকবালুল হক এবং
বেগম মাহফুজা, এ,এ,জি,

---প্রতিবাদী সরকার পক্ষে

শুনানীঃ ৬ ও ৭ জুলাই, ২০০৯ইং

রায় প্রদানঃ জুলাই ০৮, ২০০৯ইং

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,বি,এম, খায়রুল হক
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

বিচারপতি এ,বি,এম, খায়রুল হকঃ

পটভূমিকা ঃ

ইহা জনস্বার্থমূলক একটি রীট্ মোকাদ্দমা।

মূলতঃ তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দান, বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ চিহ্নিত করতঃ সংরক্ষণ করিবার প্রার্থনা করিয়া অত্র রীট্ মোকাদ্দমাটি দায়ের করা হইয়াছে।

সূত্রপাত ও রুল জারী ঃ

অত্র রীট্ মোকাদ্দমার ১ নং দরখাস্তকারী একজন স্বনামধন্য মুক্তি যোদ্ধা এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সেনাপ্রধান। তিনি ১৯৫৫ সনে পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী হইতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করতঃ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে কমিশন লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেজর পদ মর্যাদায় জয়দেবপুরস্থ ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন্ কমান্ড পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯শে মার্চ তারিখে তাহার বাহিনীর দৃঢ়তার জন্য ব্রিগেডিয়ার আব্‌রার উক্ত বাহিনীকে নিরস্ত্র করিতে পারে নাই। মুক্তিযুদ্ধের প্রথমেই তিনি বিদ্রোহ করেন এবং সেক্টর কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাহাছাড়া, S-Force নামে একটি ইন্‌ফ্যান্ট্রী ব্রিগেডের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সনের ১৬ ই ডিসেম্বর তারিখে রমনা রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য হিসাবে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠান অবলোকন করেন। ১৯৭২ সনের ৬ই এপ্রিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনা প্রধান পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং ১৯৭৫ সনের ২২শে অগাষ্ট পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। তৎপর তাহাকে বৈদেশিক মন্ত্রনালয়ে বদলি করা হয় এবং তিনি ১৯৯১ সন পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পদ মর্যাদায় দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৯৬ সনে তিনি জাতীয় পরিষদে সাংসদ নির্বাচিত হয়েন।

২ নং দরখাস্তকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক। তিনি ১৯৭৪ সনে ইতিহাস বিভাগে একজন প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৩ সনে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তিনি বাংলা একাডেমির একজন ফেলো এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সিনেট সদস্য। তাহাছাড়া, তিনি ৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ইতিমধ্যে তাহার পান্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরুপ বহু সংখ্যক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উভয় দরখাস্তকারী নিখাদ বাঙালি। উভয়ই পাকিস্তান শাসনামল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাঙালির সৃষ্ট পাকিস্তানে বাঙালি জাতি কিভাবে নিগৃহীত হইত এবং কিভাবে ঘটনার বাঁকে বাঁকে ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন একজন সামরিক বিভাগে চাকুরীরত অবস্থায় অন্যজন ছাত্র অবস্হায়। ১ নং দরখাস্তকারী জীবন বাজী রাখিয়া মুক্তিযুদ্ধ করিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন। অন্যজন মুক্তিযুদ্ধকে তাহার লেখনীর

মাধ্যমে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করিলেন। পরবর্তীকালে উভয়ই বাঙালি জাতির ইতিহাস বিকৃতি প্রত্যক্ষ করিলেন এবং ঐতিহাসিক স্হানগুলি কিভাবে বেদখল হইয়া গেল তাহাও অত্যন্ত বেদনার সহিত অবলোকন করিলেন। তাহাদের এই বেদনার্ত উপলব্ধি হইতেই তাহারা তাহাদের বিজ্ঞ কৌশুলী মারফৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ঐতিহাসিক স্হানগুলি রক্ষা করিবার জন্য একটি Demand of Justice Notice ১৮-৬-২০০৯ তারিখে প্রদান করেন (এ্যানেকচার-বি)। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় বাংলাদেশ সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদের আওতায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্হানগুলি রক্ষণাবেক্ষণে বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব যাচঞা করিবার উদ্দেশ্যে অত্র রীট্ মোকাদ্দমাটি দায়ের করিলে অত্র আদালত সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের আওতায় ২৫-৬-২০০৯ তারিখে নিম্নলিখিত Rule Nisi প্রতিবাদীগণ বরাবরে জারী করে ঃ

> "Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why a direction should not be given upon the respondents to form a committee to identify the historic important places at Shuhrawardi Uddyan (the then rececourse maidan) at Dhaka, where the Pakistan Army surrendered before the Joint Command Force of Mukti Bahini and Indian Army on 16th December, 1971 and where Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman delivered the historic speech on 7th March, 1971, after demolishing the structures, if any, around those historical places and recover to it's original historic position and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.
>
> The Rule is made returnable on 5.7.2009.
>
> Since the learned Attorney General appears, let the matter be treated as ready, still the notices be served upon the respondents.
>
> Let the matter be fixed for hearing on 6.7.2009, at the top of the list."

৪ নং প্রতিবাদী পক্ষে ৭-৭-২০০৯ তারিখে হলফকৃত একটি এফিডেভিট দাখিল করিয়া দরখাস্তে উত্থাপিত বক্তব্য সমর্থন করেন।

পক্ষগণের আইনজীবী ও তাহাদের বক্তব্য ঃ

জনাব মনজিল মোরসেদ, এ্যাড্ভোকেট্, দরখাস্তকারীদ্বয় পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাহাকে সমর্থন করিয়া বক্তব্য পেশ করেন জনাব আব্দুল বাসেত মজুমদার, ড. রাবেয়া ভূঁইঞা, জনাব এ, এফ, এম, মেজবাহউদ্দিন ও জনাব শ. ম.

রেজাউল করিম, এ্যাড্‌ভোকেট্‌বৃন্দ। সরকার পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব মাহবুবে আলম, অ্যাটর্ণী জেনারেল এবং তাহাকে সহায়তা করেন জনাব মোস্তফা জামান ইসলাম, ডেপুটি অ্যাটর্ণী-জেনারেল।

জনাব মনজিল মোরসেদ, এ্যাড্‌ভোকেট, তাহার বক্তব্যের প্রারম্ভে বাঙালি জাতির ইতিহাস সংক্ষেপে তুলিয়া ধরেন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশ ও তৎপর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতির বঞ্চনার ইতিহাস এবং কিভাবে ধাপে ধাপে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী স্বাধীনতার দাবীতে পরিণত হইল তাহার বিবরণ তুলিয়া ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ৬ দফা দাবী উপস্থাপন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩রা মার্চ ও ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন, ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, ১৭ই জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা আগমন ইত্যাদি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া তিনি উক্ত ঐতিহাসিক স্থান সমূহ বাংলাদেশ সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করতঃ স্বমহিমায় রক্ষণ করিবার জন্য নিবেদন করেন। তিনি বলেন যে ১৯৭৫ সনের অগাষ্ট মাসের পর হইতেই উপরোক্ত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহ ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করিবার একটি নিশ্চিত প্রয়াস চলিয়া আসিতেছে যাহাতে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম বাঙালি জাতির গর্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন বিস্মৃত হয় এবং অবশেষে বিলুপ্ত হয়। সেই বিলুপ্তির হাত হইতে আমাদের জাতির ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্নগুলি সংরক্ষণ করিবার সাংবিধানিক দাবী লইয়াই অত্র দরখাস্তকারীদ্বয় এই রীট্‌ মোকাদ্দমাটি দায়ের করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও নিবেদন করেন যে মুক্তিযুদ্ধকালীন ৯(নয়) মাস ব্যাপি সময়ে বাংলাদেশে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ মানুষ শহীদ হইয়াছেন, কয়েক লক্ষ মহিলা ধর্ষিত ও নির্যাতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। তাহাদের সেই সকলের রক্তের বিনিময়ে, সম্ভ্রমের মূল্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়াছে। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ শুধুমাত্র বাঙালি হইবার অপরাধে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি নিবেদন করেন যে এই জাতি যদি সেই লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষের স্মৃতি রক্ষা করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধই ব্যর্থ হইবে, আমাদের স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়িবে, আমরা

একটি কৃতঘ্ন জাতিতে পরিণত হইব। সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদ নিরর্থক বাগাড়ম্বরে পরিণত হইবে।

জনাব আব্দুল বাসেত মজুমদার, ড. রাবেয়া ভূইঞা, জনাব এ, এফ, এম, মেজবাহউদ্দিন ও জনাব শ.ম. রেজাউল করিম, এ্যাড্ভোকেটবৃন্দ, দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাড্ভোকেট্ মহোদয়কে সমর্থন করিয়া বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

এ্যাটর্নি-জেনারেলে এর বক্তব্য ঃ

বাংলাদেশ সরকার পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি -জেনারেল মহোদয় একটি লিখিত বক্তব্য দাখিল করতঃ দরখাস্তকারীপক্ষে উত্থাপিত বক্তব্য সমর্থন করেন। তিনি তাহার লিখিত অন্যান্য বক্তব্যের সহিত বলেন ঃ

> “ ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশ্যে ৬ দফা প্রকাশ করেন এবং আপামর জনগণ তাঁর এই ৬ দফা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি জনগণকে সংগঠিত করতে থাকেন। কিন্তু ১৯৬৮ সনের জানুয়ারি মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু কেবল প্রবল গণআন্দোলনের মুখে সেনা শাসক আইয়ুব খান এই মামলা প্রত্যাহার করেন এবং ১৯৬৯ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারি দুপুর ১ টায় রেডিও মারফতে এই মামলা প্রত্যাহারের খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সনের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে তাঁকে গণ সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এক জনসভা আহবান করে এবং দৈনিক পাকিস্তানের স্টাফ রিপোর্টার ১৯৬৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাদের কাগজে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।
>
> ---
>
> ---
>
> তাঁর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর প্রত্যয়, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আকাঙ্খা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং এ ধরণের ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী বক্তৃতা যিনি যে মাঠে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন তার অবশ্যই ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং তা সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এই মাঠেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং এ বিষয়ে দৈনিক পাকিস্তানে ১৯৬৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে যে রিপোর্ট প্রকাশ হয় তা নিম্নরূপ ঃ
>
> ---

এইরূপ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যে ময়দানে ঘটেছে তা স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করারও সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব।

১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের ভিতরে আওয়ামী লীগ ১৬০ টি আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে এবং জাতীয় পরিষদের মহিলা আসনে পরোক্ষ ভোটে ৭টি আসন ও প্রাদেশিক পরিষদে পরোক্ষ ভোটে ১০টি আসন লাভ করে।

এই ঐতিহাসিক জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য। তিনি এই বিপুল বিজয়ের পরে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনতার সম্মুখে এই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ বাক্য পাঠ করানোর। এই শপথ অনুষ্ঠানে তিনিই পৌরহিত্য করেন এবং নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

বঙ্গবন্ধুর ১৯৬৯ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের বক্তব্যের মূল সূত্রের পুনরোল্লেখ আমরা এই শপথের মধ্যে খুঁজে পাই। এখানেও জনপ্রতিনিধিরা শপথ নিয়েছিলেন দেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র, মেহনতী মানুষের তথা সর্বশ্রেণীর জনগণের সম্মুখে। যার প্রতিধ্বনি আমরা পাই সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে, যেখানে উল্লেখিত হয়েছে "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"। পৃথিবীর ইতিহাসে জনগণের সম্মুখে শপথ বাক্য পাঠ করা তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানই প্রথম ঘটনা। সেদিক থেকে এ ঘটনার একটি আন্তজার্তিক মূল্যও আছে। সুতরাং সেই রেসকোর্স ময়দান, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এ শপথটি যদি শ্বেতপাথরে খোদাই করে রাখা হয় তা থেকে আমাদের বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্ম, আমরা কিভাবে দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জন করেছি তার সম্যক ধারনা পাবে; সুতরাং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপরোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করে সেই স্হানটি সংরক্ষন করা সরকারের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব।

এরপর যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি এই রেসকোর্স ময়দানে ঘটেছিল তা হলো উক্ত ময়দানে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ।

উক্ত ৭ই মার্চের ভাষন টেপ করা হয়েছিল এবং সেই ভাষনটি "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ" দলিলপত্র গ্রন্থের ২য় খন্ডে লিপিবদ্ধ আছে। এ ভাষনের কিছু অংশ উল্লেখ করলেই স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে, এই ভাষনটিই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক।

এই বক্তৃতাটি ছিল একটি অলিখিত বক্তৃতা অথচ তার বক্তব্য, ভাব, বাক্য বিন্যাস এবং নির্দেশনা ছিল অতুলনীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ছন্দময় তেজস্বী বক্তৃতার জুড়ী পাওয়া যাবে না এবং যারা এই বক্তৃতাকে রাজনীতির কবিতা বলেন, তারা একটুও বাড়িয়ে বলেন না। এই বক্তৃতায় যে জাতীয়তাবাদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা সংগ্রামী জনতা নয় তা নিজকে রক্ষা করার

জাতীয়তাবাদ। যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার কথা তিনি বলেছেন তা ভোটের গণতন্ত্র, এক মাথা এক ভোটের গণতন্ত্র। কোন চাপিয়ে দেবার গণতন্ত্র নয়। যে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন তা চাপিয়ে দেয়ার মত সমাজতন্ত্র নয়। সর্বোপরি তিনি যে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলেছেন তাতে সব ধর্ম ও সর্ব ভাষার লোকদের সহাবস্হানের কথা তিনি বলেছেন এবং এই সবকিছুরই প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের ১৯৭২ এর সংবিধানে। আমাদের একটি সৌভাগ্য যে কিছু সাহসী ব্যক্তি ঐ জনসভার দৃশ্য ফিল্মে ধারণ করেছিলেন এবং সে চলমান দৃশ্য দেখলে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল সে জনসভায়। সুতরাং সেই জনসভা যে স্হানে হয়েছিল তা চিহ্নিত করা আমাদের সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য এবং সেই ইতিহাসকে আপামর জনসাধারনকে জানানোর জন্য বঙ্গবন্ধু যে স্থানে এই কালজয়ী ভাষণ দিয়েছিলেন সে স্থান চিহ্নিত করে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি পাথরে উৎকীর্ণ করে জনসাধারণের নিকট প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের শিকড় সন্ধানের সুযোগ পাবে।

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ থেকে পরবর্তী ৯মাস পাক বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসর আলবদর, আলসামস্ ও রাজাকাররা এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে এবং লক্ষাধিক মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু পরিশেষে তাদেরকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর নিকট পরাজিত হতে হয়েছে এবং আত্মসমর্পন করতে হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পাকবাহিনী তাদের সর্বাধিনায়কের নেতৃত্বে ঐ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করেছিল এবং এই ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান তথা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই জাতি উৎযাপন করে তাদের ঐতিহাসিক বিজয় এবং অবলোকন করে হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারী পাকহানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের দৃশ্য। কাজেই এই ময়দান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চুড়ান্ত বিজয় ও গৌরবের সাক্ষী। যে স্থানে পাকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক আত্মসমর্পন করেছিল সেই স্হান চিহ্নিত করে তথায় আত্মসমর্পনের দলিলে উল্লেখিত বাক্যগুলি শ্বেত পাথরে উৎকীর্ণ করে জনসাধারণের নিকট প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা বর্তমান সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এতে করে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত এই ঐতিহাসিক স্থান অবলোকন করার সুযোগ পাবে। এরূপ একটি গর্বের, গৌরবের স্থানকে যদি চিহ্নিত করা না হয় তা হবে ইতিহাসের কাছে আমাদের চরম উদাসীনতা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পরে বাঙালি জাতির চরম উদ্বেগ ছিল বঙ্গবন্ধু কবে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরবেন। জাতির এই অধীর প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি। এই দিনে বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানের কারাগার থেকে প্রথমে লন্ডন তারপরে দিল্লী হয়ে ঢাকা ফিরেন। এইদিনে তিনি

এয়ারপোর্ট থেকে তাঁর বাসস্থান কিংবা পরিবারের সাথে দেখা না করেই চলে এসেছিলেন এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তথা তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে, তাঁর প্রাণপ্রিয় বাঙালি জনগণের মাঝে। অশ্রুসিক্ত নয়নে উনি রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ফিল্মে ধারণ করা আছে। বঙ্গবন্ধুর এই প্রত্যাবর্তনটি ছিল আপামর বাঙালিদের জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং যার নিরব সাক্ষী তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সুতরাং ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী উক্ত সভাস্থলটি চিহ্নিত করা এবং তার সংরক্ষণ করা ইতিহাস রক্ষার খাতিরে একান্ত প্রয়োজন।

একটি ময়দান যা স্বাধীনতার পূর্বে রেসকোর্স এবং স্বাধীনতার পরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হিসাবে পরিচিত এবং যেখানে পাঁচ-পাঁচটি ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং সমগ্র বাঙালি জাতি তা প্রত্যক্ষ করেছে যা আমাদের জনজীবনের সাথে তথা মুক্তিযুদ্ধের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই ঘটনার সমূহ অস্বীকার করার কোন উপায় নেই এবং অস্বীকার করলে তা হবে দেশপ্রেমহীন সামিল। জনগণকে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করার জন্য ও আপামর জনসাধারণকে রাজনীতি সচেতন করা জন্য সাবেক রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সংঘঠিত উপরোক্ত ঘটনা সমূহের স্থান চিহ্নিত এবং সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের তথা প্রতিটি নাগরিকের একান্ত দায়িত্ব বলে আমি মনে করি এবং এ বিষয়ে আদালতের আদেশ দেশের মঙ্গলের জন্য একান্ত প্রয়োজন।”

তিনি আরও বলেন যে ৩০(ত্রিশ) লক্ষ শহীদের রক্তাপ্লুত এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান, ঢাকা শহর ও আশে পাশের বিভিন্ন স্থানে টর্চার সেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর আল-বদর, আল শাম্‌স, রাজাকার ইত্যাদি বাহিনী বাঙালিদের লইয়া গিয়া অকথ্য অবর্ণনীয় ও চরম অত্যাচার ও নির্যাতন করতঃ রায়ের বাজার, মিরপুর ও বিভিন্ন বধ্যভূমিতে তাহাদিগের লাশ নিক্ষেপ করে। এইরূপ নির্মম হত্যাকান্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সমগ্র বাংলাদেশে এইরূপ অসংখ্য বধ্যভূমি রহিয়াছে যেগুলি চিহ্নিত করতঃ রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্য প্রয়োজন। তিনি নিবেদন করেন যে যদিও ঠিক এইরূপ প্রার্থনা করিয়া Rule টি জারী হয় নাই কিন্তু যেহেতু সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদের আলোকে Rule টি জারী হইয়াছে এবং যেহেতু ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বিভিন্ন স্থানে এইরূপ নৃশংস কালো অধ্যায় অঙ্কায়িত হইয়াছে যাহাদের অতৃপ্ত আত্মা হয়তো এখনও ‘সব ঝুট হায়’ বলিয়া হাহাকার করে, সর্বোপরি, তিনি

নিবেদন করেন যে দেশের বর্তমান প্রজন্ম ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জানা প্রয়োজন যে তাহারা এখন যে স্বাধীন দেশে বসবাস করে সে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে ১৯৭১ এর প্রজন্মের কত ত্যাগ, কত আত্মবলিদান প্রদান করিতে হইয়াছিল। সেইহেতু টরচার সেল ও বধ্যভূমিগুলি চিহ্নিত করতঃ সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি নিবেদন করেন।

দরখাস্তকারীদ্বয়ের বক্তব্য ঃ

দরখাস্তকারীদ্বয় উভয়ই বাংলাদেশের বিদগ্ধ নাগরিক এবং সমাজে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই কারণে বর্তমান রীট্ মোকাদ্দমায় উত্থাপিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তাহাদের ব্যক্তিগত অভিমত সরাসরি তাহাদের নিকট হইতে শুনিতে চাওয়া হয়। অতঃপর, উভয় দরখাস্তকারী ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত হইয়া অত্র মোকাদ্দমা দায়েরের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

১ নং দরখাস্তকারী বলেন যে বাংলাদেশ ৩৮ বৎসর পূর্বে স্বাধীন হইলেও কিভাবে এই স্বাধীনতা অর্জিত হইল সে সম্বন্ধে বর্তমান প্রজন্ম প্রকৃত পক্ষে কিছুই জানে না। তাহারা জানে না যে কাহাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীন হইয়াছিল। তবে তাহারা নিজেরাও এই ব্যর্থতার ভাগীদার বলিয়া স্বীকার করেন। কারণ এক দিকে তাহারা বর্তমান প্রজন্মকে এই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, অন্য দিকে দুর্ভাগ্য বশতঃ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি মুক্তিযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় গৌরবকে মুছিয়া ফেলিতে সর্বদা তৎপর ছিল। বিশেষ করিয়া ১৯৭৫ সনের ১৫ই অগাষ্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করিবার জন্য পর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করিবার জন্য নিশ্চিত প্রচেষ্টা চালান হয়। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে বাঙালি জাতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহ পরিবর্তন করা হয় বা ধ্বংস করা হয়। রমনা রেসকোর্স ময়দান বা বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যান তেমনই একটি ঐতিহাসিক স্থান। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত এই উদ্যানের সরাসরি সম্পৃক্ততা রহিয়াছে। এই ময়দানেই ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দিয়াছিলেন। এই স্থানেই ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তানী সেনানীগণ আত্মসমর্পন করিয়াছিল। এই স্থানেই পাকিস্তানের বন্দিদশা হইতে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭১ সনের ১০ই জানুয়ারি ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গবন্ধু লক্ষ লক্ষ জনতার

সম্মুখে ভাষণ দান করেন। এই সকল স্থানগুলি ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। এই সকল স্থানগুলি আমাদের জাতীয় গর্বের স্থান অথচ ৩৮ বৎসরেও কোন সরকার ঐ সকল স্থানগুলিকে চিহ্নিত করতঃ যথাযথ মর্যাদা প্রদান করিয়া রক্ষাণাবেক্ষণের কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। বরঞ্চ ঐ সকল ঐতিহাসিক স্থান সমূহে শিশুপার্ক নির্মাণ করিয়া আমাদের ইতিহাসকে মুছিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইয়াছে। অথচ শিশুপার্ক অন্য যে কোন স্থানেই হইতে পারিত। কিন্তু, তিনি নিবেদন করেন যে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট হইতে এই সকল ঐতিহাসিক স্থান সমূহ আড়াল করিবার অসৎ উদ্দেশ্যেই সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের উক্ত স্থানে শিশু পার্ক নির্মাণ করা হইয়াছে।

২ নং দরখাস্তকারী আমাদের আহ্বানে অন্যান্য বক্তব্যের সহিত বলেন ঃ

১. --

২. --

৩. এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আবেদন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতা যে স্থান থেকে দিয়েছিলেন এবং ১৬ই ডিসেম্বর যে স্থানে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেছিল তা চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ এবং তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা অপসারণ।

৪. ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু, আমরা মনে করি দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার ডাক দিয়েছিলেন ৭মার্চ। ৭ মার্চের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত সত্বেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে সমান্তরাল একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল যে রাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারী প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর একক কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিলন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে বলে জানা নেই। বাঙালিদের রাষ্ট্রের তখন থেকেই যা স্বীকৃত হয়েছে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষনার মাধ্যমে। এই বক্তৃতা বাঙালিদের প্রস্তুত করেছে মুক্তিযুদ্ধের জন্য, ন' মাসের যুদ্ধে শক্তি যুগিয়েছে বাঙালিকে, অনুপ্রানিত করেছে পরবর্তী জেনারেশনকে।

৫. যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে অজেয় মনে করা হতো সে বাহিনীও প্রায় একই স্হানে আত্মসমর্পন করে। প্রায় এক লক্ষ সেনা ও সিভিল কর্মচারি আত্মসমর্পন করে যৌথ বাহিনীর কাছে যা বিরল একটি ঘটনা। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস ও আজকের রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক সৃষ্টি। পৃথিবীর আর কোনো দেশে বিজয় দিবস ঘোষণা

করা হয়েছে বলে জানা নেই। এটি তাৎপর্যময় এ কারনে যে, বাঙালি জাতি ও বাঙালি রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় ১৬ ডিসেম্বর।

৬. এ পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি রাষ্ট্র ও জাতির জন্য স্হান দু'টি শুধু ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্নই নয়, তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতি নিদর্শনও বটে। একই সঙ্গে উল্লেখ্য, এ তাৎপর্যময় স্হান সমূহকে বিকৃত করা হয় লেঃ জেনারেল জিয়ার সময় যার সবচেয়ে বড় অপরাধ বাঙালিদের সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন অস্ত্রের সাহায্যে। ------------------------। বিএনপি আমলে একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী ঐ তাৎপর্যময় স্থানে শিশুপার্ক নির্মাণ সম্পর্কে লিখেছিলেন-" পৃথিবীর কোথাও মুসলমানদের পরাজয়ের চিহ্ন নেই। ছিল শুধু এই দেশে। সেই চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়া এখানে শিশুপার্ক তৈরির নির্দেশ দিয়ে ছিলেন" (যুগান্তর, ৯.১২.১৯৯৭ (১৯৯৮)। উল্লেখ্য জনাব চৌধুরী জিয়াউর রহমানের আদর্শের পূজারী। এতে সত্যতা আছে এই কারণে, মুসলমান বলতে এখানে হানাদার পাকিস্তানীদের বোঝানো হয়েছে এবং আমরা দেখেছি জিয়ার আদর্শের সঙ্গে ১৯৭১ পূর্ববর্তী আদর্শের মিল আছে যা আমাদের রাষ্ট্র গঠন, মূলনীতি ও স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৭. মার্চ বক্তৃতার মূল বৈশিষ্ট্য নিরস্ত্রদের নিয়ে সশস্ত্রদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। সেটি আমাদের ইতিহাসের মূল ঘটনা। রাষ্ট্র ছিল আগে সশস্ত্রদের দখলে। ১৬ ডিসেম্বর সেই নিরস্ত্রদের সংগ্রাম জয়লাভ করে। পরবর্তীকালে সশস্ত্রদের আদর্শের অনুসারী জিয়া প্রতিনিধিত্ব করেছেন সশস্ত্রদের। সুতরাং, সশস্ত্রদের (পাকিস্তানি/মুসলমান) এ পরাজয় তিনি মেনে নিতে পারেন নি। এ পরিপ্রেক্ষিতেও বলতে পারি তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতি নিদর্শন/স্থানকে বিকৃত ও বিনাশ করা হয়েছে যা ২৪ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি।

৮. বাংলাদেশের সমস্ত গণ আন্দোলন ও বাংলাদেশ সৃষ্টির মূল কারণ, পকিস্তানি শাসকদের বাঙালিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বিনাশের চেষ্টা, ১৯৪৮ থেকে যার শুরু। মুক্তিযুদ্ধের পেছনে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যার মূল দ্রোহ তা কাজ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কাছে শুধু ইতিহাসের মাইল ফলক নয়, এর চেতনা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার এবং এই ইতিহাসে ৭ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে ২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ও এই ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৯. প্রশ্ন উঠে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি আদালতে গ্রাহ্য কিনা। অবশ্যই গ্রাহ্য। প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম তাঁর Constitutiional Law of Bangladesh – এ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্যান্য দেশের হাইকোর্টের রায়ের নজির নিয়ে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ এখানে আছেন, ফলে এ বিষয়ে কিছু বলা আমার অনুচিত।

১০. আমি শুধু বলব, আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়েছে এই মূলনীতির আলোকে, এবং রাষ্ট্রের অনেক কাজ পরিচালিত হচ্ছে এই নীতির দ্বারা। ২২ অনুচ্ছেদে আছে, "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গ সমূহ হইতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।" সুপ্রীম কোর্টের এই বিষয়ক রায়ের ভিত্তি নিশ্চয় ২২ অনুচ্ছেদ। -------------বাংলাদেশের যাবতীয় আইনের ভিত্তিও হতে হবে এই মূলনীতি।

১১. --

১২. --

১৩. আমাদের যে জাতিসত্ত্বা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর তারিখে তাকে আইডেনটিটি বা আত্মপরিচয় বলতে পারি। তার বিনাশ decency ও dignity র সঙ্গে অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। জাতি সত্বা নির্ধারন এবং রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে 'tradition, culture and heritage' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং এ সম্পর্কিত যে কোন উপাদানের অপসারণ বা বিনষ্টিকরন বা বিকৃতিয়ান সাংঘর্ষিক। এ ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সংবিধানের তৃতীয়ভাগের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই।

১৪. ---------ঐতিহাসিক তাৎপর্যময় স্হান বিকৃতিয়ান বা বিনাশকরনকে আমি মনে করি আমাদের আত্মসম্মান ও মর্যাদায় পদাঘাত ও আমাদের অপমান করা হয়েছে। এই অপমান থেকে মুক্তির জন্য আমি যুদ্ধের নয় আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি যেখানে নিরস্ত্রদের আধিপত্য রক্ষা করা যায়। আর এ রাষ্ট্রের যদি নিরস্ত্রদের অধিকার রক্ষার কোনো কবচ না থাকে তবে তা হবে এ রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি সমূহের মূলে কুঠারাঘাত।

১৫. আবেদনে উল্লিখিত হয়নি তবুও প্রাসঙ্গিক বিধায় আরেকটি বিষয়ের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আদালতের যদি মর্জি হয় তা হলে স্বতপ্রনোদিত হয়ে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে পারেন। যেটি হচ্ছে বধ্যভূমি ও গণকবর প্রসঙ্গ। আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছিল এ রাষ্ট্রের জন্য। এ ৩০ লক্ষের অধিকাংশ অজানা এবং বিভিন্ন বধ্য ভূমি তাদের স্মৃতি। ১৯৯৬ সালে যে সরকার ছিল সে সরকার বধ্য ভূমি সংরক্ষনের একটি প্রকল্প গ্রহন করেছিল, পরবর্তী সরকার তা বাতিল

করে দেয় যা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য মুছে দেয়ার সামিল। এই শহীদের স্মৃতি সংরক্ষনের জন্য গ্রাম পর্যায় থেকে বধ্য ভূমি ও গণকবর সমূহ চিহ্নিত ও সংরক্ষনের জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয়া হোক। এই সকল স্মৃতি বা ইতিহাসের তাৎপর্যমন্ডিত স্হান সমূহ সংরক্ষিত হলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানবে, স্বাধীনতা শুধু চার অক্ষরের শব্দ মাত্র নয়, এর পেছনে আছে এক সাগর রক্ত আর অশ্রু আর বেদনা।

প্রাথমিক আলোচনা ঃ

দরখাস্তকারীদ্বয় এবং দরখাস্তকারী ও প্রতিবাদী পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ এ্যাড্‌ভোকেট্ মহোদয়গণকে শ্রবন করা হইল এবং দরখাস্ত ও এফিডেভিট্ এবং এতদসংক্রান্ত দাখিলকৃত কাগজাদি, পুস্তক, গ্রন্থাদি ও সংবাদপত্র সমূহ পর্যালোচনা করা হইল।

প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারীদ্বয় সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদের আওতায় প্রাক্তন রমনা রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যাহা আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন সময়ে অঙ্কায়ীত হইয়াছিল তাহা সংরক্ষণ করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদ নিবরূপঃ

> "২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতি নিদর্শন, বস্তু বা স্থান সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

অত্র রীট্ মোকদ্দমাটি সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদের আওতায় মুলত প্রাক্তন রমনা রেসকোর্স ময়দান, বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ চিহ্নিত করতঃ সংরক্ষণ করিবার জন্য সরকারের উপর নির্দেশনা প্রার্থনা করিয়া দায়ের করা হইয়াছে।

সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ করা হইতে রক্ষা করিবার নির্দেশনা প্রদান করিয়াছে ঃ

ক) বিশেষ শৈল্পিক স্মৃতি নিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহ

খ) ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতি নিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহ।

রমনা রেসকোর্স ময়দান বহু পূর্ব মোগল আমল হইতেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। মোগল আমল হইতে ব্রিটিশ রাজ এর শেষ সময় পর্যন্ত ইহার চতুর্পার্শে বিভিন্ন বিবর্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতীয়মান হয় যে ঢাকাস্থ মোগল ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ণনা করিতে গেলে অবশ্যম্ভাবীরূপে রমনা রেসকোর্স ময়দানের কথা উঠিয়া আসিবে এবং এই ময়দান বহু পূর্ব হইতেই ইতিহাসের অংশ হইয়া রহিয়াছে।

অত্র রীট্ মোকাদ্দমাটিতে প্রাথমিকভাবে রমনা রেসকোর্স ময়দান এর যে স্থানগুলিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ তারিখে তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করিয়াছিল সেই স্থানগুলি চিহ্নিত করতঃ উক্ত স্থানগুলি ঐতিহাসিক স্থান হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

রীট্ মোকাদ্দমাটি শুনানীর সময় অবশ্য দরখাস্তকারী পক্ষে উপরোক্ত দুইটি তারিখ ব্যতিরেকেও উক্ত ময়দানে ১৯৪৮ সন হইতে অনুষ্ঠিত আরও কয়েকটি সভার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা তুলিয়া ধরিয়া উক্ত স্থানগুলিও চিহ্নিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ প্রার্থনা করেন। তাহাছাড়া, ১৯৭১ সনের নয়মাস যুদ্ধকালীন সময় যে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ নিরস্ত্র মানব সন্তানকে অকারণে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বিভিন্ন জায়গায় পুতিয়া রাখা হইয়াছে সেই সকল স্থানগুলিও চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করিবার জন্য মৌখিক প্রার্থনা জানান হয়। এই প্রার্থনা সম্পর্কে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাটর্ণী জেনারেলের বক্তব্য আহ্বান করিলে তিনি বলেন যে মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। এই রীট্ মোকাদ্দমাটিতে যদিও প্রাথমিকভাবে মাত্র দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে নির্দেশনা প্রার্থনা করা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতির এই অর্জন সংক্রান্ত সকল শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধেই দিক নির্দেশনা প্রয়োজন বলিয়া তিনি নিবেদন করেন। ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর ব্যতিরেকে ১৯৪৮ সনের ২১শে মার্চ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ভাষণ, ১৯৬৯ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আগারতলা মোকাদ্দমা হইতে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত শেখ মুজিবের দিক নির্দেশনা মূলক ভাষণ, ১৯৭১ সনের ৩রা জানুয়ারি তারিখে তদানিন্তন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হইতে জাতীয় পরিষদে ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণের ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন

করিবার শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান, পাকিস্তান হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় আগমন করতঃ ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারির ভাষণ এবং ১৭ই মার্চ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ এর স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দরখাস্তকারীর প্রার্থনা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল পরিপূর্ণ সমর্থন করেন।

বধ্যভূমি সম্বন্ধে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাড্‌ভোকেট্ মহোদয় এবং প্রতিবাদী পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি -জেনারেল মহোদয় উভয়ই বলেন যে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানব সন্তান গণহত্যার স্বীকার হইয়াছিলেন তাহারা এই বাংলাদেশেরই সন্তান। শুধুমাত্র বাঙালি হইবার অপরাধে, বাংলা ভাষায় কথা বলিবার অপরাধে তাহাদিগকে একটি নীল নকশার আওতায় পরিকল্পিতভাবে ধারাবাহিকতার সহিত হত্যা করা হয়। বিজ্ঞ এ্যাড্‌ভোকেট্ মহোদয়গণ বলেন যে, যেহেতু বাংলাদেশের জন্যই তাহারা বাংলাদেশেরই বিভিন্ন স্থানে প্রাণ দিয়াছেন সেহেতু তাহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের অন্তর্গত হইয়াছেন এবং যেহেতু তাহাদেরই লক্ষ কঙ্কালের উপর আজ এই বাংলাদেশ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সেইহেতু তাহাদের স্মৃতি রক্ষা করাও আমাদের জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে বর্তমান রীট্ মোকাদ্দমায় দরখাস্তকারীদ্বয়পক্ষে উপস্থিত এ্যাড্‌ভোকেট মহোদয় ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্ট বার এ্যাসোয়িশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারী ও বেশ কয়েকজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারী এবং প্রবীন আইনজীবিকিগণ দরখাস্তকারী পক্ষের উপরোক্ত আবেদনের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বর্তমান রীট্ মোকাদ্দমাটি একটি সাধারণ মোকাদ্দমা নয়। ইহা কোন নির্দিষ্ট দুইপক্ষের মধ্যে কোন বিশেষ তর্কিত আদেশ লইয়া মোকাদ্দমা নয়। ইহা একটি জনস্বার্থমূলক মোকাদ্দমা। ইহার ১ নং দরখাস্তকারী আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'বীর উত্তম' প্রাপ্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা নায়ক। ২ নং দরখাস্তকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন প্রথিতযশা অধ্যাপক। ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের উপর তাহার প্রচুর মৌলিক অবদান রহিয়াছে। বর্তমান মোকাদ্দমায় দরখাস্তকারীগণের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নাই। বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিলিয়মান স্মৃতি সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের এই প্রচেষ্টা।

প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদ বাঙালি জাতির ইতিহাস সংরক্ষণের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত করিলেও এ সম্বন্ধে কোন পদক্ষেপ এ যাবত কাল কোন সরকার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহা সরকারের তথা এই জাতির ইতিহাস বিমুখতার পরিচয় অথচ রাষ্ট্রের নিজস্ব ইতিহাস ব্যতিরেকে বিশ্বের সভ্য রাষ্ট্র সভায় আমরা সভ্যতার নিরিখে নিম্নগামী যদিও বাঙালি সভ্যতার সংস্কৃতি দুইহাজার বৎসরেরও পুরাতন । সর্বোপরি বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও চরমভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। শুধু তাহাই নহে, সংবিধানের নির্দেশিকাও সচেতনভাবে অমান্য হইতেছে।

এমত অবস্থায় যেহেতু সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে ঐতিহাসিক স্থান সমূহ বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষণাবেক্ষণ করণ, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সেহেতু পক্ষগণের দাবীকৃত রেস্‌কোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত ৫ (পাঁচ)টি সভা ও দুইটি অনুষ্ঠান সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদের আওতায় 'ঐতিহাসিক' এই শর্ত পূরণ করে কিনা তাহা বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইল।

রমনা রেসকোর্স ময়দান ঃ

এখানে বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে রমনা রেসকোর্স ময়দান বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। মোগল আমলেও রমনার অস্তিত্ব ছিল। ফার্সি ভাষায় 'রমনা' শব্দের অর্থ সবুজ ঘাসে ঢাকা ময়দান। ইংরেজ আমলে ঘন জঙ্গল পরিস্কার করিয়া রেসকোর্স তৈরী করা হয়। বঙ্গভঙ্গের পর ইহার চতুর্পাশে ব্রিটিশ রাজের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণের বাস ভবন নির্মান করা হয়। ১৯৪৭ সনে ভারত ভাগের সময়ে ও পাকিস্তান আমলেও এখানে ঘোড়াদৌড় হইত। বাংলাদেশের ইতিহাসে রমনা রেস্‌কোর্স ময়দান এক বিশেষ স্থান দখল করিয়া আছে। এই ময়দানে বহুবার এই জাতির ভাগ্য নির্ধারণ হইয়াছে। মহাকালের ন্যায় বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হিসাবে রহিয়াছে এই ময়দান।

১৯৪৮ সনের ২১শে মার্চ তারিখের ভাষণ ঃ

১৯৪৮ সনের ২১শে মার্চ তারিখে এই ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তান জাতির পিতা (কায়দে আজম) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নিকট হইতে উপস্থিত জনতা বিমূঢ় হইয়া শ্রবণ করে যে পাকিস্তানের ৫৬% শতাংশ বাঙালি

জনগোষ্ঠী সম্বলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ভাষা হইবে বাংলার পরিবর্তে উর্দু। পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ৭(সাত) মাসের মাথায় বাঙালি চেতনা ও বিবেকে এই প্রথম একটি প্রচন্ড ধাক্কার সম্মুখীন হইল।

উল্লেখ্য যে ভারত বিভক্তির বহু পূর্ব হইতেই রাষ্ট্র ভাষা বাংলা হইবে না উর্দু হইবে তাহা লইয়া মৃদু বিতর্ক ও লেখালেখি হইতেছিল তবে লাহোর প্রস্তাব অনুসারে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দুইটি অঞ্চল লইয়া দুইটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হইবার দাবী থাকায় ইহা লইয়া তখন তেমন কোন আলোড়ন সৃষ্টি হয় নাই। তবে একক পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন হইলে এবং ভারত বিভক্তির তারিখ ১৯৪৮ হইতে ১৯৪৭ সনে আগাইয়া আসিলে এই প্রসঙ্গ আবারও আলোচনায় আসে। ১৯৪৭ সনের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহ্মেদ পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হওয়া উচিৎ বলিয়া মত প্রকাশ করিলে আবারও বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার যৌক্তিকতা যুক্তি প্রমানসহ উপস্থাপন করেন। এই সকল আলোচনা চলিতে থাকা অবস্থায় ১৪ই অগাষ্ট ভারত ভাগ হয় এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। ১ লা সেপ্টেম্বর ঢাকায় তমদ্দুন মজলিশ নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থা বাংলা ভাষার স্বপক্ষে বিভিন্ন প্রচার আরম্ভ করে। ১৯৪৭ সনের ৫ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের তদানিন্তন রাজধানী করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিবার সুপারিশ করা হয়। পরের দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্টভাষা দাবী করা হয়। ছাত্র সমাজের এই প্রতিবাদ সমাবেশে বাঙালি জনগোষ্ঠীও ধীরে হইলেও একাত্মতা প্রকাশ করিতে থাকে। এই সময়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। উক্ত সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান আরম্ভ করে এবং কয়েক হাজার স্বাক্ষর সহ একটি স্মারক লিপি ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়।

১৯৪৮ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। উক্ত অধিবেশনে বিরোধী দলের শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজী ও উর্দুর সহিত বাংলা ভাষাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসাবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন [বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র (দলিলপত্র), প্রথম খন্ড, পৃঃ ৫৪-৫৫)] ঃ

" The language of the State should be such which can be understood by the common man of the State. The Common man of the State numbering four crores and forty millions find that the proceedings of this Assembly which is their mother of parliaments is being conduct in a language, Sir, which is unknow to them. Then, Sir, English has got an honoured place, Sir, in Rule 29. I know, Sir, English has got an honoured place because of the International Character.

But, Sir, if English can have an honoured place in Rule 29 that the proceedings of the Assembly should be conducted in Urdu or English why Bangalee, which is spoken by four crores forty lacks of people should not have an honoured place, Sir, in rule 29 of the procedure Rules. So, Sir, I know I am voicing the sentiments of the vast millions of our State and therefore Bengalee should not be treated as a Provincial Language. If should be treated as the language of the State. And therefore, Sir, I suggest that after the word 'English', the words "Bengalee' be inserted in Rule 29..."

বিরোধী দলীয় সদস্যগণ তাহাকে সমর্থন করিয়া বক্তব্য প্রদান করিলেও মুসলিম লীগ দলের কোন বাঙালি সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সমর্থন করিয়া বক্তব্য রাখেন নাই, বরঞ্চ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী ও খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার বিপক্ষে এবং উর্দুর পক্ষে জোরাল বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। ইহাতে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ক্ষুব্দ হয় এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ধর্মঘট পালন করে। ২রা মার্চ তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় এবং ১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐদিন সচিবালয়ে পিকেটিং করা অবস্হায় শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন। স্বাধীনতার মাত্র ৭ (সাত) মাসের মাথায় এই সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন তীব্রতর হইতে থাকিলে সরকার ছাত্র নেতৃবৃন্দগণের সহিত আলোচনা করতঃ একটি চুক্তিতে আসিতে বাধ্য হয়। ১৬ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সংগ্রাম পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং অ্যাসেম্বলি ঘেরাও কর্মসূচি লওয়া হয়। শেখ মুজিব মিছিলের পুরোভাগে থাকিয়া সমগ্র মিছিল পরিচালনা করেন। অ্যাসেম্বলী ভবন গেটে তাহারা প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সাক্ষাৎ প্রার্থী হন কিন্তু পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ করিয়া মিছিল ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। বহু সংখ্যক ছাত্র গুরুতররুপে আহত হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন ১৭ই মার্চ প্রদেশব্যাপী শিক্ষায়তনে ব্যাপক ধর্মঘট হয়। এইরুপ বিক্ষুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেই ১৯শে মার্চ তারিখে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আগমন

করেন। ২১ শে মার্চ তারিখে রেস্‌কোর্স ময়দানে তিনি একটি নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা প্রদান করেন। ভাষা প্রসঙ্গে আসিয়া তিনি ঘোষণা করেন (দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড, পৃঃ৭৮-৮৪)ঃ

> "............let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Any one who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without one State Language, no Nation can remain tied up solidly together and function. Look at the history of other countries. Therefore, so far as the State language is concerned, Pakistan's language shall be Urdu." (অধোরেখা প্রদত্ত)

বাঙালি জাতির ভোটের শক্তিতে পাকিস্তান অর্জন সম্ভব হইয়াছিল। এই পাকিস্তানে বাঙালি তাহাদের ভোটের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা সর্বোপরী সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা একান্তভাবেই কামনা করিয়াছিল। বিভিন্ন আন্দোলন সর্বশেষ পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে তাহারা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয় স্বাধীন মানুষ হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল। তাহাদের সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতিদ্বারা তাহারা তাহাদের ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা প্রদানে পাকিস্তান সরকারের অনীহা ও বিভ্রান্তিকর অবস্থানের দরুণ বাঙালি মাত্রই বিস্মিত হইতেছিল কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ৫৬% অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্বেও ইহাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা প্রদান না করিয়া একটি প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গণ্য করিবার কোন যৌক্তিকতা স্বাভাবিক ভাবেই তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

এইরূপ পরিস্থিতিতে জিন্নাহ যখন একমাত্র উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা প্রদান করিলেন তখন এই রমনা রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছাত্র-জনতা হতবাক হইল। জিন্নাহ পাকিস্তান জাতির জনক ও একজন অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। পূর্ববঙ্গেও সেই সময় তাঁহার জনপ্রিয়তা ছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত জনতার একটি বিরাট অংশ জিন্নাহর বক্তব্যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। প্রতিবাদ মুখর না হইলেও মাত্র ৭ মাসের মাথায় পাকিস্তান সৃষ্টির উচ্ছ্বাসে এই প্রথমবার তাহারা একটি প্রচন্ড ধাক্কা খাইল। তাহাদের মনে একটি দ্বিধার জন্ম নিল, নিজেদের সত্যকার স্বাধীনতা চিন্তা চেতনায় সামান্য হইলেও একটি চিড় খাইল। তাহারা বাঙালি না পাকিস্তানী এই প্রশ্ন

তাহাদের মনে এই প্রথম বারের মত উদিত হইতে আরম্ভ করিল। এই কারণেই এই জনসভার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে।

ছাত্র-জনতার অন্তরে বাংলা ভাষা প্রশ্নে জিন্নাহর ঘোষণা যে প্রতিবাদী ও ক্ষুব্দ মানসিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল ইহার বহিঃপ্রকাশ হয় ২৪ শে মার্চ তারিখে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে । কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ পুনরায় বলেন (দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড, পৃঃ ৮৫-৮৮)ঃ

> "There can, however, be only one *lingua franca*, that is, the language for inter- communication between the various provinces of the State, and that language should be Urdu and cannot be any other. The State language, therefore must obviously be Urdu.................."

এইবার ছাত্রদের মধ্যে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া হয় এবং সমাবর্তন হলের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে তরুণ ছাত্রগণ No No বলিয়া প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। জিন্নাহ্ এইরূপ প্রতিবাদ আশা করেন নাই এবং এই প্রথম বারের মত তিনি তাহার সুর নরম করেন ঃ

> "There can be only one State language, if the component parts of this State are to march forward in unison , and that language, in my opinion, can only be Urdu."

এইভাবে ২১ শে মার্চে রেসকোর্স ময়দান হইতে বাঙালির আত্মচেতনার উন্মেষের ঐতিহাসিক প্রারম্ভ যাহা পরবর্তীকালের সংগ্রামের পথপরিক্রমার সৃষ্টি করে।

১৯৬৯ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের ভাষণ ঃ

রমনা রেসকোর্স ময়দানে পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনা হইল ১৯৬৯ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত বিশাল এক জনসভা। ইহার পূর্বদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হইতে কেবল মুক্ত হইয়াছেন। প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষের জন-সমুদ্রের সম্মুখে তিনি তাঁহার ভবিষ্যত কর্মপন্থা তুলিয়া ধরেন। ঐ জনসভাতেই তাঁহাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে ১৯৬২ সনের সংবিধানের আওতায় ১৯৬৫ সনে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে তথাকথিত বেসিক ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে শেখ মুজিব আইয়ুব বিরোধী প্রচারে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ৩রা এপ্রিল তারিখে

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানান হয়। ঐ সময় হইতেই রাষ্ট্রদ্রোহসহ বিভিন্ন প্রকার মামলা শেখ মুজিবসহ বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে আনয়ন করা হইতে থাকে এবং শেখ মুজিব ক্রমাগত গ্রেফতার হইতে থাকেন। ১৯৬৬ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লাহোরে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে লাহোরে উপস্থিত হইয়া ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিব তাঁহার বিখ্যাত ৬ দফা উত্থাপন করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ঢাকায় ইহার উপর বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ১৬ই মার্চ তারিখে আইয়ুব খান ৬ দফার বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করিয়া অস্ত্রের ভাষায় জবাব প্রদান করা হইবে বলিয়া প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেন। মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব সভাপতি ও তাজউদ্দিন আহমদ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবী বোবান হইতে থাকে। যদিও আইয়ুব খান ইহাকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার দাবী হিসাবে গন্য করিয়া শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতা কর্মীদের উপর নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করেন এবং প্রদেশের প্রায় সকল জেলায় তাঁহার নামে হুলিয়া জারী হয়। এই ভাবে ১৯৬৬ সনের প্রথম হইতেই, বিশেষ করিয়া ৬ দফার প্রারম্ভ হইতেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীগনের উপর প্রচন্ড জেল জুলুম ও নির্যাতন চলিতে থাকে। এইরুপ অসহনীয় পরিস্থিতিতে ৭ ই জুন সমগ্র প্রদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঐদিন পুলিশ বাহিনীর গুলি বর্ষণে বহু সংখ্যক লোক নিহত হন এবং কয়েক হাজার লোক গ্রেফতার হয়। পরদিন এই দিনের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলিতে শুধুমাত্র সরকারী প্রেসনোট মুদ্রিত হয় কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ নিজস্ব রিপোর্টারদের সংবাদ বিবরণী প্রকাশ সম্ভব হইল না বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সরকারী প্রেস রিপোর্ট হইতেও ঘটনার অন্তত খন্ডিতাংশ আঁচ করা যাইবে। ইহা নিবরূপ (মযহারুল ইসলাম ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ১৯৯৩, পৃঃ ২৮১-২৮৩) ঃ

> "ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত (সরকারী প্রেসনোট) ঃ "ঢাকা, ৭ই জুন আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহুত হরতাল ৭-৬-৬৬ তারিখে অতি প্রত্যুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনের ব্যাপক বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় ছোকরা ও গুন্ডাদের লেলাইয়া দেওয়া

হয়। ই,পি,আর, টি, সি, বাসগুলিতে ইটপাটকেল ছোঁড়া হয় এবং টায়ারের পাম্প ছাড়িয়া দিয়া সর্বপ্রকার যানবাহনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। নিরীহ জনসাধারণ ও অফিস যাত্রীদের অপমান ও হয়রান করা হয়। হাইকোর্টের সম্মুখে তিনটি গাড়ি পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ কার্জন হল, বাহাদুর শাহ পার্ক ও কাওরান বাজারের নিকট গুন্ডাদের বাধা দান করে এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। তেজগাঁওয়ে ২-ডাউন চট্টগ্রাম মেইল তেজগাঁও রেলষ্টেশনের আউটার সিগন্যালে আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা হয়। ট্রেনখানা প্রহরাদানের জন্য একদল পুলিশ দ্রুত তথায় গমন করে । জনতা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমুলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে বহু পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। যখন পুলিশ জনতার কবলে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন আত্মরক্ষার জন্য তাহার গুলিবর্ষন করে। ফলে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

পূর্বাহ্নে ১০ ঘটিকায় প্রায় ৩০০ উশৃঙ্খল জনতা কর্তৃক তেজগাঁওস্থ ল্যান্ড রেকর্ড ও সার্ভে ডিরেক্টরেট অফিস আক্রান্ত হয়। জনতা তুমুলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে অফিসের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। জনতা অতঃপর সেটেলমেন্ট প্রেসের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রিন্টিং মেশিন সমূহের দারুণ ক্ষতিসাধন করে। আক্রমণের সময় প্রেসের তিনজন কর্মচারী আহত হয়।

নারায়ণগঞ্জে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় গলাচিপা রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। পরে জনতা নায়াণগঞ্জগামী ৩৪ নং ডাউন ট্রেন আটকাইয়া উহার বিপুল ক্ষতিসাধন ও ড্রাইভারকে প্রহার করে। জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের নামাইয়া দেয়। যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য আগত একটি পুলিশ দল আক্রান্ত এবং বহুসংখ্যক পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ দল লাঠিচার্জের সাহায্যে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দুকসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আক্রমণ করিয়া দারুণ ক্ষতিসাধন এবং বন্দুকের গুলিতে পুলিশ অফিসারদের জখম করে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা থানা-ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলিবর্ষণ করার ফলে ছয় ব্যক্তি নিহত ও আরো ১৩ ব্যক্তি আহত হয়। ৪৫ জন পুলিশ আহত হন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর ।

পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব এম. এ. জাবেদের মোটর গাড়ি ভস্মীভূত ও তাঁহার বাড়ি লুন্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ ও চাষাড়ার মধ্যে রেলওয়ে সিগন্যালিং লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়।

টঙ্গীতে বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে এবং একটি মিছিল বাহির করে। কাওরান বাজারের এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা একজন সার্জেন্টকে প্রহার ও তাঁহার স্কুটারের ক্ষতি সাধন করে এবং রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট একটি মালবাহী ট্রেন থামাইয়া দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর ছাত্র পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়।

ঢাকা হলও বাহিরের লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিশ ও ই. পি.আর. দ্রুত ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া পরিস্থিতি আয়ত্বে আনে।

দুপুরে আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকগণ ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢাকা নগরীর দুই মাইল দূরে ই. পি.আর. বাহিনীর একটি শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। অপরাহ্নে এক জনতা গেন্ডারিয়ার নিকট একখানি ট্রেন আটক করে। চট্টগ্রামগামী গ্রীণএ্যারো ও ঢাকা অভিমুখে ৩৩-আপ ট্রেনখানিকে অপরাহ্নের দিকে তেজগাঁও ষ্টেশনে আটক করা হয়। যা হউক, ট্রেন যোগাযোগ অল্পক্ষণ পরে পুনরায় চালু করা হয়। সন্ধ্যার পর একটি উশৃঙ্খল জনতা কালেক্টরেট ও পরে স্টেট ব্যাংক আক্রমন করে। রক্ষীগণ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলিবর্ষণ করে। বেলা ১১ টায় ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। শহরের অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল।”

(দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই জুন, ১৯৬৬)।

১৬ই জুন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয় এবং ইত্তেফাকের প্রেস বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়। এই সময় আওয়ামী লীগের নেতৃস্হানীয় সকল নেতা গ্রেফতার ছিলেন। শুধুমাত্র মহিলা সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম কোন রকমে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে থাকেন।

১৯৬৮ সনের ১৭ জানুয়ারির গভীর রাত্রে শেখ মুজিবকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় কিন্তু জেল গেটেই তাঁহাকে সামরিক বাহিনী গ্রেফতার করে। ১৯শে জুন আরম্ভ হয় রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব গং নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ইহার মধ্যে সমগ্র প্রদেশে ছাত্র জনতার প্রচন্ড বিক্ষোভ মিছিল ও হরতাল কর্মসূচি চলিতেছিল। অন্যদিকে চলিতেছিল সরকারের জেল জুলুম অত্যাচার, নিপীড়ন। ১৯৬৯ সনের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে দেশব্যাপী ‘দাবী-দিবস’ উদযাপিত হয়। এই সময় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। উক্ত পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং ইহার ভিত্তিতে দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলে। ১৮ ই জানুয়ারি ধর্মঘট ও তৎপর বিক্ষোভ মিছিল চলিতে থাকে। ফলে ২০ শে জানুয়ারি আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হইলে আন্দোলনের দুর্বারতা বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে ঐ সময়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলি বর্ষণে বহু সংখ্যক লোক নিহত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানেও গণ বিক্ষোভ আরম্ভ হয় এবং বিভিন্ন শহরে কার্ফু জারী করতঃ সেনাবাহিনী

তলব করা হয়। ইহার মধ্যে ২৭শে জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী সমাপ্ত হয়।

এইরূপ পরিস্থিতিতে ১লা ফেব্রুয়ারিতে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে আইয়ুব রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সহিত গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি ব্যতিরেকে উক্ত বৈঠকে যোগ দিবেন না বলিয়া ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে ইত্তেফাকের ছাপাখানার উপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। ইহাতে সমগ্র প্রদেশে প্রচন্ড বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপি হরতাল হয়। হাজার হাজার লোক তাহার জানাযায় শরীক হয়। বিক্ষুব্ধ ও শোকাহত জনতা ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ও পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এস এ রহমানের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করিলে তিনি বিব্রতকর অবস্থায় তথা হইতে পলায়ন করেন। তাহাছাড়া, আরও কয়েকজন মন্ত্রীর বাসভবনেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতঃ মিছিল করিবার প্রস্তুতিকালে সেনাবাহিনী গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে। প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে প্রথমে গুলি করে, তৎপর বেয়নেট চার্জ করিয়া হত্যা করা হয়। তাহাছাড়া, আরও একজন ছাত্র নিহত হয়। সমগ্র প্রদেশ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে ও হরতাল শুরু হয়। ঢাকায় কার্ফু থাকা অবস্হায়ও প্রচন্ড ভাবে মিছিল মিটিং চলিতে থাকে। সমগ্র প্রদেশে অচল অবস্হার সৃষ্টি হয়। ঐ দিনের ঘটনাবলী সম্পর্কে ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক এর সংবাদ প্রতিবেদন নিম্নরূপ (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র ঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ঃ ৪৩২-৪৩৩) ঃ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহীতে গুলি ও সান্ধ্য আইনঃ ডাঃ শামসুজ্জোহসহ ৬জন হতাহত	দৈনিক ইত্তেফাক।	১৯ ফেব্রুয়ারি , ১৯৬৯।

রাজশাহীতে গুলি ও সান্ধ্য আইন
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোকটর ডঃ সামসুজ্জোহাসহ
২জন নিহতঃ ৪ জন আহত

বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য রাত্রি সাড়ে ১০ টায় সৈন্য তলব করা হয়। রাত্রি ১১-৩০ মিনিটের সময় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা লংঘন করিয়া মিছিল বাহির করা হয় এবং জনতা সেনাবাহিনীর একখানা গাড়ী ঘিরিয়া ফেলে। ছাত্ররা গাড়ীখানার উপর প্রবল ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। ইহা দেখিয়া ছাত্রদের বুঝাইয়া ক্যাম্পাসে ফেরত দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর বাহির হইয়া আসেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু জনতা টহলদার বাহিনীর কম্যান্ডারকে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। লেফটেনান্ট এই সময় গুলি বর্ষণ করে। ফলে প্রোক্টরের দেহে বুলেট বিদ্ধ হয় এবং পরে তিনি উক্ত স্হানে মারা যান।

এ ছাড়াও গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত এবং দুই ব্যক্তি আহত হয়। অপরাহ্ন ২-৩০ মিনিট হইতে রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। এ,পি,পি,

আহতদের তালিকায় তিনজন

অধ্যাপক

গুলি বর্ষণে ছাত্র ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক গুরুতর রকমে আহত অবস্হায় হাসপাতালে ভর্তি হন। তাহারা হইলেন-

(১)প্রফেসার খালেদ।
(২)ডঃ কাজিমউদ্দিন মোল্লা।
(৩)ডঃ কাজী আবদুল মান্নান।

<u>প্রেসিডেন্টের নিকট জরুরী তারবার্তা</u>

গতকল্য (মঙ্গলবার) রাত্র সাড়ে নয়টার দিকে ঢাকা নগরী আকস্মিকভাবে চরম বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং বিভিন্ন মহল্লায় সান্ধ্য আইন লংঘন করিয়া কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শোভাযাত্রীদের উপর বিভিন্ন এলাকায় সামরিক বাহিনীর গুলি বর্ষণ, বেয়নেট চার্জ ইত্যাদির ফলে যে পরিস্হিতির উদ্ভব হয় উহার ভয়াল বর্ণনা দান করিয়া জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শাহ আজিজুর রহমান এবং জনাব আসাদুজ্জামান খান প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের নিকট জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জনাব শাহ আজিজুর রহমান জানাইয়াছেন।

সান্ধ্য আইনের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঢাকা নগরীর প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঃ
ছাত্র-জনতার আকস্মিক বিক্ষোভ মিছিলের দৃপ্ত পদভারে সমগ্র শহর প্রকম্পিত।

গত রাত্রে রাজধানী ঢাকা নগরীতে অকস্মাৎ সান্ধ্য আইনের কঠিন শৃংখল এবং টহলদানকারী সামরিক বাহিনীর সকল প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করিয়া হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আকস্মিক জলোচ্ছাসের মত পথে নামিয়া আসে এবং শেখ

মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও 'আগরতলা' ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে।

এই অবস্থার মধ্যে আজ সকাল সাতটা হইতে বৈকাল ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইনের যে বিরতি ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ প্রত্যাহার করা হয় এবং কোনরূপ বিরতি ছাড়াই পরবর্তী ২৪ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

খোঁজ লইয়া জানা যায়, গতকল্য রাজশাহীতে জনৈক অধ্যাপকের হত্যা এবং সান্ধ্য আইন জারীর খবর এখানকার ছাত্র ও সর্বশ্রেণীর নাগরিকের মনে প্রবল অসন্তোষের সঞ্চার করে। তদুপরি গতকালকার সংবাদপত্রে আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও শেখ সাহেব গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে, গতকাল ঢাকা ত্যাগ না করায় ছাত্র-জনমনে এই বিশ্বাস দানা বাঁধিয়া উঠে যে, শেখ সাহেবের মুক্তির ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নহেন। বর্তমান প্রচন্ড গণজাগরনের পটভূমিতে উপরোক্ত দুইটি ঘটনা ছাত্র-জনতাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে এবং তাহারা সান্ধ্য আইনের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া দাবী দাওয়ার প্রতিধ্বনি করার জন্য অকস্মাৎ রাস্তায় নামিয়া আসে।

কোন রকম পূর্ব ঘোষণা বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই প্রায় একই সঙ্গে শহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এইভাবে ছাত্র-জনতাকে রাস্তায় বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হয়। রাত্রি ৮টার পর হইতে মধ্য রাত্রি পার হইয়া যাওয়া পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্হানে সমানে বিক্ষোভ চলিতে থাকে।

সামরিক বাহিনীর গাড়ীর শব্দ এবং বিক্ষিপ্তভাবে বন্দুকের গুলির আওয়াজ পরিবেশকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তোলে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ করা হয় যে, হাসপাতালের একটি এম্বুলেন্স আহত অবস্হায় রাস্তায় পড়িয়া থাকা লোকজন বা মৃতদেহ হাসপাতালে স্হানান্তরিত করার চেষ্টা করিলে টহলদানকারী সসস্ত্র বাহিনী বাধা প্রদান করে।

হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ ৩ ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় এবং রাত্রি ২টার পর এম্বুলেন্সের জন্য হাসপাতালে সমানে টেলিফোন আসিতে থাকে ।

২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আইয়ুব জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে পরবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না।

উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহুত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবকে আমন্ত্রণ করা হইলেও প্যারোলে তিনি তথায় গমন করিতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এমত অবস্হায় ২২শে ফেব্রুয়ারি সরকার এক ঘোষণা বলে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিব সহ সকল বন্দী বিনাশর্তে মুক্ত হন।

শুধু তাহাই নহে আইয়ুব তাহার মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন মারফৎ শেখ মুজিবকে

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন।

২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখের ঘটনাবলী সম্পর্কে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইয়াছিল (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঃ ময়হারুল ইসলাম, ১৯৯৩, পৃ ঃ ৩৭০-৩৭১) ঃ

> "আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে ইত্তেফাক যে সম্পাদকীয় লিখেছে তা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ঃ "জয় নিপীড়িত জনগণের জয়, জয় নবউত্থান-আজ উৎসবের দিন নয়, বিজয়ের দিন। আজ আনন্দের দিন নয়, স্মরণের দিন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। দুঃশাসনের কারাকক্ষ হইতে দেশের প্রিয় সন্তান শেখ মুজিব অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে মুক্ত হইয়া আবার তাঁর প্রিয় দেশবাসীর মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শহিদী ঈদে আমাদের অভিযান সফল হইয়াছে। গণজাগরণের প্রবল প্লাবনের পলিমাটিতে রক্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে নতুন এক ঊষার স্বর্ণদুয়ার উন্মুক্ত করার অবিস্মরণীয় কাহিনী। এ কাহিনী অসংখ্য শহীদের আত্মদানের, অসংখ্য বীরমাতা ও বীরজায়ার অশ্রু ও হাহাকার সংবরণের কাহিনী।
>
> তবু আজ অহল্যাপ্রতিম পূর্ব বাংলা জাগ্রত। তার আকাশে আকাশে ফাগুনের রক্তসূর্যে নতুন প্রাণের পতাকা শিহরিত। মেঘের সিংহবাহনে নুতন প্রভাত আসিয়াছে। এই প্রভাতের সাধনায় তিমির রাত্রির তপস্যায় যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন আজ বিপুল বিজয়ের ক্রান্তিলগ্নে তাদেরই সর্বাগ্রে স্মরণ করি। তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের অবনত চিত্তের অভিনন্দন। চারিদিকে আজ জয়ধ্বনি। চারিদিকে আজ প্রলয়োল্লাস। বজ্রের ভেরীতে প্রাণের সাড়া জাগিয়াছে। দুঃশাসনের বন্দীশালায় সুপ্ত গণবাসকী জাগরণের প্রথম চমকে দুলিয়া উঠিয়াছে। সব বাধা, সব চক্রান্ত, সব আগল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গণবিরোধী প্রতিক্রিয়ার দূর্গে গণজাগরণের বিজয়কেতন একদিন উড্ডীন হইবেই, এ প্রত্যয় আমাদের চিরকালের। ইতিহাসের এই শিক্ষা মিথ্যা হয় নাই। একদিন যাহাকে মনে হইয়াছিল দুর্ভেদ্য, আজ তাহা লুপ্ত। মধ্যরাত্রির সূর্য-তাপসদের যে সাধনাকে একদিন মনে হইয়াছিল ব্যর্থ প্রয়াস, আজ তাহাই জয়ের মহিমায় মহিমান্বিত। এই মহিমা গণচেতনার। এই বিজয় গণমানুষের। দুঃশাসনের লৌহকপাট ভাঙ্গিয়া, প্রভাতের রক্তসূর্য ছিনিয়া আনিয়া এ গণমানুষেরা আবার প্রমাণ করিল, তাঁহারা অপরাজেয়। তাঁহারা চিরকালের অপরাভূত শক্তি।
>
> এই শক্তিকে যাহারা দমন করিতে চাহিয়াছিল, তাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছে। গণঅধিকারের অপ্রতিরোধ্য প্রতিষ্ঠা আজ সফল সংগ্রামের মাঝে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তবুও আমরা আনন্দ করিব না। দেশের মানুষ আজ তাহাদের হৃত অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনায় অধীর। কারাকক্ষের লৌহকক্ষের লৌহকপাট খুলিয়া দেশপ্রেমিক সন্তানেরা দীর্ঘদিনের বন্দীদশা শেষে আবার এক এক করিয়া মুক্ত আলো-বাতাসে ফিরিয়া আসিতেছেন। দেশের মানুষ ফিরিয়া পাইয়াছে

তাহাদের প্রিয় মুজিবকে। পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার সকল অভিযুক্ত। কেবল ফিরিয়া আসেন নাই একজন। তিনি কোনদিন ফিরিয়া আসিবেন না। প্রিয়জনের ব্যগ্র বাহুর সান্নিধ্য আর তিনি কোনদিন লাভ করিবেন না। বন্দীদশাতেই নির্মমভাবে নিহত হইয়াছেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। বহু নাম জানা আর না-জানা শহীদের রক্তে মিশিয়া গিয়াছে শহীদ জহুরুল হকের রক্ত। এ শোণিত-চিহ্ন আমাদের স্মৃতি হইতে কোনদিন মুছিয়া যাইবে না। জহুরুল হকের শোণিত-রেখা এদেশের গণজাগরণের প্রদীপ্ত পথরেখা। জহুরুল হক অমর। নিজের প্রাণের মূল্যে এদেশের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি মৃত্যুহীন প্রাণের পতাকা উড্ডীন করিয়া গেলেন।

ইতিহাসের গতি অনিরুদ্ধ। গণশক্তির বিজয় অপ্রতিরোধ্য। সকল সংগ্রামের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে তাই আমরা আবার আমাদের লক্ষ্যের ধ্রুব-অন্বেষী হইয়াছি। বিজয়ের গৌরবে আমরা যেন মোহাবিষ্ট না হই। পথভ্রষ্ট না হই। জনগণের বিজয়ের রথচক্রে সেই বজ্রের ভেরীই নিনাদিত হউক-যাহার মধ্যে দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃত সার্থক ও অধিকার চেতনা জাগ্রত। জনগণের জয় সার্থক হউক, জনগণের উত্থান স্থায়ী ও সফল হউক।”

(দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯)

পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে এক গণ-সংবর্ধনা প্রদান করে। উক্ত সভায় দশ লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। উপাধি গ্রহন করতঃ তাঁহার ভাষণে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নূতন পার্লামেন্ট গঠন করিবার দাবী জানান। ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখের দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রদত্ত ভাষণ নিম্নরুপ ঃ (দলিলপত্র ঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৪৩৫) ঃ

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভায় মুজিব কর্তৃক জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী।	দৈনিক পাকিস্তান।	২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

ঢাকার ইতিহাসে বৃহত্তম জনসভা ঃ সংখ্যাসাম্য নয়- জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব চাই ঃ
রেসকোর্সের গণসম্বর্ধনায় শেখ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

“গতকাল রবিবার রমনা রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ লোকের এক বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন, আমি ছাত্রদের ১১ দফা শুধু সমর্থনই করি না এর জন্য আন্দোলন করে আমি পুনরায় কারাবরণ করতে রাজী আছি। -----------

জনাব শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে কোনমতেই তাঁর দল সংখ্যাসাম্য মেনে নেবেনা। সংখ্যাসাম্য যারা মানবে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ঠাঁই নেই। ----- সংখ্যাসাম্যের নামে পূর্ব পাকিস্তানকে ঠকান হয়েছে।

তিনি সর্বস্তরে ও পর্যায়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। --------------

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত গণসম্বর্ধনায় শেখ মুজিবর রহমান ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার শেষে মুক্তির পর গতকালই তিনি প্রথম জনসভায় ভাষণ দেন।

এই গণসম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ। সভায় রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান মামলায় অভিযুক্ত জনাব কে,এম, এস, রহমান, সি,এস,পি, লিডিং সিম্যান জনাব সুলতান উদ্দিন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, জনাব এ,বি, খুরশীদ ও জনাব আলী রেজাসহ অন্যান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, আমি রাওয়ালপিন্ডি যাব এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ হতে তাদের দাবী তুলে ধরব। দেশ আমরা কারুর কাছে বিকিয়ে দেইনি। আমার ৬ দফার সাথে আমার দল ও জনগণ আছে।

ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যদি এদেশের মুক্তি আনতে ও জনগণের দাবী আদায় করতে না পারি তবে আন্দোলন করে আবার কারাগারে যাব।

আওয়ামী লীগ প্রধান শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলার উল্লেখ করে সকল ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব আদায়ের কথা বলেন। তিনি বলেন আমি সংখ্যাসাম্য মানি না।

শেখ মুজিব বলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে। বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করা হবে না তা সংশোধন করা হবে পার্লামেন্টই তা নির্ধারণ করবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক ইউনিট ভেঙ্গে ফেলার জন্য সেখানে একটা দাবী উঠেছে। তারা এক ইউনিট চায় না।

তিনি বলেন, এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের ভোট নেয়া হোক তারা যদি এক ইউনিট না চায় তবে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকেও স্বায়ত্বশাসন প্রদানের তিনি দাবী জানান।

শেখ মুজিব বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশগুলো নিয়ে একটা ফেডারেশন গঠন করতে হবে। জনমতের বিরুদ্ধে কোন কিছু চালিয়ে দেয়া চলবে না।

চাকুরী, অর্থনীতি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। ফলে সেখানকার লোক সবরকম সুবিধা পাচ্ছে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ জন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হওয়া সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারে বিভিন্ন চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীয় সংখ্যা শতকরা দশ-জনের কম।কেন্দ্রীয় সরকারের সকল অফিস-আদালত শুধু রাজধানীতে। তাই ব্যবসা বাণিজ্যও সেখানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে এই প্রদেশে মূলধন গড়ে উঠছে না।

দেশরক্ষা খাতের ব্যয় সম্পর্কে তিনি বলেন এই খাতের শতকরা আশি ভাগ অর্থই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়। কারণ সামরিক সদর দফতর সেখানে অবস্থিত। তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মজলুম এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। -------------

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে সংঘর্ষের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় অবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই অবস্থার অবসানের জন্যই লাহোরে জাতীয় সম্মেলনে আমি দলের পক্ষ হতে ৬-দফা দাবী পেশ করেছিলাম। তাতে আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেয়া হয়েছিল। আমরা দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন। আমরা কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব? আমরা চাই ন্যায্য অধিকার। --------------------

তিনি বলেন, -------- গুটিকয়েক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও আমলার জন্য আমরা পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রাম করিনি। এদেশের চাষী, মজুর, ছাত্র সকল মানুষের বাঁচার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু জালেমের পর জালেম এসেছে দেশে শাসন ক্ষমতায়। জনগণ মুক্তি পায়নি। ----------

জগন্নাথ কলেজসহ বিভিন্ন কলেজকে প্রভিন্সিয়ালাইজড করার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন এদেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করার জন্যই সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছে।

কারখানার মালিকদের তিনি শ্রমিকদের মুনাফার ভাগ প্রদানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মালিকরা সব মুনাফা লুটেপেটে খেলে এমন দিন আসবে যখন কলকারখানা সবই বাজেয়াফত হয়ে যাবে। শ্রমিক নির্যাতনের তিনি নিন্দা করেন।

রবীন্দ্র সংগীত প্রচারে সরকারী নীতির তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। বেতার কেন্দ্রসমূহকে তিনি হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার মানুষের কবি। তার গান রেডিওতে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ---------

শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে এরূপ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য তিনি জনগণকে অনুরোধ জানান এবং সরকারকে উস্কানীমূলক কাজ হতে বিরত থাকতে বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শহরের প্রতি মহল্লায় এবং মহকুমা ও জেলায় সংগ্রাম কমিটি গঠনের জন্য আহ্বান জানান।

শত্রুর খপ্পরে না পড়ার জন্য তিনি সকলকে সতর্ক করে দেন। সান্ধ্য আইন ও সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। তিনি বলেন, আমাদের সংগ্রাম কমিটি মহল্লায় শান্তি বজায় রাখবে।

শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব বাংলায় হিন্দু, মুসলমান, বিহারী এবং সকলেই আমরা শান্তিতে একত্রে বসবাস করব।

পরিশেষে তিনি বলেন, বাংলার মাটিকে আমি ভালবাসি। বাংলার মাটিও আমাকে ভালবাসে। ১১-দফার জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তিনি তাঁর ৫০ মিনিট স্থায়ী বক্তৃতা শেষ করেন”।

২৫ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় নিবলিখিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় (দলিলপত্র ঃ ২য় খন্ড, পৃ ঃ ৪৩৮) ঃ

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিব কে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান এবং ১১ দফা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য মুজিবের প্রতি আহবান।	দৈনিক পাকিস্তান।	২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’

গত রবিবার ঢাকা রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিদানের প্রস্তাব করলে সমবেত জনসমুদ্রে বিপুল করতালিতে তা সমর্থন করে।

রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভায় প্রস্তাব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ঐতিহাসিক ১১-দফা বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিবর রহমানকে স্বয়ংক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহব্বান জানিয়েছেন। তারা ঘোষণা করেন, ১১-দফা দাবী পূরণের মধ্যেই শহীদদের রক্ত ও নির্যাতিত ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও মেহনতী জনতার দাবী পূর্ণ হতে পারে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের পদত্যাগ, জনগণের হাতে আশু ক্ষমতা অর্পণ এবং বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করে ১১-দফার ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবীতে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ১১-দফা দাবীকে শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে স্থান দেওয়ার জন্য দাবী জানান হয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ‘The Pakistan Observer ’ ‘Release Rights by Peaceful Means’শিরোনামে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ

THE PAKISTAN OBSERVER

24TH FEBRUARY,1969

RELEASE RIGHTS BY PEACEFUL MEANS

(By A Staff Correspondent)

Awami Leage leader Sheikh Mujibur Rahman on Sunday gave a call for peaceful movement for the realisation of the demands of the people. Addressing a meeting attended by lakhs of people at the Ramna Race Course, the Awami Leage leader said the people must keep constant vigil that the peace is not disturbed geopardising the cause of the movement.

He also exhorted the Government not to give any provocation to the people for resorting to violence.

Called by All Party Students Committee of Action to give a reception to Sheikh Mujibur Rahman, the meeting was also addressed by student leaders. Mr. Tofail Ahmed, Chairman of the All Party Students Committee of Action and Vice-President of Dacca University Central Students Union presided over the meeting. Among those present were persons released from the alleged Conspiracy Case.

Sheikh Mujibur Rahman said that he would join the proposed Rawalpindi talks on Monday where he would place demands on behalf of the struggling masses of both wings of the country. Enumerating the demands the Sheikh said that a sovereign parliament must be ensured on the basis of universal adult franchise. He said that the soverign parliament will decide the shape of the Constitution of the country.

Population Basis, not parity.

Demanding regional autonomy for East Pakistan, the Sheikh said East Pakistan's share in all spheres of national life must be determinded on the bais of population. He said, East Pakistan was

no more prepared to accept parity. “Whoever in East Pakistan will talk of parity has no place here,” he added.

Sheikh Mujibur Rahman said that people of East Pakistan had accepted parity in representation on only the condition that parity would be maintained in all spheres including all services. He said that the province had been deceived in this regard.

The Awami League Chief spoke of gross disparity in the Central Services, particularly defence services where 60 per cent of the countrie’s revenue is being spent. He said that 80 per cent of the defence expenditure was made in West Pakistan. He complained that the capital had been built at two places in West Pakistan but East Pakistan was given a show room in the name of a second capital. All capital formation had taken place in West Pakistan leaving East Pakistan deprived. He said that East Pakistan had some powers in the parliament which had also been taken away by the present regime. He, however, added that there was no difference between common man in East and West Pakistan.

“Ours have been a movement against exploiters who live in West Pakistan,” he said.

The Awami League said that in the light of the experience of the September War he had felt that only solution to the problems of geographycal peculiarity of Pakistan was regional autonomy in all spheres and self-sufficiency for East Pakistan in all matters.

Sheikh Mujibur Rahman said that he had first placed his demands for a constitution on the basis of Six-Point Programme at a conference in Lahore in 1966. He said when the regime refused to pay heed to it he placed it before the people . “If the government did not pay any heed to the demands of the people he would again come back to the people.”

One Unit

Referring to the demands for the dissolution of One Unit the Awami League leaders said that if the Pathans or Sindhis did not

want continuation of one unit, it should be dissolved. He said that the Government could not be allowed to do anything against the will of the people.

Sheikh Mujibur Rahman suggested provincial autonomy for the former provinces of West Pakistan and regional autonomy for entire West Pakistan like that of East Pakistan.

Speaking on the students Eleven-Points demands, the Awami League leaders said that he did not only support the demands, he would also work for the realisation of the demands.

Condemning the recent killing and persecution of the people and imposition of curfew and army call-up, he asked the Government what right it had to let loose such a reign of terror to stop workers from demanding legitimate wages, cultivators from wanting due price for their produce and students and middle classes from seeking their rights. He demanded withdrawal of the Press and Publication Ordinance and 'hulia' on political workers.

He demanded adequate compensation for those killed during the mass upsurge. He also declared a committee will be formed for the collection of funds to give compensation to those victims.

Mr. Tofael Ahmed in his presidential speech demanded that the national anthem should be in Bengali which is the language of 56 per cent population of the country. He regreated that the national anthem was in Urdu, a language spoken by only 3 per cent of our population.

He deplored that there was little scope to speak in Bengali in the armed forces and Urdu was considered the only language of the 'jawans'. He made a strong plea for the introduction of Bengali there.

Education Policy

Mr. Ahmed vehemently criticised the policy of provincialising the financially sound colleges like the Jagannath College, Carmichael College and Brojomohan College. He demanded that

these institutions be restored to their old status. He alleged that the Government adopted this policy only to restrict the racility of education, especially to the poor students.

Mr. Tofael Ahmed held that the kindergarten system with its English medium was fostering a kind of alien and elite spirit in the educaitonal field. He observed that any such instutition should not be allowed to run in East Pakistan. Mr. Tofael awarded a tilte on Sheikh Mujib: "Bangabandhu Sheikh Mujib," which means "Sheikh Mujib Friend of Bengal."

Constitution

On behalf of the meeting the DUCSU Vice-President and Convener of the All Party Students Committee of Action appealed to Sheikh Mujib that he must come back from the Round Table Conference framed according to the will of the people of East Pakistan which constitutes 56 per cent of the population of the country.

Mr. Ahmed expressed his profound confidence in Sheikh Mujib that he would never let down the people and would carry on his struggle for the well being of the people. He cautioned that if for any reason the Sheikh held to live upto the people's expectation, he would not be spared by the people. He called upon Sheikh Mujib not to make any 'compormise' till the Eleven-Point demands were fulfilled.

All Party Students Committee of Action member Saifuddin Ahmed Manik appealed to Sheikh Mujib to move stead firstly on the path of movement. He assured the leader that the masses were prepared. He fervently called upon Sheikh Mujib to give a call for relentless movement simultaneously with the progress of the parleys.

Referrfing to President Ayub's suggestion for amending the Constitution, the student leader opined that "the people infact wanted to tear it up to pieces."

Referring to Sheikh Mujib’s decision to participate in the Round Table Conference, Khaled Mohammd Ali, another member of the Committee of Action cautioned Sheikh Mujib that he must not make any ‘compromise’ till East Pakistan’s autonomy was achieved on the basis of Mujib’s Six-Points.

Mr. Ali observed that the allegation against Sheikh Mujib that he want ‘Secession’ was utterly false. He believed that Mujib’s Six-Points Programme was the demand for autonomy of East Pakistan.

Committee of Action member Mahbubullah emphasised that the people were so prepared for struggle that “today they consider death as cosy as flower wreath.” He called upon Sheikh Mujib to take up the leadership of the movement of Eleven-Points demand and for that to give a call for building up disciplined organisation and volunteer corps in all villages and mahallas.

Mr. Mahbubul Huq Dulan, another member of the committee of Action, maintined that the 11-Points , manifesto was the only programme behind which the people of East Pakistan stood firmly and resolutely. He cautioned that whatever agreement the leaders might arrive at in the Pindi talks unless the demands of the people were met it would not be accepted.

Resolutions

The public meeting held on Sunday at the Ramna Race Course under the auspices of the Students’ All –Party Committee of Action called upon the Government to immediately restore the rights of the people.

According a warm well come to Sheikh Mujibur Rahman, the meeting appealed to him to come forward to lead movement on the basis of the 11-Point demands of the Students. These meeting also urged that the future constitution shall be framed on that basis.

The meeting deplored that the safety Act and the press and publications Ordinance were yet to be repealed and the properties of

the Progressive Papers Limited were not still handed over to the original owners.

Hartal March 4

It made a fresh call to the people to observe hartal all over the province on March 4 demanding repeal of safety Act and Press and Publications Ordinance, withdrawal of all proclamations (hulia) and fulfillment of the Students' 11-Point demand.

The meeting demanded that the political cases and all cases relating to the current mass movement must be withdrawn.

The meeting called upon the people to wear black badges on the ensuing Eid day as a mark of grief and respect for the martyrs who laid down their lives in firings by Police, EPR and Army during the current movement.

The meeting reiterated the 'students' earlier demand that the M N. As, M.P.As and B.D.s must resign by March 3. It also called upon all to give up all titles awarded by the present regime.

The meeting welcomed the decision of the Government to give compensation to the bereaved family of Dr. Shamsuzzoha of Rajshahi University and demanded that the families of all the martyrs of the current movement must be adequately copensated for.

করাচী হইতে প্রকাশিত ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখের DAWN পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ

DAWN

KARACHI

MONDAY, FEBRUARY 24,1969

Mujib demands directly elected Sovereign Parliament

Representation on basis of

population sought

Referendum in West Wing

on One Unit urged

Feb 23 : Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, today discarded parity and demanded representation in all spheres.......................................

He asked the Government to leave the issue of One Unit to the people of West Wing to be decided by vote. He said that the people there did not want it (One Unit).

The Awami League Chief said that he had first in early 1966 placed his demand for a Constitution on the basis of his Six-Point programme at a conference in Lahore.

He added that when the present regime had refused to pay any heed to it, he placed it before the people. He said that the regime had accused him of trying to bring about secession of East Pakistan.

But he asked why the Eastern Wing with 56 per cent of the population of the country would go for secession. The Sheikh said : "If they (West Pakistan) want it they can do it. What we want are our rights as citizens of Pakistan. What we we want is due share in national affairs."

ONE UNITED PEOPLE

Sheikh Mujib said students and the people of East and West Pakistan were one, united and fraternal in relations. Moreover, in both Wings, they were oppressed and it was only the rulers and the vested interests who were trying to divide them and dissociate the people of one region from the people of other region to perpetuate and preserve their interests, he added.

He told the crowd that students of East Pakistan protested against the killing of their brethren in West Pakistan and so did the students of West Pakistan when there was bloodshed in East Pakistan. This, he said demonstrated how much people of different regions loved each other.

Sheikh Mujibur Rahman explained the background of his Six-Point programme and said the experience of the 1965 September War with India showed that the two Wings of the country were cut off from each other.

He said even the President had not been able to visit East Pakistan during the war and there was panic prevailing here. He said when Lahore was attacked people in East Pakistan felt that it was an attack on their own territory but "we could not help each other during the war."

The Awami League Chief said that in the light of the experience of the September War "we had felt that only solution to the problem was regional autonomy in all spheres and self-sufficiency for East Pakistan in all matters.

CHEATED ON PARITY

Sheikh Mujib said that the people of East Pakistan has accepted parity in representation in the parliament only on the condition that parity would be observed in all other spheres including the Central Services.

But, he said, that they had been deceived in this regard and said they were no more prepared to accept parity. "However, in East Pakistan would talk of parity he has no place here," he said.

The Awami League Chief spoke of gross disparity in the Central Services, particularly the Defence Services. He said 80 percent of the defence expenditure were made in West Pakistan. He said the central capital was in West Pakistan and the capital formation had taken place more in West Pakistan. He said East Pakistan had some powers in the Parliament, which had also been taken away by the present regime.

Sheikh Mujib said: "My struggle is directed against all sorts of repression and exploitation and not against any region. He said all opressed Bengalees, Sindhis, Punjabees, Baluchis, Pakhtoons and Pathans are equal before me.

He said as the Central Capital, Central establishments capital formation, and head quarters of the three armed services were located in West Pakistan. Economic disparity between the two wings continued to widen unabated. It was in this context of things, he said, that he wanted autonomy for the people of East Pakistan as well as for those of different regions in West Pakistan who who would remain in a sub-federation.

FIGHT AGAINST EXPLOITERS

Sheikh Mujib said that people had struggled to achieve Pakistan for the 12 crore Pakitanis and not for a handful of industrialists, traders and businessmen.

He said that his fight was against some exploiters who had their headquartes in West Pakistan and not against the West Pakistan people.

He said he loved mankind irrespective of thier nationality or religion. He also advocated communal harmony in East Pakistan and said "Bengalees, Biharis, Hindus or Muslims, all who live in East Pakistan are our brothers."

Shekih Mujib demanded that Radio Pakistan must adequately broadcast songs of Rabindra Nath Tagore. The Awami League Chief said that Rabindranath was not only poet of Bengalees but was a world poet.

He said that people read Shakespeare, Marx, Hafiz, Mao Tse Tung and Aristotle to learn some thing from them. Similarly people wanted to learn from Rabindra Nath.

'ISLAMABAD CONSPIRACY CASE'

The public meeting began amidst thunderous cheers, and slogans, clapping and showering of flower petals. Sheikh Mujib took the mike to congratulate the people on their victory in securing the release of political detenus and those who were being tried for so-called conspiracy. He expressed his gratitude to the struggling students and masses.

Sheikh Mujib suggested that the people should henceforth described the so-called Agartala Conspiracy Case as the Islamabad Conspiracy Case and explained how and under what circumstances he was released and removed from the Central Jail at dead of night to be subsequently charged with conspiracy.

He said he could realise at the time of being removed from the central Jail to military custody that something serious was going to happen. In a choked voice, the Sheikh said : "I took a handful of dust at the gate of the Central Jail and prayed to Almighty Allah so that I could be buried in the soil of my motherland if I died.."

The Awami League chief declared he did not believe in any conspiracy. He said : "I fear only Allah and none else. What I realise, what I understand for the interest of my country I speak out without any fear," he added.

He narrated his experience in solitary confinement during which, he said, he was not allowed to communicate with his family. He said he was prepared for the worst but even then he believed that the people would be able to realise their rights.

He said with the withdrawal of the cae, he had come out with 33 others who were accused but could not bring back one of them Sgt. Zahurul Huq. He condemned the Government action in "killing" Zahurul Huq, Dr. Shamsuzzoha, Asaduzzaman and others.

INDUSTRIALISTS WARNED

Sheikh Mujibur Rahman censured the Government for using the police against the workers for the interest of a few industrialists.

He said the workers were put into jail when they placed their legitimate demands and they were deprived of their rights.

He warned the industrialists that if they did not share a portion of their profit with the workers, they may have to incur a greater loss in the long run.

Sheikh Mujib criticised the Press and Publications Ordinance and regimentation of the Press and arrest of Journalists. He also criticised the University Ordinance.

The Awami League chief, said that he had been actively associated with all the movements in the country but none was like their present one.

He was particularly cirtical of Governor Abdul Monem Khan and said that if the latter remained here. It would not be possible to maintain peace. He said : "The President should keep his patwari (Governor Monem Khan) in West Pakistan." "When I imagine his (Monem Khan's) face. I see as if Namrud and Pharaoh are before me," he said amidst laughter.

Sheikh Mujib said the proctor of Rajshahi University was killed in broad day light. Besides, so many students, peasants and workers.

উপরে বর্ণিত রমনা রেস্‌কোর্স ময়দানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত জনসভা বিভিন্ন কারণে ঐতিহাসিকভাবে স্মরনীয়। এই সভার মাধ্যমে আইয়ুব খানের যুগব্যপি একনায়কত্ব শাসন এবং রাষ্ট্রের নিস্পেষনের উপর জনতার বিজয় সূচিত হয় এবং জনতার দাবীর মুখে আইয়ুব খান বিরোধীয় দলীয় নেতাদের বক্তব্য শ্রবণ করিতে বাধ্য হন। একটি বিশেষ অধ্যাদেশ মারফৎ গঠিত ট্রাইবুনাল ও ষড়যন্ত্র-বিচার ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় সংগ্রামের ফলে পাকিস্তান সরকার বাতিল করিতে বাধ্য হন। এই সর্ব প্রথম এক ইউনিট বাতিল এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবী দশ লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে প্রকাশ্যে উত্থাপিত হয়। তাহাছাড়া, ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনের দাবী এই বিশাল জনসভা অনুমোদন করে।

এই জনসভা হইতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের বাঙালার মানুষের অবিসংবাদী ও একছত্র নেতায় পরিণত হন এবং তাহাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিতে সক্ষম হন। এই জনসভা হইতে যে সংগ্রামের সূচনা তাহা বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

১৯৭১ সনের ৩রা জানুয়ারি তারিখের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ঃ

১৯৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে সমগ্র পাকিস্তানে ইহার প্রথম ও শেষ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ইহার ৬ দফা দাবীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তদানীন্তন পূর্বাঞ্চলের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয় লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই বিপুল বিজয়কে আওয়ামী লীগ ইহার ৬ দফার প্রতি বাংলার জনগণের রায় বলিয়া অভিহিত করে। উল্লেখ্য যে ১৯৫৪ সনের প্রাদেশিক নির্বাচনেও যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করিয়াছিল কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে পূর্ববঙ্গের জনগণ বিজয়ের প্রকৃত সুফল অর্জন করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৯৭০ সনের এইরুপ বিপুল বিজয়ের পর ইয়াহিয়া সরকারের নির্বাচন-পরবর্তী উদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শেখ মুজিবের একটি আশঙ্কা ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হয়তো এই কারনেই নির্বাচনে এইরুপ ঐতিহাসিক বিজয়ের পরও তিনি নির্বাচন তথা গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি অনন্য সাধারন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রেসকোর্স ময়দানে সর্বজন সমক্ষে আওয়ামী লীগ দল হইতে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সকল সদস্যকে লইয়া তিনি আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো ৬ দফা বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক বিশ্বে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভের পরে প্রকাশ্য জনসভায় সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের শপথ গ্রহন করিবার কোন নজির নাই।

এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সনে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার সময় হইতেই পূর্ব বাংলা তীব্র বৈষম্যের স্বীকার হইয়া আসিতেছিল। এই অবস্হার সামান্যতম প্রতিবাদ করিলেও জেল-জুলুম অবধারিত ছিল। এই অসহনীয় পরিস্হিতি হইতে পরিত্রান পাইবার লক্ষে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের আঙ্গিকে পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবী করিয়া

শেখ মুজিব ১৯৬৬ সনে তাঁহার সুবিখ্যাত ৬ দফা কর্মসূচী উত্থাপন করেন। ৬ দফা নিবরূপ (দলিলপত্র ঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৫৯-২৬৫) ঃ

১ নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

---------- ------------------------------

----

২ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেট সমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

----

৩ নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে ঃ

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'ষ্টেট' ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থার মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

----

৪ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে । ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান

শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

---

৫ নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি ঃ

দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমান ভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

ব্যবসা-বানিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যাস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

---

৬ নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি।

পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব হইতেই শেখ মুজিবকে শত্রু জ্ঞান করিত কিন্তু ৬ দফা উত্থাপনের পর তাহারা তাঁহাকে মহাশত্রু গণ্য করতঃ জেল-জুলুম ও যতভাবে সম্ভব তাঁহার উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাইয়াছিল। এই ৬ দফা দাবীর প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সমমনা দলগুলি এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে কিন্তু তিনি এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ৬ দফাকেই বাঙ্গালার মানুষের মুক্তির সনদ গণ্য করতঃ সংগ্রাম চালাইতে থাকেন। এক সময় এমন অবস্হা দাঁড়াইয়াছিল যে তাঁহাকে প্রতিদিনই কোন না কোন জেলায় আসামি হইয়া হাজিরা দিতে হইত এবং গ্রেফতার হইতে হইত। তৎপর ১৯৬৬ সন হইতে জেলখানায় থাকা অবস্হায় ১৯৬৮ সনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মোকাদ্দমায় ১নং আসামি হইয়া ১৯৬৯ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের জেল খানায় থাকিতে হইয়াছিল। সেখানেও তাঁহাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। এইরূপ অত্যাচার নিপীড়নের পরেও শেখ মুজিব তাঁহার ৬ দফা দাবী হইতে বিন্দুমাত্র সরিয়া আসেন নাই কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে শুধুমাত্র

৬ দফা দাবী আদায় মারফত্ই বাঙালি তাহার ন্যায্য অধিকার আদায় ও সংরক্ষন করিতে পারিবে। ছাত্র জনতার যৌথ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর শেখ মুজিবকে মুক্ত করিয়া আনা সম্ভব হয়।

১৯৭০ সনের ৩০শে মার্চ তারিখের এক আদেশ বলে পশ্চিম পকিস্তানের এক ইউনিট বিলুপ্ত করিয়া চারটি প্রদেশ গঠন করা হয় এবং ইসলামাবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসিত এলাকা ফেডারেল এলাকা ঘোষিত হয়। একই তারিখের Legal Framework Order (LFO) বলে প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ সদস্য এবং ১৩ জন মহিলা প্রতিনিধিসহ ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদ গঠনের ঘোষনা দেওয়া হয়।

অতঃপর, ১৯৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে LFO এর আওতায় অখন্ড পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচন করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান হইতে ১৬২ টির মধ্যে ১৬০ টি আসন লাভ করে। ৩০শে ডিসেম্বর সরকার পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয় যে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচনে এইরূপ বিপুল জয়লাভের পর শেখ মুজিব তাঁহার সকল জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদ সদস্যদের লইয়া ১৯৭১ সনের ৩রা জানুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বসিয়া ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তাহাদিগকে শপথ বাক্য পাঠ করান। ১৯৭১ সনের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত সংবাদ পরিবেশন করা হয় (দলিলপত্র ঃ ২য় খন্ড, পৃঃ ৬০৮-৬০৯) ঃ

“ গণপ্রতিনিধিদের শপথ

শোষণমুক্ত সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়ার সংকল্প

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

মুক্ত শপথে দীপ্ত বীর বাঙ্গালীদের নির্বাচনোত্তর সাগ্রহ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাইয়া বাঙালি তথা পাকিস্তানের কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষের কামনা-বাসনার পিলসুজে সম্ভাবনার অনির্বান শিখা প্রজ্বলিত করিয়া প্রাণ-প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ দলীয় নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা প্রত্যয়দৃঢ়কণ্ঠে গতকাল (রবিবার) রমনা রেসকোর্স ময়দানের অবিস্মরণীয় ও অভূতপূর্ব গণ-মহাসাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষন-মুক্ত সুখী সমাজের বুনিয়াদ

গড়িবার ঈপ্সিত কঠিন শপথ গ্রহন করেন।

" আমরা শপথ করিতেছি-----

"আমরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছি পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে ; আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি সেইসব বীর শহীদের ও সংগ্রামী মানুষের নামে, যাহারা আত্মাহুতি দিয়া ও চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করিয়া আজ আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সূচনা করিয়াছেন।

" আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষের-তথা সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নামে ঃ

* জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল সমর্থন ও অকুন্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিব ;

* ছয়দফা ও এগারো-দফা কর্মসূচীর উপর প্রদত্ত সুস্পষ্ট গণ রায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরুপে বিশ্বস্ত থাকিব এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয়-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন ও এগারো-দফা কর্মসূচীর প্রতিফলন ঘটাইতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব;

* আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আনুগত্য জ্ঞাপনপূর্বক আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষনমুক্ত এক সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার এবং অন্যায়, অবিচার বিদুরিত করিয়া সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব ;

* জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে কোন মহল ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কোনরুপ ত্যাগ স্বীকার করতঃ আপোসহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন, জয় বাংলা, জয় পকিস্তান।"

গতকাল (রোববার) বিকালে রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ এবং ২৬৮ জন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ সদস্য ৬-দফা ও ১১- দফা বাস্তবায়নের সংকল্প ঘোষণা করিয়া শপথ গ্রহন করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সম্ভবতঃ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই ধরণের গণশপথ গ্রহন এই প্রথম।

শেখ মুজিবের ডানপার্শ্বে জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ এবং বাম পার্শ্বে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ দাঁড়াইয়া শপথ গ্রহন করেন। প্রত্যেকের বাম হাতে শপথনামা এবং ডানহাতে শপথের ভঙ্গিতে উদিত ছিল। নেতার সঙ্গে সঙ্গে সকল

সদস্য শপথনামা পাঠ করেন। শপথ পাঠ করার পূর্বে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের সামনে জনসাধারণকে সাক্ষী রাখিয়া শপথ গ্রহন করিতেছেন। শপথ গ্রহন সমাপ্ত হইলে বিশাল জনতা উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।"

৪ঠা জানুয়ারি তারিখে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ

রেসকোর্সের বিশাল জনসমূদ্রে শেখ মুজিবের ঘোষণা ঃ

সংগ্রাম শেষ হয় নাই।

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য বরিবার রেসকোর্সের জনসমুদ্রকে উদ্দেশ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আকোজড়িত কন্ঠে বলেন, 'আজ বক্তৃতা শুরু করিবার পূর্বে স্মরণ করি - মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন,' 'বাষট্টির আইয়ুব- বিরোধী আন্দোলন, 'ছেষট্টির ৭ই জুনের সংগ্রাম ও 'আটষট্টির - 'উনসত্তুরের গণঅভ্যূত্থানে শহীদ ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের কথা। মুজিব বলেন, 'আজ সকলকে সঙ্গে লইয়া এই গণসমাবেশে শপথ লইতেছি-- শহীদানের রক্ত বৃথা যাইতে দিব না। যতদিন আকাশ বাতাস থাকিবে, বাংলাদেশ থাকিবে, বাংলার মাটি থাকিবে--- ততদিন রক্তের কথা ভুলিব না। প্রয়োজন হইলে নিজের রক্ত দিয়া তাহাদের রক্ত-ঋণ পরিশোধ করিব।" ঢাকার ইতিহাসের বৃহত্তম গণ-সমাবেশে আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব দৃঢ়তার সহিত বলেনঃ "সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই- সংগ্রামের সবেমাত্র শুরু।"

শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে ঘোষণা করেন, "আমরা যাহা পাশ করিব, তাহাই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র। তাহা নস্যাৎ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যদি কেহ করেন, দেশ-ব্যাপী প্রচন্ড গণ-বিস্ফোরণে তাহার জবাব দেওয়া হইবে।"

বঞ্চিত পূর্ব বাংলার মানচিত্র অঙ্কিত "জয় বাংলা" পালের নীচে দাঁড়াইয়া দরদ গম্ভীর কন্ঠে শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন, "বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান- এবার ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ।" লক্ষ লক্ষ হাতের মুহুর্মূহুঃ করতালির মধ্যে জাতির উদ্দেশে শেখ মুজিব সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করেন, "একটা বড় কথা বলিতে চাই; এদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অবশ্যই কায়েম করা হইবে। বড় লোককে আর বড়লোক হইতে দেওয়া হইবে না এবং গরীবকেও না খাইয়া মরিতে দেওয়া হইবে না। এই দেশ হইবে গরীব শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারা মেহনতি মানুষের।"

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "শুধু নির্বাচনে জয়লাভ করিলেই দাবী আদায় হয় না। দাবী আদায়ের জন্য চরম সংগ্রামেরও প্রয়োজন হইতে পারে।

সাত কোটি বাঙ্গালীর সেই সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে। রক্তের ঋণ প্রয়োজন হইলে রক্তেই শোধ করিতে হইবে।”

শেখ মুজিব বলেন, “নির্বাচনে গণতন্ত্রের প্রাথমিক জয়সূচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জয় শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের জয় নয়; এই জয় সাত কোটি গরীব বাঙ্গালীর জয়।”

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, “এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা শুধু বাঙ্গলার নয় - সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হইয়াছে। সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্তপ্রদেশের গরীব জনগণের জন্য আমাদের সমান মমত্ববোধ রহিয়াছে। তাহাদের প্রতি ইনসাফই হইবে আমাদের মূল লক্ষ্য।”

শেখ মুজিব বলেন যে, বঞ্চিত জনগণের এই জয়যাত্রাকে বানচাল করিবার জন্য নির্বাচনের পূর্বে প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠী এছলামের ব্যবসায় নামিয়াছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, “নির্বাচনের পর আপনাদের নামাজ পড়িতে কেহ নিষেধ করিয়াছে ? ” তিনি বলেন, “এছলামী আদর্শেই আমি বলিতেছি, এই দেশে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান সমান অধিকার নিয়াই থাকিবে।” তিনি আরও বলেন, “ধর্মের বণিকদের এসলামী বিচারে কোড়া মারার নির্দেশ রহিয়াছে।” শেখ মুজিব বলেন, “জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পি-ডি-পি হইয়াছে, তিন মোছলেম লীগ এক হইয়াছে, এছলামী ফ্রন্ট হইয়াছে কিন্তু বাঙ্গলার মানুষ দালালদের হালাল করিয়া দিয়াছে, পরগাছা সাফ করিয়া দিয়াছে।”

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, “৬-দফা ও ১১- দফা জনগণের সম্পত্তি। ইহা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্ধনের ক্ষমতা আওয়ামী লীগের নাই। শাসনতন্ত্র এই ৬-দফা ও ১১-দফা ভিত্তিতেই প্রণীত হইবে। কেহ ঠেকাইতে পারিবে না।”

তবে তিনি বলেন যে, ‘এই ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সহযোগিতা দরকার এবং সহযোগিতা চাই।’

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, ‘পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সহযোগিতায় শাসনতন্ত্র প্রণয়নে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নীতির প্রশ্নে, কোন আপোষ নাই।’

বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বস্তি এলাকায় উন্নয়ন কাজ শুরু করার আহ্বান জানাইয়া আমলাদের হিসাব তৈরী করার নির্দেশ দেন।

মোহাজেরদের উদ্দেশ্য করিয়া শেখ মুজিব আরও বলেন, “২৩ বৎসর পর আপনারা আর মোহাজের নহেন। এখন আপনারা এদেশের মাটির সহিত মিশিয়া যান।”

তিনি বলেন, ‘আমরা এখনও মোহাজের কর দিয়া আসিতেছি। কিন্তু একটি পয়সাও ব্যয় হয় নাই। এবার তাহার হিসাব চাই- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত কত মোহাজের কর দিয়াছে।”

জনসমুদ্রে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, গোলামীর শিক্ষা ব্যবস্হা অবিলম্বে পরিবর্ত্তন করা হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষকদের সম্মান বৃদ্ধির আশ্বাস দেন।

এক পর্যায়ে তিনি কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবী করেন।

সর্বজন সমক্ষে এই শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৬-দফা প্রশ্নে শেখ মুজিব সম্ভবত ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেকে ও আওয়ামী লীগের সকল নির্বাচিত সদস্যগণকে এমন একটি আপোষহীন অনড় অবস্হানে ঠেলিয়া দিয়া ভবিষ্যত আপোষের পথ এমনভাবে বন্ধ করিয়া দেন যাহাতে পরিস্হিতির চাপে যেন তিনি নিজেও ৬ দফা প্রশ্নে কোন আপোষ করিতে না পারেন। এইভাবে তিনি শুধুমাত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন হইতে অকথিতভাবে ৬ দফার মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অংশকে লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত ফেডারেশন ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করাইয়া পাকিস্তানের রাজনীতিকে সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করিবার প্রয়াস লইয়াছিলেন। পূর্বাঞ্চলের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক সদস্যদের কে ৬ দফা দাবীর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করাইয়া তিনি ইহাকে বাঙালির জাতীয় সম্পদে পরিণত করেন। এই ঘটনা ৬ দফার প্রতি তাঁহার পরিপূর্ণ অঙ্গীকারের পরিচায়ক এবং প্রকৃতই তিনি পাকিস্তানী সামরিক জান্তার শত প্রলোভনের মুখেও বাঙালি জাতির স্বার্থ সমুন্নত রাখিতে সমর্থ হন। এই সকল কারণেই ১৯৭১ সনের ৩রা জানুয়ারি তারিখে রমনা রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভা ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের অপরিসীম ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে।

১৯৭১ সনের ৭ই মার্চের ভাষণ ঃ

রমনা রেসকোর্স ময়দান ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ তারিখে পুনরায় ১০ লক্ষেরও অধিক জনসমাগমে মুখরিত হয়। ঐদিনটিতে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইহা একটি অনন্য সাধারণ দিবস। ঐদিন পাকিস্তানী সামরিক জান্তার রুক্তচক্ষু উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দেন। ১লা মার্চ হইতে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের প্রকৃত শাসকে পরিণত হন।

১লা মার্চ হইতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত এইদেশ তাঁহার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন সরকারই তখন কার্যকর ছিল না। তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশই ছিল দেশের আইন। তিনি Poet of Politics-এ পরিণত হন।

ক) <u>পটভূমিকা</u> ঃ

উল্লেখ্য যে ১৯৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। কিন্তু সামরিক জান্তার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে শেখ মুজিবের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। এই কারনে আওয়ামী লীগ হইতে কোন নির্বাচিত সদস্য যাহাতে কোন ভাবেই ৬ দফা দাবী হইতে সরিয়া না আসিতে পারেন সেজন্য শেখ মুজিব তাঁহার সকল নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া ১৯৭১ সনের ৩রা জানুয়ারি তারিখে রমনা রেসকোর্স ময়দানে ৬ দফা সমুন্নীত রাখিবার অঙ্গীকার করিয়া এক শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান করেন।

নির্বাচনের পরপরই জাতীয় সংসদ আহ্বান এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্ন ওঠে। ১১ই জানুয়ারি ইয়াহিয়া ঢাকায় আগমন করেন এবং ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারি দুই দফা শেখ মুজিবের সহিত আলোচনা হয়। ১৪ই জানুয়ারি ঢাকা ত্যাগের মূহুর্তে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে শেখ মুজিব দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী ।

ঐ সময়কার ঘটনা সম্পর্কে Siddiq Salik তাঁহার Witness to Surrender পুস্তকে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদান করেন (১৯৯৭ সংস্করণ, পৃঃ ৩৩-৩৪)ঃ

> "If anybody could intervene to break the deadlock, it was President Yahya Khan. He flew to Dacca on 12 January 1971. He used this occasion to come to a 'thorough understanding' of the Six-Points. Mujib and half a dozen of his senior colleagues were invited to the President's House to 'present' their Six-Points. Lieutenant-General S.G.M. Peerzada, Principal Staff Officer to the President, summoned Governor Ahsan to attend the meeting Ahsan, who had always been ignored in important political decisions about East Pakistan, reluctantly came over. He thought it was too late to attempt a 'thorough understanding' of the Awami League programme. It should have been done much earlier so that

necessary stepts could have been taken in time. Now when the entire province had voted for it, this move would be of little help.

Yahya, Peerzada and Ahsan sat on one side of the discussion table while Mujib, Khondkar Mushtaq, Tajuddin and their colleagues sat on the other. On the Awami League side, Mujib did most of the talking. He presented his Six Points one by one. After explaining each point, he said, 'You see, there is nothing objectionable in it. What's wrong with it ? It is so simple.' Yahya and his aides listened. General Peerzada made an observation here and there but Mujib very sweetly overruled him. Yahya Khan, in the end, said, 'I accept your Six Points. But there are strong feelings against them in West Pakistan. You should carry West Pakistan with you.' Mujib readily said, 'Of course, of course, we will carry West Pakistan with us. We will consult them. We will frame the constitution. We will frame it on the Six- Points. We will show a copy of our constitution to you. There will be nothing wrong in it.' Yahya Khan batted his heavy eye-lashes, puffed at his foreign cigarette and remained silent.

I owe this version to Vice-Admiral Ahsan. Another account of the same meeting is given by the Central Communications Minister, Professor G.W. Chaudhry, who accompanied President Yahya Khan to Dacca on this historic mission. He tells us that the President was badly hurt by Mujib's betrayal. He says :

'As soon as the (Mujib-Yahya) meeting was over, I received and answered a summons from the President's House to see Yahya. I found him bitter and frustrated. He told me, " Mujib has let me down. Those who warned me against him were right; I was wrong in trusting this person." ... When I specifically asked him, "Have you reminded Mujib about his pledges made on the eve of the elections?" Yahya's reply was made with deep anguish. "You and I are not politicians – It is difficult for me to understand their mind and way of thinking. Let us pray and hope for the best."

General Yahya Khan left for Karachi on 14 January in the same disturbed mood. I was present at Dacca airport when he answered journalists' questions. He seemed to have lost all hope for the future. No reply, comment or 'aside' gave the slightest hint

about his plans. He seemed impatient to throw the burden of further decisions onto Mujibur Rehman. In reply to a question, he said, 'Ask him (Mujib), he is the future Prime Minister of Pakistan. When he comes and takes over, I won't be there. It is going to be his government soon.

After his departure, a Bengali journalist said to me, 'The key sentence in the President's statement is "I won't be there" because the Awami League has refused to assure him of his continued presence in the President's chair under the democratic arrangement, unless he promises to authenticate the Awami League's draft Constition.' '

১৭ই জানুয়ারি ইয়াহিয়া পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে সিন্ধুর লারকানায় গমন করেন এবং তথায় জেড এ ভুট্টোর আতিথ্য গ্রহন করেন। তাহার সহিত সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদ ও লেঃ জেনারেল পীরজাদা ছিলেন। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে ভুট্টোর সহিত আলোচনায় সেনাবাহিনীরও অংশ গ্রহণ ছিল। ভুট্টোর বাসভবনে আতিথ্য গ্রহন এবং আলোচনায় সেনাবাহিনীরও অংশগ্রহন স্বভাবতই ঢাকায় প্রেসিডেন্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্ত ২৩ বৎসরের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটে বাঙালি মাত্রই প্রেসিডেন্ট ও ভুট্টোর কার্যকলাপকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরনের বিপক্ষে ইহাকে 'লারকানা ষড়যন্ত্র' বলিয়া আশংখা করিতেছিল। উল্লেখ্য যে পিপল্স পার্টি ব্যতিরেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছু সংখ্যক সংসদ সদস্য পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন জানায়।

ইয়াহিয়ার লারকানা সফর সম্বন্ধে সিদ্দিক সালিকের মন্তব্য নিম্নরূপ (Witness to Surrender,পৃঃ ৩৫) :

"The selfish broker, after a day's relaxation in Karachi, flew to Larkana as Mr. Bhutto's guest. The P.P.P. Chairman, who had naturally kept a watchful eye on the Mujib-Yahya meeting in Dacca, extended his traditional hospitality to the Preisdent and his aides. Among those who joined the President on this 'duck shooting' trip was the Army Chief, General Hamid. His presence at once inspired fearsome speculation in Dacca. The Awami League felt that a

conspiracy was being hatched, with the active support of General Hamid, to punish Mujib for his unbending attitude in the recent talks.

Then appeared an important picture on the front page of Dacca papers showing Yahya and Bhutto enjoying a stroll on the spacious lawns of Al-Murtaza. It was in sharp contrast with the tense atmosphere in which the Dacca meeting was held. A Bengali journalist close to the Awami League, said to me, 'Look at this. When Yahya comes here, one of his staff officers rings up Mujib, the majority party leader, to come and report to the President at the President's House but when he goes there, he stays with Bhutto, the minority-party leader. Is this the respect that the Army has for democracy?"

ঐ সময়কার ঘটনা সম্পর্কে হাসান জহীর তাহার 'The seperation of East Pakistan' **পুস্তকে বলেন (পৃঃ ১৩৬-১৩৭) ঃ**

"Yahya went to Larkana on 17 January for hunting, as a guest of Bhutto. Peerzada, who accompanied him, recounts the visit:

To see Bhutto after Mujib at Larkana or elsewhere was logical. Yahya enjoyed shikar and discussed current politics also. In one of the meeting Bhutto philosophized Mr. President, there are three parties to power transfer- the majority party of Mujib, the majority party of West Pakistan (the People's Party), and the Army.' Yahya snubbed him 'Zulfi, don't put me on this three-legged stool. I have done my duty.' Yahya then elaborated his discussions with Mujib and advised that there was only one party and that was the majority party emerging from the elections. Any bargaining by West Pakistan should be done with Mujib. Yahya further said that he would encourage all political parties [emphasis by Peerzada] to hold preliminary talks about the constitutional position in keeping with the LFO. 46

Bhutto has given his account of the meeting with his guests. Apart from Peerzada, Yahya had brought with him his close friend General Hamid, and one or two other generals. On arrival, Yahya with his usual joviality said that he had purposely brought Hamid

to dispel Bhutto's impression that the generals were hostile to him. Later, Yahya referring to his Dhaka meetings told the host and others : 'I had very good discussions in East Pakistan and the Six Points were explained to me. I think it is quite possible to have a Six-Point Constitution. Even in Australia, foreign trade is in the hands of the Provinces.' Bhutto observed that the President had not given careful thought to the implications of the Six Points. While it might be possible to have a settlement if Mujib compromised on two points, foreign trade and foreign aid and taxation, in their totality the Six- Points were bounds to lead to secession. Continuing, Bhutto said that while he would personally prefer to sit as leader of the opposition, he could not allow Mujib to take the posts of both Prime Minister, and President. By convention, nominations to the two posts should be made by the majority parties of the respective Wings. In the alternative, Bhutto suggested a grand coalition of the two Wings. Yahya said this was what he had suggested to Mujib.

It is easy to imagine that, given the deep suspicions about Mujib's Six-Points, Bhutto's articulation of the dangers arising from them to the country and the army itself must have created a deep impression on the generals. Karim thinks that in the Larkana meeting 'Bhutto made known to Yahya in a very subtle way that the army leadership was with him on the East-West issue. It also created suspicions in Bengali minds of a combination of the army and Bhutto to deprive East Pakistan of their electoral victory.' Yahya's choice of Bhutto's own home as the venue for political negotiations, while enjoying the lavish hospitality of the rival leader, was impolitic in the highly sensitive atmosphere of the times. The President was expected to be seen carrying on serious negotiations on critical national affairs with rival political leaders in an even-handed manner. With Mujib, the meetings were strictly according to the presidential protocol of timings and venue at the President House. In Larkana, the political negotiations were carried on in circumstances which could be interpreted as a friendly get-together of the generals and Bhutto, presided over by the President, discussing West Pakistan's strategy to counter the designs of the Bengalis."

একই সময়কার ঘটনা সম্বন্ধে Air Martial Mohammad Asghar Khan 'The Generals in Politics' পুস্তকে মন্তব্য করেন (পৃ ঃ ২৮-২৯) :

> "Reports that reached Mujib-ur-Rehman of Yahya Khan's stay at Larkana confirmed him in his view that a conspiracy had been hatched against him and Yahya Khan's Larkana visit should, therefore, be regarded as a truning point in the fortunes of the country. Mujib-ur-Rehman, who had adopted a flexible stand prior to the General selection of December 1970, began to harden his stand following his land-slide victory. However, he had probably not, until the Larkana visit, burnt his boats and even as late as mid January, led Yahya Khan to believe that he could be trusted to keep his Six Points within the framework of one Pakistan. How this would be done was not spelt out and I believe that in spite of the public stand that Mujib-ur-Rehman had taken, the matter could have been settled if Yahya Khan and Zulfiqar Ali Bhutto had been willing to surrender power to the majority party in the National Assembly-the Awami League. Since mutual distrust was rapidly mounting, the situation began to deterioate at a fast pace."

ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে প্রথমে সংবিধান রচনা ও তৎপর সরকার গঠন করিবার আহবান জানান হয় এবং সেই লক্ষে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করিবার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

ভুট্টো তাহার দলের কয়েকজন সদস্যসহ ২৭শে জানুয়ারি ঢাকায় আসেন এবং শেখ মুজিবের সহিত কয়েক দফা বৈঠক করেন। কিন্তু সংবিধান সম্পর্কিত আলোচনা অমীমাংসিত রাখিয়াই তিনি ফিরিয়া যান। বরঞ্চ প্রস্তাবিত ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের তিনি বিরোধীতা করেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট এম আই করিমকে ঢাকায় প্রেরণ করিয়া শেখ মুজিবকে ইসলামাবাদে আসিবার জন্য আমন্ত্রন জানান, কিন্তু শেখ মুজিব এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন।

অতঃপর, ১৩ই ফেব্রুয়ারির এক ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ সকাল ৯টায় ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঘোষণা করেন যে তাহার দল উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিবে না।

১৫ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এক যৌথ বৈঠকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতা দলীয় প্রধান শেখ মুজিবের উপর অর্পণ করা হয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারি সংসদীয় দলের বৈঠকে শেখ মুজিবকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচন করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি পার্টির সহকারী নেতা নির্বাচন করা হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খানের সহিত ভুট্টোর ৫ ঘন্টা ব্যাপী এক আলোচনা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান তাহার বেসামরিক মন্ত্রীসভা বাতিল করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি প্রদেশদ্বয়ের গভর্নর ও সামরিক প্রশাসকদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায়ই পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণ হইয়া যায়। হাসান জহীর এর ভাষায় (পৃঃ-১৪০-১৪৩) ঃ

> "On 22 February, Yahya called a conference of the Governors and MLAs; Hamid, Peerzada, and others were also present. Yahya brought up the political deadlock on the Assembly session. Sahibzada gives this account of the meeting:
>
> The opinion was generally but not unanimously against any postponement of the Assembly session. But Yahya seemed to have made up his mind. I and Ahsan requested for a private meeting. The President left the Cabinet room and took me, Ahsan, Hamid, and Peerzada to the side-room. I and Ahsan expalined the very serious consequences of any postponement. Yahya wanted to impose open-sword martial law to roll back the political situation to what it was in 1969. We said it was impossible now. He was adamant but said he would further discuss it next morning. That night I could not sleep and drafted a letter to Peerzada for the President bringing out the full implications of postponement and re-introduction of naked martial law. Both I and Ahsan were staying in the East Pakistan House and in the morning I showed this handwritten letter to Ahsan who endorsed it. We went to the President's Secretariat and I gave this handwritten letter to Peerzada who read it and remarked, 'it will create trouble'. But he did not say whether he agreed with its contents or not. Meanwhile, the buzzer came from the President and we were ushered into his office. Peerzada placed my letter before the President who read it once and then again. Yahya was a bit shaken

but stuck to his views. He thought 'a whiff of the grapeshot' would do the trick and reimposition of the rigours of martial law would create no problems. We could not convince the President. He remained adamant regarding postponement unless Mujib could be persuaded to make concessions on the Six Points to enable Bhutto and other West Pakistan leaders to attend the Assembly session. But we dissuaded him from re-introducing the naked martial law. Peerzada during all this time did not say a word. ....

....

Peerzada was in favour of postponement as he told me: 'If the National Assembly had not been postponed and met as earlier announced on 3 March I have no doubt that Awami League would have declared independence.'

The decision to postpone the National Assembly meeting is regretted, in retrospect, by the West Pakistani intelligentsia as a tragic decision which led to the break up of Pakistan. A considerable body of opinion holds Bhutto responsible for it. Two aspects of the situtíon, as it had emerged in the last week of February, need to be highlighted to put the controversy in its proper perspectibve. It may also be mentioned in passing that, at the time these momentous decisions were taken, they were not criticized by the Press or the intelligentsia of West Pakistan in the manner in which they are now, with the acquired wisdom of hindsight. In fact, most of the vocal classes and formus hailed them and welcomed the army action eventually taken in the last week of March. The opposition to Yahya came from Admiral Ahsan and the generals serving in East Pakistan who were more realistic than the generals in Rawalpindi. In their courageous stands they got no support from any quarter and in West Pakistan at the time were even condemned as traitors for pleading peace and harmony between the two Wings of the country.

....

The linkage between the five and a half hour Bhutto-Yahya meeting on 19 February and the amendment in the LFO on 20 February, which enabled Bhutto to strengthen his conrol over recalcitrant party men, is too obvious to be missed. During the

Governor's Conference two days later, Ahsan found the atmosphere in Rawalpindi one of crisis and military intervention. All this shows that Yahya's thought-processes had started transforming after the Larkana meeting. The pressures exerted by Bhutto and the hawkish generals and the continued truculence demostrated by Mujib led Yahya to seriously consider the re-imposition of naked-sword martial law to regain control over the sitution. It is alleged that there was an understanding between Bhutto and the central army leadership to prevent the Awami Legague from implementing the Six Points, which it would have if the National Assembly had been allowed to meet. The course of political affairs after the Larkana meeting lends credence to the convergence of the army's perceptions with Bhutto's of the dangers posed by the Awami League to the integrity of Pakistan.

……………………………………………………………………………

The position that emerges from the above analysis of the various factors in the February situation is that Bhutto, in opposing Mujib and the Six Points, was really articulating the stand of the West Pakistani establishment. His refusal to go to the National Assembly had the full support of Yahya and the Rawalpindi generals. It would not be fair to blame Bhutto for the postponement of the Naitonal Assembly session unless it is conceded that the Six-Points were acceptable to the army, the establishment, and to West Pakistan in general. If the Six Points were acceptable to Yahya then he need not have postponed the Assembly session. The Army could have easily ensured the security and attendant West Pakistani members as were willing to attend the session, Bhutto's threat of dire consequences notwithstanding. But Yahya gave no assurance of security of the person of the political leaders who intended to attend the session. He rather flippantly told them, when they came to see him after Bhutto's Lahore speech of 28 February 'when your legs are borken, you tell me and then I will do something. In Fact, Yahya seems to have used Bhutto go get out of the situation created by his thoughtless decisions. Bhutto, on the other hand, used Yahya to build himself up as the sole leader of West Pakistan and earned the permanent odium of forcing the postponement of the

Assembly, leading to the secession of East Pakistan. Bhutto could have as effectively adopted the democratic path of attending the session and using the Assembly floor for whatever he wanted to project. In the last resort, he could have walked out after showing that he had exhausted all constitutional means to maintain the integrity of Pakistan."

এই সময়কালীন ঘটনা সম্বন্ধে আসগার খান বলেন (Generals in Politics, পৃঃ ২৮) :

Bhutto had all along maintained close liasion with Yahya Khan and after his visit to Dacca invited him and his close advisers, Generals Hamid and Pirzada, to Larkana as his guests. They stayed there for a few days and were enternained lavishly. If a holiday and relaxation and been the only purpose of the visit, perhaps the results would not have been as disastrous for Pakistan as they turned out to be. Unfortunately, fateful decisions were taken and it was agreed in principle that force would be used in East Pakistan if Mujib-ur-Rehman did not change his attitude. These decisions were ratified in a more representative meeting of the Junta in Rawalpindi in mid February.

In one of my conversations with Yahya Khan in the middle of 1970, he told me that in a meeting a few days earlier, Bhutto had suggested to him that he should forget about the elections. Yahya khan said that Bhutto had told him that, Yahya Khan the soldier and Bhutto the politician, would make a very good team and could together run the country. Yahya Khan said that he had replied that this made some sense and had asked what he proposed to do about East Pakistan. To this, according to Yahya Khan, Bhutto had replied, "East Pakistan is no problem. We will have to kill some 20,000 people there and all will be well." When I asked Yahya Khan as to what was his reaction to this suggestion, he had shrugged his shoulders and said, "What can one say to such a suggestion." Thus, what prior to the elections of 1970 had appeared absurd had by February 1971 become wrothy of serious consideration.

(অধোরেখা প্রদত্ত)

প্রাক ১লা মার্চের ঘটনাবলী লইয়া Lt. General (Retd.) A.A.K. Niazi তাহার 'The Betrayal of East Pakistan' (1998) পুস্তকে বলেন (Preface p-XXIV-XXVI) :

Immediately after the 1970 elections Mr. Bhutto had asked M.M. Ahmad, Adviser Economic Affairs Division, and Mr. Quamar-ul Islam, Deputy Chairman Planning Commission, to prepare a paper for him to prove that West Pakistan could flourish without East Pakistan. In February 1971 Major-General Omer was telling the politicians not to go to Dhaka to attend the National Assembly session because, he said, Dhaka had become the hub of intrigue, and it would be better to quit East Pakistan. Mr. Bhutto was admonishing the elected members of the Assembly that those who went to Dhaka for the session would be punished serverely. He said conclusively that the East and West Wings should leave each other alone in his famous utterance '*Idhar hum, udhar tum'*(me here, you there). Bassically Bhutto was not prepared to accept the role of opposition leader of a united Pakistan; his endeavours were therefore directed at compromising Mujib's right to form the government, which would only be possible if East Pakistan gained independence.

The final plan for the dismemberment of Pakistan was hatched between General Yahya and Bhutto at Larkana, Bhutto's home town. The plan, which came to be known as the M.M. Ahmed plan, aimed at abandoning East Pakistan without a successor government, which meant by losing the war. So all the effors of Yahya's junta and Bhutto's coterie were directed towards losing the war. They neither desired a political settlement, nor did they want a cease-fire. Instead of working on the plan, 'Battle of East Pakistan will be fought in West Pakistan', which was evolved at the very inception of Pakistan to keep Pakistan united, they were working on the plan, 'Lose East Pakistan without a successor government.'

(অধোরেখা প্রদত্ত)

রাওলপিন্ডিতে ২২শে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত গভর্ণর ও সামরিক প্রাশসকদের সভার প্রভাব সম্বন্ধে সিদ্দিক সালিক বলেন (Witness to Surrender, পৃঃ ৩৮-৪০:)

Two days after Bhutto announced his decision, Yahya Khan dismissed his civilian cabinet. It marked the end of civilian involvement in his regime and a reversion to pure Martial Law rule. Two days later, he called his military governors and martial law administrators for a conference in Rawalpindi. Lieutenant-General Yakub and Vice-Admiral Ahsan were to attend from East Pakistan. They were to meet on 22 February.

……………………………………………………………………………………

I do not know what they discussed and decided in Rawalpindi but I know the impact of their deliberations in Dacca. The news that reached us there was that Mujib would be given one more opportunity to prove his good intentions othewise 'Martial Law would be reimposed (that is, enforced) in its classical role.' This implied two things. One, that renewed efforts for a political dialogue with Mujib would be made. Two, that military plans for regaining control would be finalized. Work on both commenced simultaneously in Dacca immediately after the return of General Yakub and Admiral Ahsan. Ahsan held rounds of talks with Mujib trying to convince him that he should climb down from his position on the Six Points to make them acceptable to West Pakistan. Ahsan told him, You preach the Six Points for East as well as West Pakistan whereas the people in the West Wing have strong feelings against them. You, therefore, should make a big gesture to wipe out the popular sentiments against them.' Mujib, according to Admiral Ahsan, promised to make the gesture. He announced a few days later that he would not insist on the application of the Six Points to the West Wing. As to the contents of the Six Points vis-a-vis East Pakistan, he did not budge an inch.

General Yakub also ordered his staff to finalize the operational plan 'BLITZ' which was originally prepared by Headquarters 14 Division for internal security. I, too, was asked to put the final touches to my mini-plan for a total press censorship in East Pakistan. It was to be incorporated in the main 'BLITZ' plan. 'Prepare it in such a way that on the green signal, you enforce complete censorship without raising any queries,' said the brigadier. 'But may I ask one question now ?' 'Yes,' he replied. I said,' 'What is

> the basis of this plan?' Should I assume that the civil servants are on our side- because censorship is normally carried out with the help of civilian press officers ?' He said rather angrily, 'I don't know. It is your job to assess their reaciton and find any answer to your problem....... But don't get it (the plan) typed. Make only one copy in your own hand and deposit it with me today.
>
> Two infantry battalions-22 Baluch and 13 Frontier Force- started flyng in by P.I.A. on 27 February. The process continued till 1 March. The local Brigade Headquarters (57 Brigade) was asked to receive the additional troops and integrate them into the new operational plan. The Bengali brigade major was kept out of this arrangement for reasons of security. But hundreds of troops landing at Dacca, an airport manned mostly by Bengalis, could not be kept a secret.

২৭শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের অনুষ্ঠিত সভায় ৬ দফার ভিত্তিতে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন করা হয় ।

১৯৭১ সনের ১ লা মার্চ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা ৩রা মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান হইতে জাতীয় পরিষদ সদস্যগণের ঢাকায় আগমন এবং আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি ৬ দফার ভিত্তিতে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত সভার সংবাদ পরিবেশন করে। এদিকে ঢাকায় তখন ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখ হইতে বিসিসিপি টিম ও ইন্টারন্যাশনাল একাদশ টিমের মধ্যে ক্রিকেট খেলা ঢাকা ষ্টেডিয়ামে চলিতেছিল এবং ঢাকাবাসী তথা সমগ্র প্রদেশবাসী উক্ত খেলা স্বচক্ষে বা রেডিও মারফৎ অত্যন্ত আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেছিল।

২রা মার্চ তারিখের ইত্তেফাক পত্রিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ৩রা মার্চ তারিখে আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের অপেক্ষায় সমগ্র দেশ একটি উৎসব মূখর পরিবেশে অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। যে আকাঙ্খা লইয়া পূর্ববঙ্গবাসী ১৯৪৬ সনে পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে স্বতস্ফূর্তভাবে তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়াছিল সেই পাকিস্তানের একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণীত হইতে যাইতেছে,

নিপীড়িত বাঙালি এই প্রথম বারের মত নিজেদের ভাগ্য গড়িবার সুযোগ পাইতে যাইতেছে। এই সকল আশা আকাঙ্খার দোদুল্যমান অবস্থায় দেশের আপামর জনসাধারণ যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান তখন হঠাৎ করিয়াই বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় অপরাহ্ন ১ঃ০৫ মিনিটের সময় রেডিও পাকিস্তানের বিশেষ অনুষ্ঠানে পঠিত প্রেসিডেন্টের একটি বিবৃতিতে জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

ঐ সময়ে ঢাকা ষ্টেডিয়ামে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক দর্শক পরম উৎসাহে ও আনন্দ সহকারে ক্রিকেট খেলা উপভোগ করিতেছিল। ঢাকাসহ সমগ্র প্রদেশে অফিস-আদালত, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র যাহার যাহা কার্য তাহাই স্বাভাবিক ভাবে করিতেছিল। ঢাকা শহর ছিল শান্ত সুনসান আনন্দমুখর। সর্বত্রই যেন উৎসবের আমেজ বহমান। বহু প্রতীক্ষিত গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়া পাইবার একটি স্নিগ্ধ আনন্দঘন পরিবেশ। কিন্তু হঠাৎ বজ্রাঘাতসম এই সংবাদে ক্ষণিকের জন্য সকলেই স্ত ব্ধ-হতবাক। তৎপর মূহুর্ত মধ্যে আশাহতের বিস্ফোরণ। এই সংবাদে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নামিয়া আসে। কোন নেতার ডাকের প্রয়োজনীয়তা কেহ অনুভব করে নাই। মুহুর্তেই ষ্টেডিয়াম হইতে বিক্ষুব্ধ দর্শকগণ বাহির হইয়া পড়ে। খেলা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হইয়া যায়। সকল স্তরের আপামর জনসাধারণ স্বতস্ফূর্তভাবে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। এইভাবেই ১লা মার্চ তারিখের দ্বিপ্রহর ১ঃ০৫ মিনিটে পাকিস্ত ানের বিদায় ঘন্টা বাজিয়া উঠিল।

সমগ্র প্রদেশ এই অপ্রত্যাশিত ঘোষণায় স্তম্ভিত হইয়া যায়। সম্বিত ফিরিয়া পাইয়াই প্রচন্ড বিক্ষোভে বিসুভিয়াসের মত ফাটিয়া পড়ে। নির্বাচনের পরেও শেখ মুজিব যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই সত্যে পরিণত হইল।

এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে ২রা মার্চ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় **'প্রতিবাদে রাজধানীতে প্রচন্ড বিক্ষোভ'** শিরোনাম নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ঃ

> " বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের মাত্র দুইদিন পূর্বে গতকাল (সোমবার) বেলা ১টা ৫মিনিটের সময় আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করিয়া পাকিস্তান বেতারে প্রেসিডেন্টের বিবৃতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ঢাকা প্রচন্ড ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। প্রেসিডেন্টের এই বিবৃতি প্রচারে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের

ক্ষোভ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরের সকল দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়। সরকারী-বেসরকারী অফিস, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, কলকারখানার শ্রমিক এবং আদালতের আইনজীবিগণ রাস্তায় নামিয়া আসেন। গোটা শহর কিাত ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যূত্থানের ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। শিল্প এলাকা, কলকারখানা, অফিস-আদালত এবং বিভিন্ন মহল্লা হইতে অসংখ্য স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বাহির হয়।

ঢাকা বারের সদস্যগণও স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বাহির করেন। রাজধানীতে টাউন সার্ভিস বাসও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হইয়া যায়।

মিছিলকারীদের চোখে-মুখে ক্ষোভানল পরিলক্ষিত হইতেছিল। বজ্রকণ্ঠে তাঁহারা মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া ভুট্টো ও শোষণবিরোধী শ্লোগান দান করেন। এই সময় ঢাকা ষ্টেডিয়ামে বি,সি,সি,পি টিম এবং ইন্টারন্যাশনাল একাদশ টিমের মধ্যে অনুষ্ঠানরত খেলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাঙ্গিয়া যায়।

ষ্টেডিয়াম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বহিরাগত ক্রীড়াদর্শকগণ রণপ্রস্তুত সৈনিকের ন্যায় লাঠিসোটাসহ মিছিলে সামিল হইয়া যায়। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার মিছিলগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মুখ হইতে নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে মতিঝিলস্থ হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বেলা ৩ টার দিকে হোটেল পূর্বাণীর সম্মুখভাগ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়।

উল্লেখযোগ্য যে বেলা সাড়ে ৩টায় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ছিল। বৈঠক শুরু হইবার পূর্বেই পূর্বাণী হোটেল এলাকায় তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। এই সময় মতিঝিলস্থ এলাকার বিভিন্ন ভবনের ছাদে দাঁড়াইয়া হাজার হাজার মানুষ শেখ সাহেবের নির্দেশ লাভের আশায় প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। বৈঠক শেষে সংগ্রামের কর্মসূচী ঘোষণা করা পর্যন্ত জনতা পূর্বাণী হোটেল এলাকায় দাঁড়াইয়া থাকেন।

ইতিমধ্যেই পল্টন ময়দান এক স্বতঃস্ফূর্ত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এই সময়ও রাজধানীর বিভিন্ন মহল্লা এবং শহরতলি এলাকা হইতে একের পর এক মিছিল পল্টনের দিকে আসিতে থাকে।

পল্টনের স্বতঃস্ফূর্ত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আঃসঃমঃ আব্দুর রব, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন, আটষট্টি-ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নায়ক জাতীয় পরিষদের সদস্য জনাব তোফায়েল আহমদ, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক-জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান প্রমুখ ভাষণ দান করেন।

এই বিশাল জনসমুদ্র জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান

কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। বিশাল জনসমুদ্র জনগনের অধিকার আদায়ের জন্য বজ্র শপথ গ্রহন করেন।

সভার বিভিন্ন বক্তা দলমত নির্বিশেষে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহবান জানান। সভাশেষে বিশাল জনসমুদ্র মিছিল করিয়া নওয়াবপুর সদরঘাট, ইসলামপুর, চকবাজার হইয়া শহীদ মিনারে গমন করেন। মিছিলকারীগণ আজ (মঙ্গলবার) শহরে পূর্ণ হরতাল পালনের আহবান জানান।

আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে গতকাল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে (মতিয়া গ্রুপ) এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হয়। তাঁহারা বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক জনসমাবেশের আয়োজন করেন। সভায় ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত প্রতিহত করার শপথ গ্রহন করা হয়।

ইহার পূর্বে ঢাকা বারের আইনজীবীগণ মিছিল করিয়া বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমবেত হন তাঁহারা বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে শাহ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে একসভা অনুষ্ঠান করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গতকাল সকাল হইতে পোস্তাগোলা এলাকার শ্রমিকগণ 'ভুট্টোর ভূমিকার প্রতিবাদে' শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

ইহাছাড়া, গতকাল সন্ধ্যা এবং রাতেও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যাহত থাকে। সন্ধ্যায় রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে স্বতঃস্ফূর্ত পথসভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল বিকালে শহরের সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইলেও একশ্রেণীর কয়েকজন লোক নাজ সিনেমা হলের টিকেট কাউন্টারে অগ্নি সংযোগ করার প্রয়াস পায়। ইহাতে সিনেমা হলের সামান্য ক্ষতি হয়। অবশ্য পরে জনসাধারণ আগুন নিভাইয়া ফেলেন।

ইহাছাড়া, রাজধানীর কোন কোন এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ড বাংলা লেখার নীচে ইংরেজী লেখা থাকায় একশ্রেণীর অতিউৎসাহী ব্যক্তি ইংরেজী লেখা মুছিয়া ফেলে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়।

কমলাপুরে প্রতিবাদ সভা

গতকাল সন্ধ্যায় কমলাপুর ইউনিয়ন ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের এক সভায় জাতীয় পরিষদ স্থগিতের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। জনাব ওয়ারেশ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সভায় জনাব আব্দুল মতিন, জনাব সাফায়েত হোসেন, কোম হোসনে আরা আসাফুদ্দৌলা প্রমুখ মানুষের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলনের মুখে আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন।

সভায় একতা শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য কমলাপুরের আধিবাসীদের প্রতি আহবান জানান হয়। সভায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখারও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

পি,আই,এ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সংবাদ শ্রবণের অব্যবহিত পরেই ঢাকাস্থ পি,আই,এর সকল কর্মচারী জনসাধারণের সহিত রাস্তায় নামিয়া আসেন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

আদমজী মিলের শ্রমিকদের কাজ বর্জন

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতকরণের প্রতিবাদে আদমজী জুটমিলের শ্রমিকগণ কাজ বর্জন করিয়া এক বিশাল শোভাযাত্রা বাহির করে।

পরে বিকাল ৫টায় আদমজী ফুটবল মাঠে আদমজী জুট মিল শ্রমিক ইউনিয়ন, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগ ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ আব্দুল মালেক সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রমিক নেতা জনাব নূর আহম্মদ খান, ডাঃ নুরুল হুদা, জয়নাল আবেদিন, জনাব নুর মোহাম্মদ, জনাব গোলাম মওলা, জনাব মোবারক আলী প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় প্রস্তাবে কালবিলম্ব না করিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করা দাবী জানান হয়।

অধিবেশন স্থগিত রাখায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া **শেখ মুজিব বলেন** (ইত্তেফাক প্রতিবেদন)ঃ

--------শুধু সংখ্যালঘিষ্ট দলের সেন্টিমেন্টের জন্য পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছে এবং আমরা উহা নীরবে সহ্য করিতে পারি না। ইহার দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে। পরিষদ অধিবেশনের জন্য বাংলাদেশের সকল সদস্যই ঢাকায় ছিলেন। জনাব ভুট্টো এবং জনাব কাইয়ুম খানের দল ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানী সকল সদস্যই অধিবেশনে যোগ দিতে রাজী ছিলেন।

------- তিনি বলেনঃ আমার দল আমাকে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করার ক্ষমতা দিয়াছে। তিনি বলেন যে, পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যগণ গত ৩রা জানুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে যে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন উহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।(অধোরেখা প্রদত্ত)

এই প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাহার "How Pakistan Got Divided" পুস্তকে বলেন (বঙ্গানুবাদ ঃ বাংলাদেশের জন্ম, পৃঃ ৫৯)ঃ

১লা মার্চের দুপুরে যখন পরিষদের অধিবেশন মুলতবি সংক্রান্ত ঘোষণাটি প্রচারিত হল, তখন প্রত্যেক বাঙালীর প্রতিক্রিয়া ছিল সহিংস এবং সকলের ভেতরেই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার মারাত্মক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। সমগ্র বাঙালী জাতিই এবার যুদ্ধের পথে নেমে গিয়েছিল। ঘোষণাটির মধ্য দিয়ে ছাঁচ তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, অধিবেশন মুলতবি করার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ১ মার্চেই পাকিস্তানের ভাঙন ঘটেছিল। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী ছিল প্রধান ঘটনার অনুসরণ মাত্র।

দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে রেডিওতে ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে সকল স্তরের মানুষ কাজ বন্ধ করে দিয়ে হোটেল পূর্বাণীর বাইরে সমবেত হতে শুরু করেছিল যেখানে শেখ মুজিব ও তাঁর দলের এম এন এ দের অধিবেশন চলছিল। জনতা বাঁশ, লাঠি, তীর, লোহার রড প্রভৃতিতে সজ্জিত ছিল। ঢাকা ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামে বিসিসিপি একাদশ ও আন্তর্জাতিক একাদশের মধ্যকার খেলার দর্শকরা ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। তারা মাঠে ঢুকে গিয়ে মুলতবির বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে এবং অবিলম্বে খেলা বন্ধ করার দাবি জানায়। এই দাবি দ্রুত মানা হয় এবং খেলোয়াড়দের প্রহরা দিয়ে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রদেশিক সচিবালয়ের সকল ষ্টাফ কাজ বন্ধ করে দিয়ে সাথে সাথে বেরিয়ে আসে। ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবীরা মিছিল বের করেন। স্লোগান মুখরিত ছাত্রদের সঙ্গে সকল আন্দোলনকারী একযোগে হোটেল পূর্বাণীর দিকে চলে আসে, তারা শেখ মুজিবুর রহমানের কথা শুনতে চায়। বিকেল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবি করার সিদ্ধান্তকে সর্বাত্মকভাবে চ্যালেঞ্জ করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন। তিনি ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা প্রদেশে হরতাল আহ্বান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজের শক্তি পরিমাপ করা এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশাসনকে বোঝানো। পরে, সেদিন বিকেলে পল্টন ময়দানে জনতা সমবেত হয়। এখানে ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি ও নবনির্বাচিত এম এন এ তোফায়েল আহমদ ও আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন, জাতীয় শ্রমিক লীগের আবদুল মান্নান ভাষণ দেন। জনতার জঙ্গী মেজাজ থেকে এ কথা তখন পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তারা আর শুধু ভাষণে সন্তুষ্ট নয়, তারা চায় অ্যাকশন। কিছু দুস্কৃতকারী জিন্নাহ এভিনিউতে অস্থানীয়দের সম্পদে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর পর নওয়াবপুর এলাকায় লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর খবর আসে নারায়ণগঞ্জ রাইফেল ক্লাব থেকে। ছাত্রদের একটি দল সেখান থেকে সাতটি রাইফেল ও ৩০০ রাউন্ড গুলী জোর করে ছিনিয়ে নেয়। পিআইএ-র কর্মচারীরাও কাজ বন্ধ করে দেয়, যার ফলে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল অচল হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার দিকে নগরীর বিভিন্ন স্থানে জনগণকে ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে জমায়েত হতে দেখা যায়, রাত্রি হওয়ার পর অবশ্য তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

১লা মার্চের ঘোষণায় বাঙালি কিভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহা ব্রিগেডিয়ার এ,আর, সিদ্দিকী লিখিত 'East Pakistan The Endgame'পুস্তকে পাওয়া যায় (পৃঃ ৬৩)ঃ

As expected, East Pakistan exploded like a powder keg. The reaction there was instant and tumultuous. The cricket match being played between Pakistan and the Commonwealth XI at the Dhaka stadium had to be abandoned after angry crowds attacked the playing field. Mujib announced a general strike and launched a 'non-violent' civil disobedience movement. He seized the civil government and issued his own orders and proclamations to run the administration.

I submitted a note to Gul Hassan suggesting an immediate remedial action, including the announcement of a fresh date for the assembly session, a broadcast to the nation by the president, and his immediate departure for Dhaka. I feared that even if Mujib himself did not favour a unilateral declaration of independence, he might not be able to resist the demands of his party men and all the public pressure that was piling up on him. Bhashani had already said *Assalam Alekum* to West Pakistan during the November cyclone. Ataur Rahman had demanded autonomy on the basis of the Lahore Resolution. And then there were the extremists within the Awami League- Tajuddin, Syed Nazrul Islam and Tofail. How would any political leader be able to resist all these presssures ? There was a dire need for an immediate and positive action to preserve the unity of the country.

(খ) ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চের ভাষণ ঃ

১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ তারিখে রমনা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০(দশ) লক্ষাধিক মানুষের সম্মূহে তাঁহার ২০ মিনিট ব্যাপি বক্তৃতায় বাঙ্গলার মানুষকে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন। এই ভাষণের মধ্য দিয়াই বাঙ্গলার স্বায়ত্বশাসনের দাবী স্বাধীনতার দাবীতে পরিণত হইল। এই বক্তৃতার মধ্য দিয়াই পূর্ব পাকিস্তান বা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসের সমাপ্তি এবং বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসের প্রারম্ভ। বাঙ্গলাদেশের সার্বিক মুক্তি আন্দোলনের শুরু।

জনাব শাহরিয়ার ইকবাল ১৯৭১ সনের মার্চ মাসে ঢাকায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আব্দুল হামিদের অতি নিকটবর্তী স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া রেসকোর্স ময়দানের অবস্হা অবলোকন ও শেখ মুজিবের ভাষণ শ্রবণ করিবার দূর্লভ অভিজ্ঞতা তাহার হইয়াছিল। তাহার ভাষায় (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ-১, পৃঃ ২১৪)ঃ

" ১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চ রেসকোর্সের ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন ঢাকার ডেপুটি কমিশনার এ.টি.এম. শামসুল হক এবং সদর এস.ডি.ও এম. নুরুজ্জামান আমাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রেসকোর্সের ম্যানেজারের বাসা ছিল একটি টিলার উপর। নীচে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। এখানে এখন পুলিশ কন্ট্রোলরুম। আমরা টিলার উপর অবস্থান নিয়ে ছিলাম। রেসকোর্স ম্যানেজারের বাসা থেকে কয়েকটি কাঠের চেয়ার আমাদের বসবার জন্য দেয়া হলো। ডি.সি., এস. ডি.ও. এবং আমি সেখানে বসলাম। নীচে বিশাল জনতার ঢল। বঙ্গবন্ধু মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেয়ার জন্য উপস্থিত হবেন। কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটি খোলা জীপে একজন সিনিয়র আর্মি অফিসার আসলেন। ড্রাইভ করছিলেন একজন অফেব্রুয়ারি আর্মি ক্যাপ্টেন। পিছনের সীটে দুইজন অস্ত্রধারী আর্মি জওয়ান। এস.ডি.ও.নুরুজ্জামান সাহেব জানালেন এই ব্যক্তি হচ্ছেন পাকিস্তানের আর্মির সর্বাধিনায়ক, জেনারেল হামিদ। তিনিও এসে বসলেন একটি কাঠের চেয়ারে। অদূরে আর্মির ওয়ারলেস-এ জওয়ানেরা কথা বলছিল পাঞ্জাবী ভাষায়। ১৯ মিনিটের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সেদিন ঘোষণা দিলেন,

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বঙ্গবন্ধু সেদিন অন্য কোন ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে উপর থেকে এয়ার ফোর্সের বিমান গুলিবর্ষণ করে লক্ষ জনতাকে নিহত করতো। তিনি ফেব্রুয়ারি জাতিকে এমনভাবে স্বাধীনতার কথা শোনালেন যে জনতা ঠিকই বুঝল, কিন্তু পাকিস্তানী জেনারেল সাহেব কিছুই করতে পারলেন না। রাজনৈতিক সভার Long-hand notes নেয়, এস.বি. সাব-ইন্সপেক্টর দু'জন। সেই নোট Attest করতে হয় একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে। মিটিং শেষ হওয়ার সাথে দুইজন এস.বি. সাব-ইন্সপেক্টর Attestation -এর জন্য আমার কাছে এলো। আমি সত্যায়িত করলাম। তখন বুঝতে পারি নাই ইতিহাসের অন্য একটি "Magna Carta" আমি সত্যয়ন স্বাক্ষর করলাম। "

প্রকৃতপক্ষেই ৭ই মার্চের ভাষণ অনন্য সাধারণ । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলির মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শুধু তাহাই নয়। বাংলার জনগণ তাহাদের নেতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে সচেষ্ট ছিল।

৭ই মার্চ তারিখের ঘটনা সম্বন্ধে রাও ফরমান আলী তাহার পুস্তকে বর্ণনা দেন (পৃঃ ৬৯-৭৩) ঃ

> আমরা যখন ৭ই মার্চ ঢাকায় নামছিলাম, মুজিব তখন প্রায় সাত লাখ মানুষের বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিমানটি নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় আমরা সবাই এক জনসমুদ্র দেখলাম। আমি জেনারেল টিক্কার দিকে ঘুরে বললাম, "ঢাকায় এ রকমটিই ঘটে থাকে।" আমি বুঝিয়েছিলাম, পরিস্থিতি পশ্চিম পাকিস্তানের মতো সহজ নয়।
>
> আমরা মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে পৌছানোর আগেই ভাষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তুচ্ছ ও হীন অবস্হায় ইয়াকুব সেখানে ছিলেন। একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করা তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ টিক্কাকে প্রথমেই রেডিও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি আলটিমেটামের সম্মুখীন হতে হয়। তারা শেখ মুজিবের রেকর্ডকৃত ভাষণ পুনঃপ্রচারের অনুমতি চেয়ে জানিয়েছিল, অনুমতি না দেয়া হলে তারা বয়কট করবে। একজন কিভাবে অমন একটি মারাত্মক রাষ্ট্রবিরোধী বিষময় ভাষণ সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতারে প্রচার করার অনুমতি দিতে পারে? কিন্তু জনগণ ছিল মুজিবের সঙ্গে। টিক্কা সমস্যাটি কেন্দ্রকে জানালেন। এইচকিউ সি এম এলএ-র ভীতি ছিল, হয়তো একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হবে। তার চেয়ে কম যে কোনো কিছু গ্রহণযোগ্য ছিল। মুজিব খুব চতুরতার সঙ্গে এক তরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। ১৪ ডিভিশনের জিওসি জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা মাত্র একদিন আগে মুজিবকে একটি হুমকির বার্তা পৌছে দিয়ে এসেছিলেন এবং সে কারণেই মুজিব তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছিলেন। রেডিওকে ভাষণ প্রচারের অনুমতি দেয়া হলো। দেয়া না হলেও অবশ্য তারা ওটা প্রচার করতই। কারণ ৭ই মার্চ থেকে সরকারের সকল সংস্থাই মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অসহায়ত্ব সম্পূর্ণরুপে পরিস্কার হয়ে পড়েছিল; তথাপি পতনোম্মুখ পরিস্হিতির জন্য যথোপযুক্ত কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ রাওয়ালপিন্ডি থেকে নেয়া হয়নি।

শেখ মুজিব তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে আরো ব্যাপক ভিত্তিতে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। জনগণের মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি প্রেসিডেন্ট আহুত ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে

আওয়ামী লীগের অংশ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে নিচের দাবিগুলো উপস্থিত করেছিলেনঃ

ক. অবিলম্বে মার্শাল ল প্রত্যাহার;

খ. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর;

গ. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া এবং

ঘ. সেনাবাহিনীর গুলী বর্ষণ ও মানুষ হত্যার ঘটনাসমূহের তদন্ত অনুষ্ঠান।

এগুলো ছাড়া শেখ মুজিব জনগণকে খাজনা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর অন্য নির্দেশগুলোতে বলা হয়ঃ সকল সরকারি/আধা-সরকারি কর্মচারি 'হরতাল' পালন অব্যাহত রাখবে, রেল ও সমুদ্র বন্দরসমূহ সামরিক পরিবহনের কাজে অস্বীকৃতি জানাবে, রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্র কেবল বাংলাদেশমুখী সংবাদ ও অনুষ্ঠানমালা প্রচার ও প্রকাশ করবে; টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা শুধু 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যন্তরে কাজ করবে; ব্যাংকগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো অর্থ পাঠাবে না; বাঙালী ইপিআর-এর সহযোগিতা নিয়ে পুলিশ আইন শৃংখলা রক্ষা করবে এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। 'বাঙালী ইপিআর'-এর উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের প্রতি ট্রুপসের আনুগত্যকে খর্বিত করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারদের মান্য করুক। এর মাধ্যমে তিনি বাঙালী ট্রুপসকে বিদ্রোহ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এগুলোর অনুসরণে পরদিন সরকার পরিচালনায় আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী জারি করা হয়েছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, তিনি সরকারের নিয়ন্ত্রণ দখল করেছিলেন। বাস্তবে একটি সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চার দফা দাবি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মহল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানেরও কিছু রাজনীতিক তা সমর্থন করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। ১৬ তারিখ সন্ধ্যায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয় যাতে প্রায় সকল পশ্চিম পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসার যোগ দেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত বিস্ময়কর ও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেন, "জাতির পিতাও দুই পাকিস্তানের ধারণার বিরোধী ছিলেন না। তেমন একটি ধারণার বিরোধিতা করার আমি কে ?" ১৯৪৭ সালের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার ধারণাটি উপস্থাপিত করেছিলেন সোহরাওয়ার্দী। সাম্প্রতিকালে জনাব ভুট্টোও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'জন প্রধান মন্ত্রীর কথা বলছিলেন।

আমি ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন মাসুদই কেবল পরিস্থিতির ব্যাপারে আমাদের মারাত্মক উদ্বেগের এবং মিলিটারি অ্যাকশনের বিপদের কথা ব্যক্ত করেছিলাম। প্রেসিডেন্ট আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা নাকচ করে দেন এবং এর মধ্যে দিয়ে মনে হয়েছিল যে, তিনি এমন কি কনফেডারেশন গ্রহণ করার মতোও উদার মনোভাব দেখাবেন। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর ক্ষমতা দিয়ে একটি ফেডারেশনের ধারণার মধ্যে সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে।

(গ) বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ঃ

যেহেতু শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ বাহিনীর ফেব্রুয়ারি সদস্যসহ আবালবৃদ্ধবণিতা সকল স্তরের জনগণকে স্বাধীনতার জন্য শুধুমাত্র অনুপ্রেরণা যোগায় নাই বা উদ্বুদ্ধ করে নাই, বরঞ্চ স্বাধীনতার জন্য সকলকে উন্মাদনা প্রদান করিয়াছিল । সেইহেতু ৭ই মার্চের ভাষণটির পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল (দলিলপত্র ঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৭০০-৭০২) ঃ

“বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণ

(টেপ রেকর্ড থেকে লিপিবদ্ধ) ।

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম ? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস- এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ-এদেশের করুণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয় লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল-ল’ জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৪ সালে ৬-দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব

বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন- আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয় পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করব- এমনকি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও এক জনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো- সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেয়া হবে। যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখ এসেমব্লি বন্ধ করে দেয়া হল।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভূট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হোল, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে ----তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে

সংখ্যাগুরু- আমরা ফেব্রুয়ারি রা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি , কিসের এসেমব্লি বসবে; কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলব ? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।দায়ী আমরা!

২৫ তারিখ এসেমব্লি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল- ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট - কাচারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যেসমস্ত অন্যান্য জিনিষগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে- শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্ণমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এর পর যদি ১ টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় -তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু- আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, - প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় - হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, ফেব্রুয়ারি , অফেব্রুয়ারি ---- তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব

আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন ফেব্রুয়ারি রেডিও ষ্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারবে। পূর্ব বাঙ্লা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাঙ্লায় চলবে এবং বাঙ্লাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে---- ফেব্রুয়ারি রা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরোও রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইন্‌শাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাঙ্লা ॥

'উত্তাল-উদ্দাম জলধিতরঙ্গ' শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ঃ (ষ্টাফ রিপোর্টার)

৭ই মার্চ একটি অবিস্মরণীয় দিন। অনন্যসাধারণ এই দিনের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান। অবিস্মরণীয় এই অনন্যদিনের রেসকোর্সে বাঙ্লার স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর নির্দেশকামী স্বাধিকার সৈনিকদের সংগ্রামী সম্মেলন।

'সংগ্রামী বাঙ্লা দুর্জয় দুর্বীনিত। কাহারও অন্যায় প্রভুত্ব মানিয়া নেওয়ার জন্য, কাহারও কলোনী হইয়া, বাজার হইয়া থাকার জন্য বাঙ্লার মানুষের জন্ম হয় নাই'- বঙ্গবন্ধুর এই তেজদৃপ্ত ঘোষণারই পূনরাবৃত্তি করিয়া বাঙ্লার অপরাজেয় গণশক্তি গতকাল(রবিবার) রেসকোর্স ময়দানে সার্বিক মুক্তি আদায়ের ইস্পাত-কঠিন শপথের দীপ্তিতে প্রিয় নেতাকে যেন দুর্লংঘ্য নির্দেশ প্রদান করে 'বঙ্গবন্ধু আগাইয়া চলো আমরা আছি পিছনে।' আর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে আবহমান বাঙ্লার বাসন্তী সূর্য আর উদার আকাশকে সাক্ষী রাখিয়া গতকাল নির্ভীক নেতা এবং বীর জনতার কণ্ঠস্বর একই সুরে ধ্বনিত হইয়া ওঠে যুগ-যুগান্তর, দেশ-দেশান্তরের সকল মুক্তি-পিপাসু সভ্য জাতির হৃদয়বাসনার অমোঘ মন্ত্র 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।' ধ্বনি ওঠে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে দিগন্ত কাঁপাইয়া 'জয় বাঙ্লা' ৭ই মার্চ তাই বাঙ্লার সার্বিক স্বাধিকার আন্দোলনের দুর্গম দুস্তর পথের প্রান্তে একটি অতুলনীয় স্মৃতিফলক।

গতকাল (রবিবার) রেসকোর্স ময়দানে স্বাধিকারকামী বাঙালীর ঢল নামিয়াছিল। আকারের বিশালতা, অভিনবত্বের অনন্য মহিমা, আর

সংগ্রামী চেতনার অতুল বৈভবে এই জনসমুদ্র ছিল নজিরবিহীন। আর সেই বিশাল জনসমুদ্রের আরেকটি লক্ষনীয় দিক ছিল হাতে বাঁশের লাঠি- কণ্ঠে প্রলয় রাত্রির বিদ্রোহী বঙ্গোপসাগরের সঘন গর্জন। শতাব্দীর ইতিহাসের বক্ষে বিলীন স্বাধীনতা সংগ্রামী তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা দেখি নাই কিন্তু গতকাল রেসকোর্সে বাংলার স্বাধিকারকামী জনতার হাতে দেখিয়াছি বাঁশের লাঠি। আর সেই লাঠির সমবেশ শব্দ-গর্জন যেন কামানের গর্জনেরই জবাব হইয়া গতকাল ঢাকার আকাশে-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে বহুক্ষণ। একের লাঠি অন্যের লাঠিতে ঠোকাঠুকি করিয়া আর সেই সঙ্গে বজ্রের নিকট হইতে ধ্বনি কাড়িয়া শ্লোগান দিয়া বাংলার মানুষ যেন একে অপরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে চাহিয়াছে, 'বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ম করো চিত্ত বাংলার মাটি দুর্জয় খাটি চিনে যাক দুর্বৃত্ত।'

গতকাল রেসকোর্সে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটিয়াছিল সার্বিক স্বাধিকার আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর পথ নির্দেশ লাভের জন্য। আসিয়াছিল পুরনারী, অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কচি-কিশোর, তরুণ যুবক, পরিণত শ্রমিক-জনতা। তাদের চোখে-মুখে ছিল প্রতিরোধের অগ্নিশিখা, বুকে বুকে মুক্তি, পিপাসার জলন্ত চিতা। কিন্তু তবু তারা শান্ত ছিল, সংযত ছিল-ছিল বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা নিরীহ। অথচ সেই জনতাই আবার সংগ্রামী শপথ ঘোষনায় উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছে মহা প্রলয়ের উত্তাল জলধির মত। তাইতো, আশ্চর্য এই দেশ, আশ্চর্য বাঙ্গালীর মন ও মানস।

বেলা দুইটায় শেখ মুজিবের সভা শুরু হওয়ার কথা থাকিলেও তিনি মঞ্চে আসেন বেলা ৩টা ১৫ মিনিটে। কিন্তু তবু জনতার মধ্যে অবৈধ-অসহিষ্ণুতার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনতার স্রোত আসিয়া উপচাইয়া পড়িতে থাকে এবং রেসকোর্সের উপলখন্ডে। আর তা জনস্রোতে সয়লাব হইয়া যায় অচিরেই। বয়স, পেশা, সামাজিক মর্যাদা, পোশাক পরিচ্ছেদে যতই অমিল থাকুক, সে জনতার মধ্যে আশ্চর্য ছিল হাতের বাঁশের, লাঠি, কণ্ঠের শ্লোগান আর অন্তরের অন্তরতম লক্ষ্যে স্বাধিকারের লক্ষ্যে।

বেলা ঠিক সোয়া তিনটায় সাদা পাজামা-পঞ্জাবীর পর (হাতাকাটা কোট) মুজিব কোর্ট পরিহিত বঙ্গবন্ধু মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলে বাংলার বীর জনতা বজ্র নির্ঘোষে করতালি ও শ্লোগানের মধ্যে তাকে অভিনন্দন জানায়। নেতা মৃদু হস্ত আন্দোলনের দ্বারা জনতাকে অভিনন্দন জানায়। তাঁর চোখ মুখে তখন ৭ কোটি মুক্তি- সৈনিকের সুযোগ্য সিপাহসালারের দুর্লভ তেজদৃপ্ত কাঠিন্য আর সংগ্রামী শপথের দীপ্তিখেলা করিতে থাকে।

রেসকোর্স বাংলার মানুষকে প্রাণের টানে ডাকে। সে ডাকে সাড়া দিয়া ১৯৬৯-র ফেব্রুয়ারীতে রেসকোর্সে বাংলার মানুষ শুনিয়াছে এক

ইউনিট আর প্যারিটির মৃত্যুঘন্টা, ১৯৭০ সালের ৭ই জুন শুনিয়াছে ৬-দফার জয়নাদ, আর ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী শুনিয়াছে ৬-দফা ১১-দফা বাস্তবায়নের দ্ব্যর্থহীন শপথ। আর গতকালও রেসকোর্স ময়দান বাংলার মানুষকে নিরাশ করে নাই। গতকাল রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়াইয়া শেখ মুজিব বাংলার মানুষকে ডাকিয়া বলিয়াছেন ঃ ভাইয়েরা আমার, সর্বাত্মক সংগ্রামে শরিক হও। ৭ কোটি শোষিত বাঙালীর বিক্ষুব্ধ আত্মার আর্তনাদকে নিজের কণ্ঠে তুলিয়া নিয়া শেখ সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। আমি রক্ত দিতে প্রস্তুত'- এই কথাটির দ্বারা তিনি তাঁর ২০মিনিট ব্যাপী বক্তৃতা সমাপ্ত করেন। শেখ মুজিব যখন স্বজাতির সংগ্রামের রূপরেখা তার নিজের চরমতম ত্যাগের প্রস্তুতি বাণী ঘোষনা করিতেছিলেন তখন তাঁর কণ্ঠ কাঁপে নাই, থামে নাই-বরং এক দুর্লভ শক্তির জোরে বজ্রের হুঙ্কারের মতই গর্জিয়া উঠিয়াছে সেই মুহুর্তে বসন্তের আকাশ হইতে বিদায়ী সূর্যের আলোকরাশি ছড়াইয়া পড়িতেছিল রমনার প্রান্তরে নেতা আর জনতার শিরদেশে-যেন বিধাতার আশীর্বাদ। সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে ৭কোটি বঞ্চিত মানুষের অবিসংবাদি নেতার সেই সংগ্রামী রূপ-অপরূপ আমি দেখিনি কখনো আগে।

সভা শেষে সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রামের যে কোন ত্যাগ স্বীকারের সংগ্রামী শপথ দীপ্ত শ্লোগানের-রেণু রেণু করিয়া বাতসে ছড়াইয়া দিয়া স্বাধিকার-সৈনিকরা ঘরে ফেরে দৃপ্ত মিছিলের পদচারণায় রাজপথ প্রকম্পিত করিয়া। ৭ই মার্চের রেসকোর্সের সমাবেশ যেখানে শেষ-বাংলার সার্বিক মুক্তি-আন্দোলনের চরম অধ্যায়ের সেখানেই শুরু। তাইতো ৭ই মার্চ অনন্য-অবিস্মরণীয়।

এই ক্ষণের কথা কল্পণা চিন্তা করিয়াই হয়ত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বহু বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন ঃ

দুর্মর

-সুকান্ত ভট্টাচার্য

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ।
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।
....
একবার মরে ভূলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।
সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী

অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

....

৯ই মার্চে 'এখনও সময় আছে' শিরোনামে ইত্তেফাক পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ঃ

"গত পরশু ঢাকা রেসকোর্সের ঐতিহাসিক সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশবাসীকে তাঁহার বহু প্রত্যাশিত পথনির্দেশ দান করিয়াছেন। রেসকোর্সের ভাষণ ছাড়াও সংবাদপত্রে প্রদত্ত একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি আনুপূর্বিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদান, প্রেসিডেন্টের ৬ই মার্চের বেতার বক্তৃতার কতিপয় অসংগত মন্তব্য ও অসংলগ্ন উক্তির জবাবদান এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দশদফা 'পথনির্দেশ' দান করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহুত জাতীয় পরিষদের ২৫শে মার্চের অধিবেশনে যোগদানের কতিপয় শর্তও ঘোষনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠা, সৈন্যবাহিনীকে ছাউনিতে প্রত্যাহার ও অবিলম্বে গোলাগুলি বন্ধের দাবী প্রধান। শেখ সাহেব শাসকদের উদ্দেশে বলিয়াছেন, দেশটাকে আপনারা একেবারে ধ্বংস করিয়া দিবেন না, এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবেন না– যাহাতে আমাদের পরস্পরের মুখ দেখা দেখিও বন্ধ হইয়া যায়, এখনও ভ্রাতৃবৎ বসবাস করিবার সুযোগ রহিয়াছে, সেই সুযোগটুকুও আপনারা চিরতরে বিনষ্ট করিবেন না এবং শক্তির দ্বারা শাসন দীর্ঘতর করিবার চেষ্টা করিবেন না।

শেখ সাহেবের এই সতর্কবাণী সর্বোচ্চ দেশপ্রেম সঞ্জাত। জানা যাইতেছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই জিজ্ঞাসা ক্রমেই প্রবল ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে যে, বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশটিকে রাজনৈতিক হঠকারিতা ও ষড়যন্ত্র দ্বারা এবং নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে গোলাগুলি ও দমননীতি চালাইয়া বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকারকে কাহাকে দিয়াছে। সেখান হইতেও আজ প্রবল দাবী উঠিতেছে, পূর্বাঞ্চলে এই খুন খারাবি বন্ধ কর। হউক, সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও শেখ সাহেবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হউক। এয়ার মার্শাল নুর খান ৬ই মার্চ লাহোরে ছাত্র-শ্রমিক বুদ্ধিজীবী-রাজনৈতিক কর্মীদের এক বিরাট সমাবেশে সকলকণ্ঠে এই দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। এয়ার মার্শাল আজগার খানও তাঁহার সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিবৃতিতে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। গত পরশুর প্রেস কনফারেন্সেও তিনি বলিয়াছেন, সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্ত রই এই মুহূর্তের সর্বপ্রধান কর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন যে, শেখ সাহেব যে শর্ত আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্বাংশে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত; বস্তুত যে অবস্থার সৃষ্টি

করা হইয়াছে তাহাতে ইহার কমে তিনি আর কি করিতে পারেন ? অস্গার খান আরও বলিয়াছেন ঃ শাসনতন্ত্র রচিত হয় নাই বলিয়াই সামরিক শাসন চালাইয়া যাইবার কোন যুক্তি নাই। দেশরক্ষাই আর্মির মূখ্য দায়িত্ব; উহার অতিরিক্ত দায়িত্ব, এমনকি 'সংগতিরক্ষার' দায়িত্ব অর্পণও উহাদের উপর মাত্রারিক্ত বোঝা চাপানোরই সমতুল্য। কাজেই আর্মিকে কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের শিবিরে ফিরাইয়া নেওয়া ও সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা কর্তব্য।

এসব দাবী ও যুক্তির সারবত্তা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ অতীতে বহুক্ষেত্রে বহুবার এবং গত কয়েক দিনের ঘটনাবলীতেও সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইয়াছে যে, বুলেট দ্বারা, বেয়নেট দ্বারা, নিষ্ঠুর শক্তি প্রয়োগ দ্বারা ও নির্যাতন দ্বারা স্বাধিকারকামী জনতাকে দমন করা যায় না। উহাতে সমস্যা, জটিলতা ও ব্যবধান বৃদ্ধিই পায়, হ্রাস পায় না। সংশ্লিষ্ট মহল যদি এতকিছুর পরও ইহা না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর কবে বুঝিবেন ?

সশস্ত্র বাহিনীকে শিবিরে ফিরাইয়া নেওয়া এবং 'আর্মি রুল' আর দীর্ঘতর না করার বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত এয়ার-মার্শালদ্বয় যে উপর্যুপরি দাবী জানাইয়াছেন, তাহার পলিটিক্যাল অর্থ ছাড়াও সম্ভবতঃ অতিরিক্ত কিছু অর্থ রহিয়াছে। সশস্ত্র বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার এই প্রাক্তন অধিনায়কদ্বয় উত্তমরূপেই জানেন যে, আর্মির ট্রেনিংটাই একটা বিশেষ কাজের ও বিশেষ ধরণের। প্রশাসন ও রাষ্ট্র পরিচালন কার্যে তাহাদের অধিককাল জড়িত রাখা নানাদিক হইতেই অদূরদর্শিতামূলক। বিশেষতঃ বর্তমান ঘনায়মান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। সেইজন্যই বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধানদ্বয় একটানাভাবে এই বিষয়টির উপরে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য অপেক্ষা না করিয়া মার্শাল 'ল প্রত্যাহার করা হউক এবং মেজরিটি দলের হস্তে ক্ষমতার্পণ করা হউক। দ্বিতীয় দফা সামরিক শাসন জারির দুই বছর পূর্ণ হইল। ইহা অবশ্যই দীর্ঘ সময়। এখন যখন জনগণের অর্থে ক্রীত অস্ত্র ও বুলেট গণতান্ত্রিক অধিকারকামী নিরস্ত্র জনগণের বক্ষই বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কর্তৃপক্ষেরও ধীর মস্তিস্কে বুঝা উচিত যে, শান্তিপূর্ণ পথে শান্তি ও স্বস্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার যিনি শক্তি রাখেন এবং আসগর খানের ভাষায় এই "ভয়ানক পরিস্থিতির" অবসান ঘটাইবার যিনি ক্ষমতা রাখেন, সেই সর্বজনমান্য নায়ক বঙ্গবন্ধুর হস্তেই এই মুহুর্তে ক্ষমতা হস্ত ান্তর করা অবশ্য কর্তব্য। সকল সমস্যার আশু রাজনৈতিক সমাধানের ইহাই একমাত্র উপায়। দুইটি অঞ্চলের মানুষের ভ্রাতৃবৎ বসবাস করিবারও ইহাই সম্ভবতঃ সর্বশেষ সুযোগ গত আটদিনের ঘটনাবলী দৃষ্টে কর্তৃপক্ষের ইহাও উপলব্ধি করিতে না পারার কোন কারণ নাই যে, 'ক্ষমতা' বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা বুঝায়, তাহার কন্ট্রোল এখন কাহার হস্তে। আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা হস্তান্তর না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাকী সবই হইয়া গিয়াছে। জনগণ তাহাদের সার্বভৌমত্ব তাহাদেরই নির্বাচিত নায়ক ও প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রয়োগ করিতে

আরম্ভ করিয়াছে। ইহার গতিপথে বালির বাঁধ সৃষ্টি না-করিয়া এই "ফেইট য়্যাকম্প্লি" বা সংঘটিত বাস্তব সত্যকে নির্বিবাদে অবিলম্বে স্বীকার করিয়া লওয়াই কি বিজ্ঞ জনোচিত ও দুরদর্শিতামূলক নয় ? ক্ষমতা ভাল জিনিস, কিন্তু ক্ষমতার দম্ভ ও অহমিকা অনেক সময় বিপর্যয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায় । কাজেই ক্ষমতার দম্ভ ও উহার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সংযত ও সতর্ক থাকা কর্তব্য। জনতাই সকল ক্ষমতার অধিকারী মহামহিমান্বিত ম্যাজেষ্টি। শাসকগোষ্ঠী বা যে কেহ সেই প্রতাপান্বিত অধীশ্বরের সম্মুখে নতজানু। অতএব, দিন-দুই-চারি তড়পাইয়া লাভ কি ?

আসগার খান তাঁহার গত পরশুর প্রেস কনফারেন্সে আর একটা অতি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শেখ সাহেব দেশটাকে একত্রই রাখিতে চান, কিন্তু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র তাঁহাকে ক্রমেই কঠিনতর পরিস্থিতি মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।। আসগার খান যেকোন দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলার প্রয়োজন করে না। বস্তুতঃপক্ষে, দেশকে একত্র রাখা-না-রাখার দায়িত্ব এখন মূখ্যতঃ নির্ভর করিতেছে কর্তৃপক্ষের পরবর্তী পদচারণার উপর, আর নির্ভর করিতেছে, 'সংহতি'র এতদিনের 'সোল-এজেন্টদের ষড়যন্ত্রের জালবুনা পরিত্যাগ করার উপর। গণতান্ত্রিক স্বাধিকার-সংগ্রাম যেখানে সামগ্রিক ও সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, প্রতিটি গৃহ যেখানে দুর্গে পরিনত হইয়াছে, সেখানে জনগণের ভায়োলেন্সের প্রয়োজন করে না। জনগণ সেপথ ধরিবেও না। বরং শেখ মুজিবের নির্দেশে জনগণ সংযম ও শৃঙ্খলার পথেই চলিবে। কিন্তু আগুন লইয়া যাহারা খেলিতে আনন্দ পায়, তাহাদের কাহারও হঠকারিতায় আবার যদি কোথাও আগুন লাগে, উহার দায়িত্ব সর্বাংশে তাহাদেরই বহন করিতে হইবে এবং উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণামের জন্যও তাহাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

মওদুদ আহমদ তাহার 'Bangladesh: Constitutional Quest For Autonomy'(1979) গ্রন্থে উপরোক্ত ৭ই মার্চের ভাষণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন (পৃঃ ২২৯-২৩০) ঃ

" Later in the evening of the same day I met him at his house. When I entered into his room he told me 'I have done my duty, now you do yours'. He meant, he had given the call for independence also and there was nothing more he could do. He looked very exhausted and seriously apprehended that he would be arrested and finished on that day. Depsite all the contradictions, Mujib's speech on March 7, gained historical importance. When the Bengalis finally entered the armed struggle to liberate their country

from the Pakistan Army his speech of March 7 inspired millions of youths to fight the war."

প্রতীয়মান হয় যে, ৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'স্বাধীনতার ডাক' দিয়াছিলেন এবং ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি 'স্বাধীনতার ঘোষণা' প্রদান করিয়াছিলেন।

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান ঃ

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সময় বিকাল পাঁচ ঘটিকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে তুমুল করতালীর মধ্যে নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রদান করেন (Bangladesh Documents, Vol.II UPL পৃঃ ৫৫০)ঃ

STATEMENT BY PRIME MINISTER INDIRA GANDHI IN PARLIAMENT ON PAKISTAN ARMY'S SURRENDER IN BANGLA DESH

December 16, 1971.

I have an announcement to make. The West Pakistan forces unconditionally surrendered in Bangla Desh. The instrument of surrender was signed in Dacca at 1631 hours I.S.T. today by Lt.-Gen. A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lt.-Gen. Jagjit Singh Aurora, GOC-in-C of the Indian and Bangla Desh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. Dacca is now the free capital of a free country.

This House and the entire nation rejoice in this historic event. We hail the people of Bangla Desh in their hour of triumph. We hail the brave young men and boys of the Mukti Bahini for their valour and dedication. We are proud of our own Army, Navy, Air Force and the Border Security Force, who have so maginificently demonstrated their quality and capacity. Their discipline and devotion to duty are well known. India will remember with gratitude the sacrifices of those who have laid down their lives, and our thoughts are with thier famililties.

Our Armed Forces are under strict orders to treat Pakistani priononers of war in accordance with the Geneva Convention and to

deal with all sections of the population of Bangla Desh in a humane manner. The Commanders of the Mukti Bahini have issued similar orders to their forces. Although the Government of Bangla Desh have not yet been given an opportunity to sign the Geneva Convention, they also have declared that they will fully abide by it. It will be the responsibilty of the Government of Bangla Desh, the Mukti Bahini and the Indian armed forces to prevent any reprisals.

Our objectives were limited-to assist the gallant poeple of Bangla Desh and their Mukti Bahini to liberate their country from a reign of terror and to resist aggression on our own land. Indian armed forces will not remain in Bangla Desh any longer than is necessary.

The millions who were driven out of their homes across our borders have already begun trekking back. The rehabillitation of this war-torn land calls for dedicated team work by its Government and people.

We hope and trust that the Father of this new nation, Sheik Mujibur Rahman, will take his rightful place among his own people and lead Bangla Desh to peace, progress and prosperity. The time has come when they can together look forward to a meaningful future in their *Sonar Bangla.* They have our good wishes.

The triump is not theirs alone. All nations who value the human spirit will recognise it as a significant milestone in man's quest for liberty."

১৬ই ডিসেম্বর এর একটি মোটামুটি চাক্ষুস বিবরণ পাওয়া যায় Siddiq Salik লিখিত Witness to Surrender পুস্তকে (পৃ ঃ ২১০-২১১) ঃ

"Major-General Nagra of 101 Communication Zone, who was folowing the advance commando troops, held back on the far side of the bridge and wrote a chit for Lieutenant-General Amir Abdullah Khan Niazi. It said: 'Dear Abdullah, I am at Mirpur Bridge. Send your representative.'

Major-General Jamshed, Major-General Farman and Rear-Admiral Shariff were with General Niazi when he received the note at about 9 a.m. Farman, who still stuck to the message for 'cease-fire negotiations,' said 'Is he (Nagra) the negotiating team?' General

Niazi did not comment. The obvious question was whether he was to be received or resisted. He was already on the threshold of Dacca.

Major-General Farman asked General Niazi, 'Have you any reserves ?' Niazi again said nothing. Rear-Admiral Shariff, translating it in Punjabi, said: *'Kuj Palley hai'*? (Have you anything in the kitty?) Niazi looked to Jamshed, the defender of Dacca, who shook his head sideways to signify 'nothing.' 'If that is the case, then go and do what he (Nagra) asks,' Farman and Shariff said almost simultaneously.

General Niazi sent Major-General Jamshed to receive Nagra. He asked our troops at Mirpur Bridge to respect the cease-fire and allow Nagra a peaceful passage. The Indian General entered Dacca with a handful of soldiers and a lot of pride. That was the virtual fall of Dacca. It fell quietly like a heart patient. Neither were its limbs chopped nor its body hacked. It just ceased to exist as an independent city. Stories about the fall of Singapore, Paris or Berlin were not repeated here.

Meanwhile, Tactical Headquarters of Eastern Command was wound up. All operational maps were removed. The main headquarters were dusted to receive the Indians because, as Brigadier Baqar said, 'It is better furnished.' The adjoining oficers' mess was warned in advance to prepare additional food for the 'guests'. Baqar was very good at administration.

Slightly after midday, Barigadier Baqar went to the airport to receive his Indian counterpart, Major-General Jacob. Meanwhile Niazi entertained Nagra with his jokes. I apologize for not recording them here but none of them in printable !

Major-General Jacob brought the 'surrender deed' which General Niazi and his Chief of Staff preferred to call the 'draft cease-fire agreement.' Jacob handed over the papers to Baqar, who placed them before Major-General Farman. General Farman objected to the clause pertaining to the 'Joint Command of India and Bangla Desh'. Jacob said, 'But this is how it has come from Delhi.' Colonel Khera of Indian military intelligence, who was standing on the side added, 'Oh, that is an internal matter between India and Bangla Desh. You are surrendering to the Indian Army only.' The

document was passed on to Niazi who glanced through it without any comment and pushed it back, across the table , to Farman. Farman said, 'It is for the Commander to accept or reject it.' Niazi said nothing. This was taken to imply his acceptance.

In the early afternoon, General Niazi drove to Dacca airport to receive Lieutenant General Jagjit Singh Aurora, Commander of Indian Eastern Command. He arrived with his wife by helicopter. A sizeable crowd of Bengalis rushed forward to garland their 'liberator' and his wife. Niazi gave him a military stalute and shook hands. It was a touching sight. The victor and the vanquished stood in full view of the Bengalis, who made no secret of their extreem sentiments of love and hatred for Aurora and Niazi respectiverly.

Admidst shouts and slogans, they drove to Ramna Race Course (Suhrawardy Ground) where the stage was set for the surrender cremony. The vast ground bubbled with emotional Bengali crowds. They were all keen to witness the public humiliation of a West Pakistani General. The occasion was also to formalize the birth of Bangla Desh.

A small contingent of the Pakistan Army was arrayed to present a guard of honour to the victor while a detachment of Indian soldiers guarded the vanquished. The surrender deed was signed by Lieutenant- General Aurora and Lieutenant General Niazi in full view of nearly one million Bengalis and scores of foreign media men. Then they both stood up. General Niazi took out his revolver and handed it over to Aurora to mark the capitulation of Dacca. With that, he handed over East Pakistan !"

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিজয় সম্পূর্ণ হইল।

নয় মাস ব্যাপি যুদ্ধ শেষ হইল।

ক) মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকা ঃ

কিন্তু ইহার প্রারম্ভ মোটেই এইরূপ প্রশান্ত ছিল না। বরঞ্চ প্রচন্ড মানবসৃষ্ট অগ্নুৎপাতসম বিভিষীকার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্ম নিল ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে ।

সিদ্দিক সালিকের ভাষায় ঢাকায় সামরিক অভিযান ও শেখ মুজিবের গ্রেফতার এইভাবে আরম্ভ হয় (Witness to Surrender, P-75) :

'Thus the action had started before schedule. There was no point now in sticking to the prescribed H-hour. The gates of hell had been cast open. When the first shot had been fired, 'the voice of Sheikh Mujibur Rehman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangla Desh.The full text of the proclamation is published in *Bangla Desh Documents* released by the Indian Foreign Ministry. It said, ' This may be my last message. From today Bangla Desh is independent. I call upon the people of Bangla Desh, wherever you are and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangla Desh and final victory is achieved.'
(Witness to Surrender)

২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে ঢাকা শহরে যে গণহত্যা চলে তাহার একটি বিবরণ ৩০শে মার্চ তারিখে লন্ডনস্হ 'The Daily Telegraph' পত্রিকায় সাংবাদিক সাইমন ড্রিং এর প্রেরিত প্রতিবেদন মারফৎ পাওয়া যায়। সভ্য জগত সর্বপ্রথম এই গণহত্যার বিবরণ জানিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠে (দলিলপত্র, ২য় খন্ড পৃঃ ৭৮৮-৭৯২), তবে ইহা প্রকৃত গণহত্যার খন্ডিত চিত্র মাত্র ঃ

GENOCIDE IN BANGLADESH
SOME EYE-WITNESS ACCOUNTS
" HOW DACCA PAID FOR A 'UNITED' PAKISTAN"
Report by Simon Dring of Daily Telegraph, London.

Sheikh Mujibur Rahman, East Pakistan's popular political leader, was seen being taken away by the army, and nearly all the top members of his Awami League Party have also been arrested.

Leading political activities have been arrested, others are dead, and the offices of two papers which supported Mujibur's movement have been destroyed.

But the first target as the tanks rolled into Dacca on the night of Thursday, March 25, seems to have been the students.

An estimated three battalions of troops were used in the attack on Dacca-one of armoured, one of artillery and one of infantry. They started leaving their barracks shortly before 10 p.m. By 11, firing had broken out and the people who had started to erect makeshift barricades-overturned cars, three stumps, furniture, concrete piping-became early casualties.

Sheikh Mujibur was warned by telephone that something was happening, but he refused to leave his house. “If I go into hiding they will burn the whole of Dacca to find me”, he told an aide who escaped arrest.

The students were also warned, but those who were still around later said that most of them thought they would only be arrested. Led by American supplied M-24 World War II tanks, one column of troops sped to Dacca University shortly after midnight. Troops tookover the British Council Liberary and used it as a fire base from which to shell nearby dormitory areas.

Caught completely by surprise, some 200 students were killed in Iqbal Hall, headquarters of the militantly anti-government student’s union, I was told. Two days later, bodies were still smouldering in burnt-out rooms, others were scattered outside, more floated in a nearby lake, an art student lay sprawled across his easel.

The military removed many of the bodies, but the 30 bodies till there could never have accounted for all the blood in the corridors of Iqbal Hall.

At another hall, reportedly, soldiers buried the dead in a hastily dug mass grave which was then bull-dozed over by tanks. People living near the university were caught in the fire too, and 200 yards of shanty houses running alongside a railway line were destroyed.

Army Patrols also razed nearby market area. Two days later, when it was possible to get out and see all this, some of the market’s stall-owners were still lying as though asleep, their blankets pulled up over their shoulders. In the same district, the Dacca Medical

College received direct bazooka fire and a mosque was badly damaged.

As the university came under attack other columns of troops moved in on the Rajarbag headquarters of the East Pakistan Police, on the other side of the city. Tanks opened fire first, witness said: then the troops moved in and levelled the men's sleeping quarters, firing incendiary rounds into the buildings. People living opposite did not know how many died there, but out of the 1,100 police based there not many are believed to have escaped.

Mujib's arrest

As this was going on, other units had surrounded the Sheikh's house. When contacted shortly before 1 a.m. he said that he was expected an attack any minute and had sent everyone except his servants and bodyguard away to safety.

A neighbour said that at 1-10 a.m., one tank, an armoured car, and trucks loaded with troops drove down the street firing over the house. "Sheikh you should come down", an officer called out in English as they stopped outside. Mujibur stepped out onto his balcony and said, " Yes, I am ready, but there is no need to fire. All you need to have done is call me on the telephone and I would have come".

The officer then walked into the yard and told Mujibur: "You are arrested".

He was taken away along with three servants, an aide and his bodyguard, who was badly beaten up when he started to insult the officer. One man was killed- a night watchman hiding behind the fence of the house next door.

As the Sheikh was driven off-presumably to army headquarters-the soldiers moved into the house, took away all documents, smashed everything in sight looked the garded gate, shot down the green, red and yellow "Bangladesh" flag and drove away.

By 2 O' Clock Friday

Fires were burring all over the city, and troops had occupied the university and surrounding areas.

There was still heavy shelling in some areas, but the fighting was beginning to slacken noticeably. Opposite the Intercontinental Hotel Platoon of troops stored the empty office of “The People” newspaper burning it down along with most houses in the area and killing the night watchman.

City lies silent

Shortly before dawn most firing had stopped, and as the sun came up an eerie silence settled over the city, deserted and completely dead except for noise of the crows and the occasional convoy of toops or two or three tanks rumbling by mopping up.

At noon, again without warning, columns of troops poured into the old section of the city where more than 1 million people lived in a sprawling maze of narrow, winding streets.

For the next 11 hours, they devastated large areas of the “old town” as it is called, where Sheikh Mujibur had some of his strongest support in Dacca English Road, French Road, Niar Bazar, City Bazar were burned to the ground.

“They suddenly appeared at the end of the street”, said one old man living in French Niar Bazar area. “Then they drove down it, firing into all the houses”.

The lead unit was followed by soldiers carrying cans of gasoline. Those who tried to escape were shot. Those who stayed were burnt alive. Abut 700 men, women and children died there that day between noon and 2 p.m. I was told.

The pattern was repeated in at least three other areas of upto a half square mile or more. Police stations in the old town were also attacked.

Constables killed

“I am looking for my constables”, a police inspector said on Saturday morning as he wandered through the ruins of one of the bazars. “I have 240 in my district, and so far I have only found 30 of them- all dead.

In the Hindu area of the old town, the soldiers reportedly made the people come out of their houses and shot them in groups. This area, too was eventually razed.

The troops stayed on in force in the old city until about 11 p.m. on the night of Friday, March 26, driving around with local Bengali informers. The soldiers would fire a flare and the informer would point out the houses of Awami League supporters. The house would then be destroyed- either with direct fire from tanks or recoilless rifles or with a can of gasoline, witness said.

Meanwhile troops of the East Bengal Regiment in the suburbs started moving out towards the industrial areas about 10 miles from the Sheikh's centres of support.

Firing continued in these areas until early Sunday morning, but the main part of the operation in the city was completed by Friday night-almost exactly 24 hours after it began.

One of the last targets was the daily Bengali language paper "Ittefaq". More than 400 people reportedly had taken shelter in its offices when the fighting started. At 4 o'clock Friday afternoon, four tanks appeared in the road outside. By 4-30 the building was an inferno, witnesses said. By Saturday morning only the charred remains of a lot of corpses huddled in back rooms were left.

Curfew lifted

As quickly as they had appeared, the troops disappered from the streets. On Saturday morning the radio announced that the curfew would be lifted from 7 a. m. until 4 p.m. It then repeated the Martial Law Regulation banning all political activity, announced press censorship and ordering all government employees to report back to work. All privately owned weapons were ordered to be turned into the autorities.

Magically, the city returned to life, and panic set in. By 10 a.m. with palls of black smoke still hanging over large areas of the old town and out in the distance toward the industrial areas, the streets were packed with people leaving town. By car and in rickshaws, but mostly on foot, carrying their possessions with them, the people of Dacca were fleeing. By noon the refugees numbered in the tens of thousands.

"Please give me lift, I am old man" –"In the name of Allah, help me" –"Take my children with you".

Silent and unsmiling they passed and saw what the army has done. They looked the other way and kept on walking. Down near one of the markets a shot was heard. Within seconds, 2,000 people were running; but it had only been someone going to join the lines already forming to turn in weapons.

Government offices remained almost empty. Most employees were leaving for their villages ignoring the call to go back to work. Those who were not fleeing wandered aimlessly around the smoking debris, lifting blackened and twisted sheets of corrugated iron (used in most shanty areas for roofing) to savage from the ashes what they could.

Nearly every other car was either taking people out into the countryside or flying a red cross and conveying dead and wounded to the hospitals.

In the middle of it all occasional convoys of troops would appear, the soldiers peering—equally unsmiling—down the muzzles of their guns at the silent crowds. On Friday night as they pulled back to their barracks they shouted “Narai Takbir”, an old Persian war cry meaning “We have won the war”. On Saturday when they spoke it was to shout “Pakistan Zindabad—Long live Pakistan”.

Fast-selling Flags

Most people took the hint. Before the curfew was reimposed the two hottest-selling items on the market were gasoline and the national flag of Pakistan. As if to protect their property in their absence, the last thing a family would do before they looked up their house would be to raise the flag.

At 4 o’clock Staurday afternoon, the streets emptied again. The troops reappeared and silence fell one more over Dacca. But firing broke out again almost immediately. “Anybody out after four will be shot”, the radio had announced earlier in the day.

A small boy running across the street outside the Intercontinental Hotel two minutes after the curfew fell was stopped, slapped four times in the face by an officer and taken away in a jeep.

The night watchman at the Dacca Club, a bar left over from the colonial days, was shot when he went to shut the gate of the

club. A group of Hindu Pakistanis living around a temple in the middle of the race course were all killed apparently because they were out in the open.

Refugees who came back into the city, after finding that roads leading out of it were blocked by army, told how many had been killed as they tried to walk across country to avoid the troops.

Beyond these roadblocks was more or less no-man's land, where the clearing operations were still going on. What is happening out there now is anybody's guess, except the army's.

Many poeple took to the river to escape the crowds on the roads, but they ran the risk of being stranded waiting for a boat when curfew fell. Where one such group was sitting on Saturday afternoon there were only bloodstains the next morning.

Hardly anywhere was there evidence of organized resistence. Even the West Pakistani Officer scoffed at the idea of anybody putting a fight.

"These bugger men", said one Punjabi lieutenant, "could not kill us if they tried."

"Things are much better now", said another officer. "Nobody can speak out or come out. If they do we will kill them-they have spoken enough –they are traitors, and we are not. We are fighting in the name of God and a united Pakistan."

(Despatch by Simon Dring of Daily Telegraph
London, In Washington Post.
March 30, 1971.)

উপরের বিবরণ পাঠ করিয়া মোটেও উপলব্ধি করা যাইবে না যে 'The gates of hell had been cast open' (Siddiq Salik) বলিতে ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে ঢাকা শহরের বুকে কী ভয়ঙ্কর তান্ডবলীলা চালিয়াছিল। ইহার সহিত শুধুমাত্র ১২৫৮ সনের হালাকু খান এর বাগদাদ আক্রমণ বা ১৭৩৯ সনে নাদীরশাহ এর দিল্লী আক্রমণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

লেঃ জেনারেল নিয়াজী নিজেই তাহার লিখিত The Betrayal of East Pakistan পুস্তকে ১৯৭১ সনের ২৫-২৬ শে মার্চ তারিখে ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তান্ডবলীলার

সহিত বুখারায় চেঙ্গিস খান , বাগদাদে হালাকু খান এবং এবং অমৃতসরে জেনারেল ডায়ারের হত্যাকান্ডের সহিত তুলনা করেন।

১৩শ শতাব্দিতে মধ্য এশিয়ায় সমরখন্দ, বুখারা, বাগদাদ প্রভৃতি অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু নগরী ছিল। ঐ সকল নগরীতে জ্ঞান বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সভ্যতার পরম উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল।

১২১৮ সনে চেঙ্গিস খান বুখারা নগরী আক্রমন করেন এবং আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ণ রুপে ভস্মিভূত করেন। ইহার আনুমানিক ১৫ লক্ষ অধিবাসীর অধিকাংশই প্রাণ হারায়।

১৩শ শতাব্দিতে বাগদাদ জ্ঞান বিজ্ঞানে তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ ঐ সময় সেখানে বসবাস করিত। ১২৫৮ সনে হালাকু খান বাগদাদ আক্রমন করে এবং ৬ সপ্তাহ ধরিয়া ধ্বংসলীলা, হত্যা ও লুণ্ঠন করে। মহিলা ও শিশুসহ শহরের দশ লক্ষাধিক মানুষ হত্যার শিকার হয়। শহরের রাস্তায় রাস্তায় মনুষ্য রক্তের স্রোত বহিয়া যায়। টাইগ্রীস নদীর পানি মানুষের রক্তে লাল হইয়া যায়। হাসপাতালের রোগী, ডাক্তার এবং কলেজ সমুহের অধ্যাপক, ছাত্র নির্বিশেষে যেখানে যাহাকেই পাওয়া গিয়াছিল, নির্বিচারে হত্যা করা হইয়াছিল।

১৭৩৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে নাদীর শাহ মোগল বাদশাহ মোহাম্মদ শাহ কে কারনালের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল্লী দখল করে। নাদীর শাহ'র সৈন্য বাহিনী লক্ষাধিক দিল্লীবাসী হত্যা করে এবং তাহাদের সর্বস্ব লুট করে। দিল্লীর বাদশাহ এর ময়ুর সিংহাসনসহ সকল দামী বস্তু লুট্‌তরাজ করিয়া লইয়া যায়। নাদীর শাহ কয়েক হাজার তরুণীও লুণ্ঠন সামগ্রী হিসাবে লইয়া যায়।

অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে ১৯১৭ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখে নিরস্ত্র জনগণ সমবেত হয়। স্হানটির চতুর্দিক অট্টালিকা বেষ্টিত ছিল। ব্রিটিশ সেনাবহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের আদেশে তাহাদের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করা হয়। স্থানটির একটি মাত্র প্রবেশ পথ ছিল। বাহির হইবার আর কোন পথ ছিল না এবং কেহ পলায়ন করিতে পারেও নাই। ফলে কয়েক হাজার আহত ও নিহতদের লাশে স্থানটি পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

২৫-২৬ মার্চের ঘটনা সম্পর্কে জেনারেল নিয়াজী তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন (The Betrayal of East Pakistan, পৃঃ৪৫-৪৬)ঃ

On the night between 25/26 March 1971, General Tikka struck. Peaceful night was turned into a time of wailing, crying, and burning. General Tikka let loose everything at his disposal as if raiding an enemy, not dealing with his own misguided and misled people. The military action was a display of stark cruelty, more merciless than the massacres at Bukhara and Baghdad by Changez Khan and Halaku Khan, or at Jallianwala Bagh by the British General Dyer.

General Tikka, instead of carrying out the tasks given to him, i.e., to disarm armed Bengali units and persons and to take into custody the Bengali leaders, resorted to the killing of civilians and a scorched-earth policy. His orders to his troops were: 'I want the land and not the people.' These orders were carried out in letter and spirit by Major-General Farman and Brigadier (later Lt.-Gen.) Jahanzeb Arbab in Dhaka. Major-General Rao Farman had written in his table diary, 'Green land of East Pakistan will be painted red.' It was painted red by Bengali blood. ....

On the night between 25/26 March 1971 Yahya sneaked out of Dhaka before the start of military action. He told Tikka before leaving Dhaka, 'Sort them out.' Bhutto had remained behind to see what Tikka did. Bhutto saw Dhaka burning and heard the cries of the people, the crackle of burning material, the roar of tanks, the boom of guns and rockets, and the rattle of machine guns. In the morning, it is alleged, Bhutto patted Tikka, Farman, and Arbab on the back, congratulated them for doing exactly what was needed, and assured them that their future was secured. Bhutto kept his promise. Tikka secured the coveted post of COAS. Farman was made Chairman, Fauji Foundation, and Brigadier Arbab, despite the corruption charge proved against him, was promoted as Major-General and later Lieutenant-General. On reaching Karachi on 26

March, he told the people, 'Thank God Pakistan has been saved.'

কিন্তু ভারতীয় উর্দু কবি কাইফি আজমী ঠিকই উপলব্ধি করিয়াছিলেন ঃ (বঙ্গানুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন) ঃ

বাঙলাদেশ

আমি একটা দেশ নই
যে তুমি আমাকে জ্বালিয়ে তছ্‌নছ করে দেবে
আমি একটা দেওয়াল নই
যে আমাকে ভেঙে গুঁড়োঁগুঁড়োঁ করবে
একটা সীমান্তরেখা,-আমি তা'ও নই
যে তুমি আমাকে মুছে ফেলে দেবে

তুমি কি বেয়াকুফ
পিষে ফেলতে চাও আমাকে ট্যাঙ্কের তলায়
ভিক্ষেয় যা জুটিয়েছো
আমার ওপর ফেলতে থাকো নাপাম বোমা, দিনে-রাতে,
এতে একমাত্র নিজেকেই তুমি ফুরিয়ে ফেলবে
আমার কোন্ হাতটা তুমি শেকলে বাঁধতে চাও?
সাত কোটি হাত রয়েছে !
আমার কোন্ মাথাটা ধড় থেকে নামাতে চাও?
রয়েছে সাত কোটি মাথা !

খ) **মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঃ**

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় চট্টগ্রামে। ক্যাপ্টেন রফিক উল ইসলাম মার্চ মাসে চট্টগ্রামস্থ ইপিআর হেড্‌কোয়ার্টারে এ্যাড্‌জুটেন্ট পদে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমন আশঙ্কায় তিনি ২৫শে মার্চের পূর্বেই ইপিআর এর বিভিন্ন আউট পোষ্টে অবস্থিত ফেব্রুয়ারি অফিসার এবং অন্যান্য সেনা ইউনিটের ফেব্রুয়ারি অফিসারগণকে আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে সতর্ক ও সাবধান করেন। কিন্তু ই পি আর সি এর লেঃ কঃ এ এম চৌধুরী ও ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান তাহার সাবধান বাণীতে গুরত্ব প্রদান করেন নাই। ২৫শে মার্চ রাত্রি সাড়ে ৮টার সময়

আওয়ামী লীগের ড. জাফর এর নিকট হইতে তিনি জানিতে পারেন যে ঐদিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান গোপনে করাচী চলিয়া গিয়াছেন এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সেনা বাহিনী ও ট্যাংক বহর যুদ্ধাবস্থার জন্য প্রস্তুতি লইয়াছে। ঢাকা শহরের কতক জায়গায় মোতায়েন সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে। রাত ৮:৪৫ এর দিকে তিনি অয়্যারলেস কলোনীতে গিয়া ক্যাপ্টেন হায়াত ও অন্যান্য অবাঙালি সৈন্যদের গ্রেফতার করেন। এই গ্রেফতারের মধ্য দিয়াই ক্যাপ্টেন রফিক বাংলাদেশ স্বাধীনতার লক্ষে মুক্তিযুদ্ধের মহা সূচনা করেন। এরপর তিনি হালিশহরে রাত সাড়ে ৯ টায় পৌছান। ঐ স্থানের তিনটি অস্ত্রাগারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তিনি গ্রহন করেন। রাত ১০ঃ৪৫ মিনিটের মধ্যে ঐস্থানে অবস্থিত সকল অবাঙালি সৈন্য আটক করিতে সক্ষম হয়েন। তৎপর রেলওয়ে হিলে তিনি তাহার সদর দফতর স্থাপন করেন। তাহার প্রেরিত সাংকেতিক বার্তা অনুসারে সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত অবাঙালি সৈন্যদেরকেও রাত্রি সাড়ে ১১টার মধ্যেই পরাভূত করা হইয়াছিল এবং তৎপর বাঙালি ইপিআর সেনাদলগুলি তাহার সহিত যোগদানের জন্য চট্টগ্রাম অভিমুখে রওয়ানা করে কিন্তু কালুরঘাট ব্রিজের নিকট পৌঁছাইলে মেজর জিয়ার নির্দেশ অনুসারে কর্ণফুলি নদীর ওপারে চলিয়া যায়।

২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্র ও তৎপরবর্তীকাল কয়েকটি দিনে ঢাকা, জয়দেবপুর, ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়াসহ, ঠাকুরগাঁও হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সর্বত্র তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ছিল গণহত্যার প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ, আর পাকিস্তান নয় এবং স্বাধীনতা অর্জনের দূর্জয় সংকল্প। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে ঢাকার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি জঘন্যতম গণহত্যার প্রারম্ভে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয় হাজার হাজার নিরস্ত্র মানব সন্তানকে। ঢাকা শহরে পিলখানায় অবস্থিত ইপিআর এর সদর দফতর, রাজারবাগস্থ পুলিশ লাইন, মিরপুর থানা প্রভৃতি স্থানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মর্টার ট্যাংক ইত্যাদি লইয়া আক্রমন করিলে বাঙালি বাহিনী তাহাদের গুলি বারুদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাইয়া মৃত্যুবরণ করে।

ক্যাপ্টেন হারুন রাত ১০টায় ক্যাপ্টেন রফিকের বার্তা পাইয়া রাত সাড়ে ১১টার মধ্যে কাপ্তাই এ অবস্থানরত সকল অবাঙালি অফিসার ও সৈন্য বন্দী করেন।

ক্যাপ্টেন এম এস এ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ইপিআর বাহিনী ২৬শে মার্চ সকালে কুমিল্লা হইতে চট্টগ্রামগামী পাকিস্তান বাহিনীকে শুভাপুর ব্রিজে প্রতিরোধ করে। তৎপর কুমিরায় ২৮শে মার্চ পর্যন্ত প্রচন্ড যুদ্ধ হয়।

ক্যাপ্টেন রফিকের ইপিআর বাহিনী চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানের দখল ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তৎপর, বিমান বাহিনীর আক্রমন, যুদ্ধ জাহাজ হইতে প্রচন্ড গোলা বর্ষন এবং ট্যাংক আক্রমনের মুখে তাহারা ৩রা এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রাম শহর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেজর সাফায়াত জামিল ২৭শে মার্চ সকালে লেঃ কর্নেল খিজির হায়াত খানসহ সকল অবাঙ্গালী অফিসার ও সৈনিকদের বন্দী করেন। অতপর, শমসের নগর হইতে মেজর খালেদ মোশাররফ ঐদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌছাইয়া সমগ্র এলাকার অধিনায়কত্ব গ্রহন করেন। মেজর জিয়াউর রহমান ২৬শে মার্চের ভোর রাত্রে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল বাঙালি সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং কালুরঘাট ব্রিজ পার হইয়া পটিয়া থানায় ঘাটি স্হাপন করেন। ২৭শে মার্চ তারিখে বেলাল মোহাম্মদ তাহাকে কালুরঘাট রেডিও ষ্টেশনে লইয়া আসেন। তথায় ২৬শে মার্চ দ্বিপ্রহর হইতে শেখ মুজিব প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষনা প্রচারিত হইতেছিল। মেজর জিয়া ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে পূনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন। মেজর কে এম শফিউল্লাহ ২৮শে মার্চ সকালে জয়দেবপুরস্হ ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল উদ্বৃত্ত অস্ত্র ও যানবাহন লইয়া ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা করেন। জয়দেবপুর চৌরাস্তায় পোঁছাইয়া সকল গাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়ন করা হয় এবং জয়বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে তিনি টাঙ্গাইল শহর হইয়া ময়মনসিংহ গমন করেন। সেখান হইতে তিনি মেজর খালেদ মোশাররফের সহিত যোগাযোগ করেন। মেজর এম এ ওসমান চৌধুরী তাহার ইপিআর বাহিনী লইয়া চুয়াডাঙ্গায় ২৬শে মার্চ তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডিয়ন করেন এবং সকল অবাঙ্গালী সেনাদের আটক করেন। মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত হবিগঞ্জ হইতে সিলেট শত্রুমুক্ত করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ৩১শে মার্চ তিনি শ্রীমঙ্গল শত্রুমুক্ত করেন।

এইভাবে ২৬শে মার্চ বা ইহার অব্যবহিত পর হইতে বাংলাদেশের সর্বত্র ই পি আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালি সৈন্যগণ প্রায় একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করতঃ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে ক্যাপ্টেন রফিক, ক্যাপ্টেন হারুন, মেজর জিয়াউর রহমান বা ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া সকলেই বিদ্রোহের পরিণাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন কিন্তু তার পরেও চট্টগ্রামে যখন বাঙালিরা আক্রান্ত হইল তখন তাহারা কেহই নূতন কোন 'হুকুম' বা 'ঘোষণা' আসিবার কথা চিন্তাও করেন নাই, আশাও করেন নাই বা প্রয়োজনও মনে করেন নাই, কারণ প্রকৃত স্বাধীনতার ডাক বা ঘোষণা এবং নির্দেশ ৭ ই মার্চ তারিখেই দেওয়া হইয়াছিল। শেখ মুজিব ৩রা মার্চ হইতে তাহার বিভিন্ন বক্তৃতায় হঠাৎ উদ্ভূত কোন বিশেষ গুরুতর পরিস্থিতিতে তিনি কোন নির্দেশ প্রদান করিতে অপারগ হইতে পারেন এবং সেই অবস্থায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে বার বার সকলকে সতর্ক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সামরিক জান্তাকে সজাগ না করিয়া সকলকে প্রাণপণ হুঁশিয়ার করিবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতীয়মান হয় যে দেশের সেই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সকলেই তাঁহার সতর্কতা বাণী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণেই নতুন কোন নির্দেশ বা ঘোষণা ব্যতিরেকেই ক্যাপ্টেন রফিক, ক্যাপ্টেন হারুন, ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর ওসমান চৌধুরী, মেজর খালেদ মোশারফ,মেজর সাফাওয়াত জামিল, মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত এবং আরও আনেকে তাৎক্ষনিক বিদ্রোহ করিতে পারিয়াছিলেন।

একই ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে সিরাজগঞ্জের মহাকুমা প্রশাসক শামসুদ্দিন ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রি ১ টায় সংগ্রাম পরিষদ অফিসে আসিয়া প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্য পুলিশ আনসারের অস্ত্রশস্ত্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করেন। মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক-ই- এলাহী চৌধুরী মেহেরপুরে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলেন। বগুড়া শহরে গাজিউল হক স্থানীয় ছাত্র জনতাকে সঙ্গে লইয়া সশস্ত্র প্রতিরোধ আরম্ভ করেন।

উপরে বর্ণিত সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের সর্বত্র ২৬শে মার্চ হইতে প্রচন্ড সশস্ত্র প্রতিরোধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ২৬শে মার্চ সকালেই তৌফিক-ই- ইলাহী চৌধুরী সামরিক

সাহায্যের জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং ৩১শে মার্চ হইতেই ভারত হইতে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ আরম্ভ হয়।

উপরোক্ত ঘটনাবলী প্রমান করে যে শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের বক্তৃতা ও তৎপর দীর্ঘ মাসব্যাপি তাহার আহ্বান বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষকে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ করিবার জন্য সম্পূর্ণ মানসিকভাবে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিল। বাংলার মানুষ প্রমাণ করিয়াছিল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ অনুসারে তাহাদের যাহার যাহা কিছু ছিল তাহা লইয়াই তাহারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা মহীরুহ সদৃশ তাহাদের বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশঙ্কা ও কষাঘাত 'সাত কোটি বাঙালিরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি' অসত্য প্রমাণ করিয়াছিল। অবশ্য ইহাও সত্য যে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে সেই অবর্ণনীয় ভয়ঙ্কর মূহুর্তেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হন নাই, তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা জনগণের নিকট পৌছাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়াই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা কামনা বিমূর্ত্য হইয়া ওঠে। বিশ্বের ইতিহাসে ইহা একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা।

জেনারেল ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চের গভীর রাত্রে ঢাকা হইতে করাচী পৌঁছান। ইতিমধ্যে শেখ মুজিব ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে পাকিস্তান সেনাবহিনীর গণহত্যা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় জেনারেল ইয়াহিয়া করাচী হইতে নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন (দলিলপত্রঃ সপ্তম খন্ড, পৃঃ ১)ঃ

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
জাতির উদ্দেশে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণ।	ডন, করাচী, ২৭ মার্চ ; পাকিস্তান সরকার প্রচারিত পুস্তিকাঃ 'ব্যাকগ্রাউন্ড রিপোর্ট-৪'	২৬ মার্চ, ১৯৭১।

TEXT OF YAHYA'S BROADCAST
(On March 26,1971)

দলিলপত্র ঃ সপ্তম খন্ড, পৃঃ -১

In East Pakistan a non-co-operation and disobedient movement was launched by the Awami League and matters took a very serious turn. Events were moving very fast and it became absolutely impermative that the situation was brought under control as soon as possible. With this aim in view, I had a series of discussions with political leasers in West Pakistan and subsequently on the 15th of March I went to Dacca.

As you are aware I had a number of meetings with Sheikh Mujibur Rahman in order to resolve the political impasse. Having consulted West Pakistani leaders it was necessary for me to do the same over there so that areas of agreement could be identified and an amicable settlement arrived at.

As has been reported in the press and other news media from time to time, my talks with Sheikh Mujibur Rahman showed some progress. Having reached a certain stage in my negotiations with Sheikh Mujibur Rahman I considered it necessary to have another round of talks with West Pakistani leaders in Dacca.

Mr. Z. A. Bhutto reached there on 21st March and I had a number of meetings with him.

As you are aware, the leader of the Awami League had asked for the withdrawal of Martial Law and transfer of power prior to the meeting of the National Assembly.

Sheikh Mujibur Rahman's action of starting his non-co-operation movement is an act of treason. He and his party have defied the lawful authority for over three weeks. They have insulted Pakistan's flag and defiled the photograph of the Father of the Nation. They have tried to run a parallel Government. They have created turmoil, terror and insecurity.

A number of murders have been committed in the name of movement. Millions of our Bengali brethren and those who have settled in East Pakistan are living in a state of panic, and a very large number had to leave that Wing out of fear for their lives.

The Armed Forces, located in East Pakistan, have been subjected to taunts and insults of all kinds, I wish to complement

them on the tremendous restraint that they have shown in the face of grave provocation. Their sense of discipline is indeed praiseworthy. I am proud of them.

Reasonable Solution

I should have taken action against Mujibur Rahman and his collaborators weeks ago but I had to try my utmost to handle the situation in such a manner as not to jeopardise my plan of peaceful transfer of power. In my keenness to achive this aim I kept on tolerating one illegal act after another. And at the same time I explored every possible avenue for arriving at some reasonable solution. I have already mentined the efforts made by me and by various political leaders in getting Sheikh Mujibur Rahman to see reason. We have left no stone unturned. But he has failed to respond in any constructive manner; on the other hand, he and his followers kept on flouting the authority of the Government even during my presence in Dacca. The proclamation that he proposed was nothing but a trap. He knew that it would not have been worth the paper it was written on and in the vacum created by the lifting of Martial Law he could have done anything with impunity. His obstinacy, obduracy and absolute refusal to talk sense can lead to but one conclusion—the man and his party are enemies of Pakistan and they want East Pakistan to break away completely from the country. He has attacked the solidarity and integrity of this country—this crime will not go unpunished.

We will not allow some power hungry and unpatriotic people to destroy this country and play with the destiny of 120 million people.

In my address to the nation of 6th March I had told you that it is the duty of the Pakistan Armed Forces to ensure the integrity, solidarity and security of Pakistan. I have ordered them to do their duty and fully restore the authority of the Government.

In view of the grave situation that exists in the country today I have decided to ban all political activities throughout the counrty. As for the Awami League it is completely banned as a political party. I have also decided to impose complete Press censorship. Martial

Law regulations will very shortly be issued in pursuance of these decisions.

(গ) বাংলাদেশ সরকার ঃ

অযৌক্তিকভাবে নির্মম যুদ্ধ চাপাইয়া দিবার খোঁড়া অজুহাত ঐ ভাষণে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই ভাষণ দ্বারা পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীকে দেশ রক্ষার প্রয়াসে বাংলাদেশের নিরীহ মানুষের উপর চরম নির্যাতন চালাইবার উসকানী প্রদান করিয়াছে। ইয়াহিয়ার ঐ ভাষণ-পরবর্তী সময়ে পাকসেনাদের নির্মম অত্যাচারের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে। দেশে অবস্থান করা মানুষের পক্ষে আরো অসম্ভব হইয়া উঠে। এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মীগণ ১৯৭১ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুক্তিযুদ্ধ কালীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করিয়া মুজিবনগর হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। উক্ত স্বাধীনতা ঘোষনা নিম্নরূপ ঃ

"THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE
MUJIBNAGAR, BANGLADESH

Dated 10th day of April, 1971.

WHEREAS free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17th January, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a Constitution,

AND

WHEREAS at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League,

AND

WHEREAS General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing a Constitution,

AND

WHEREAS the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for an indefinite period,

AND

WHEREAS instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorirties declared an unjust and treacherous war,

AND

WHEREAS in the facts and circumstances of such treacherous conduct Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 million of people of Bangladesh, in due fulfillment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh,

AND

WHEREAS in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistan authorities committed and are still continously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

AND

WHEREAS the Pakistan Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government,

AND

WHEREAS the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh.

We the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme duly constituted ourselves into a Constitutent Assembly,

and having held mutual consultations, and

in order to ensure for the people of Bangladesh equality,

human dignity and social justice, declare and constitute Bangladesh to be a sovereign People's Republic and thereby confirm the delcaration of independence already made by Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, and

do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Banga Bandhu Shekih Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and

that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Froces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon.

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary,

shall have the power to levy taxes and expend monies,

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and

do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just Government.

We the elected representatives of the people of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President.

We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations that devolve upon us as a member of the family of nations and to abide by the Charter of the United Nations.

We further resove that this Proclamation of Independence shall be deemd to have come into effect from 26th day of March, 1971.

We further resolve that in order to give effect to this instument we appoint Prof. Yusuf Ali our duly Constituted potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

PROF. YUSUF ALI
Duly Constituted Potentiary
By and under the authority of
the Constitutent Assembly of Bangladesh.

(অধোরেখা প্রদত্ত)

উপরোক্ত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম সাংবিধানিক দলিল ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা উপরোক্ত স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রের প্রস্তাবনার ষষ্ঠ দফায় বর্ণনা করা হইয়াছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা উক্ত Proclamation of Indepdendence এর চতুর্থ দফায় নিশ্চিতভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করে। তাহাছাড়া, ইহার চতুর্দশ দফায় স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করে। যেহেতু বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদান করিয়াছিলেন সেইহেতু উক্ত তারিখই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

অতঃপর, স্বাধীনতা ঘোষণায় ব্যক্ত অঙ্গীকার অনুসারে দেশকে শত্রুমুক্ত করিবার দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া একটি প্রবাসী সার্বভৌম স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সনের ১৩ ই এপ্রিল তারিখে গঠিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হইতে এই সরকার গঠনের সংবাদ ঘোষণা করা হয়। এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিবরূপ (দলিলপত্র ঃ তৃতীয় খন্ড; পৃঃ ১৬-১৭)ঃ

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভা গঠন।	দি টাইমস অব ইন্ডিয়া-নয়াদিল্লি।	১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১।

MUJIB IS HEAD OF WAR CABINET FOR BANGLADESH

Press Report on April 13, 1971.

A <u>six-member war cabinet headed by Sheikh Mujibur Rahman</u> was formed in Bangladesh today when the West Pakistanis launched an all-out offensive in strongerholds of his liberation forces.

An important Awami League member announced somewhere in Bangladesh that the Government, with Nazrul Islam as Vice-President and the Party General Secretary, Mr. Tajuddin Ahmed, as Prime Minister, would guide and co-ordinate the war of liberation.

Today's announcement formalised Sheikh Mujibur Rahman's proclamation of a Sovereign Democratic Republic of Bangladesh on March 25 when the material law authorities cracked down on East Bengal calling the Sheikh a "traitor".

According to the announcement, Mr. Khondakar Mushtaque Ahmed is Foreign Secretary in the Government.

Other member of the Government are Capt. Mansoor Ali and Mr. A. H. Kamaruzzaman.

The Government came into being following protracted deliberations at a meeting of National Assembly memebers and top Awami League leaders.

Mr. Tajuddin Ahmed, a close associate of the Bangabandhu since long, had led the Awami League team at the advisers-level meeting during the abortive constitutional talks last month.

He and Mr. Kamaruzzaman were both General Secretaries of the Awami League.

Mr. Kamaruzzaman was also Secretary of the Awami Legague party in the National Assembly.

Mr. Khondakar Mushtaque Ahmed was belived to be the Awami Leaqgue's choice for, Speakership of the National Assembly which never met.

Mr. Mansur Ali, of Pabna, was leader of the Awami League party in the Provincial Assembly.

The formation of the Government was announced in a broadcast from the newly set up Swadhin Bangla Betar Kendra and confirmed by the Press Adviser to President Rahman.

The radio said formal proclamation of the new Government would take place at 9 a.m. tomorrow.

২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর এই পর্যন্ত ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যগণ, পুলিশ বহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর সদস্যগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ করিতেছিল। অতঃপর, প্রবাসী সরকার মুক্তিবাহিনীকে পুনর্গঠন করতঃ কেন্দ্রীয়ভাবে একটি শৃঙ্খলা ও কমান্ডের আওতায় লইয়া আসে। সেই লক্ষে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশকে কয়েকটি সেক্টরে ভাগ করিয়া প্রতিটি সেক্টর এর জন্য একজন করিয়া অধিনায়ক নিয়োগ প্রদান করে। তাহাছাড়া, Colonel M.A.G. Osmani কে মুক্তি ফৌজ এর

General Officer Commanding-in-Chief নিয়োগ প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট সংবাদটি নিবরূপ (দলিলপত্র ঃ তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৩-২৪)ঃ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্থায়ী সরকার কর্তৃক মুক্তি বাহিনীর পুনর্গঠন ঃ কর্নেল ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ।	এশিয়ান রেকর্ডার- মে ১৪-২০, ১৯৭১	১৪ই এপ্রিল ১৯৭১।

Re-organization of Liberation Forces :

The newly formed "Provisonal" Government on April 14 set about the task of transforming the liberation army into an organized force by setting up a full-fledged operational base and an Interim capital and naming commanders for well-defined liberated zones.

Col. Osmani of the Bengal Regiment, who had retired from active service some time before the flare-up in East Bengal, was appointed the General Officer Commanding-in-Chief of the "Mukti Fauj."

The names of regional commanders as announced by the Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed, were : Maj. Khalid Musharaf, Sylhet-Comilla; Maj. Ziaur Rahman, Chittagong-Noakhali; Maj. Safiulla, Mymensingh-Tangail; and Maj. M. A. Osman, South-west.

Besides the interim capital located in the western zone, a regional unit had been set in the Sylhet-Comilla zone with full administrative authority for the eastern region.

He said that in the Sylhet-Comilla region, Maj. Khalid Musharaf of the East Bengal Regiment had driven the Army to the cantonments of Sylhet and Comilla.

In the Chittagong-Noakhali sector, Maj. Ziaur Rahman was in full command of the liberation forces who had contained the enemy in limited pockets of Chittagong.

Maj. Safiulla was poised to march on Dacca after liberating all areas in Mymensingh and Tangail.

In the south-west region, Mr. Ahmed said, Maj. Osman had taken command, liberating large areas of Khulna, Kushtia, Jessore,

Faridpur, Barisal and Patuakhali. The enemy remained confined to Jessore cantonment and parts of Khulna town.

In North Bengal, a unified command of the East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles had laid siege on Rangpur and Saidpur enemy positions.

Democratic Republic of Bangladesh Proclaimed :

Amidst thunderous cheers from a 10,000-strong crowd which included contingents of the EPR, Ansars and Mujahids, the democratic Republic of Bangladesh was proclaimed in Mujibnagar on April 17 as a formally constituted State, to be run by a presidential form of Government.

The Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed declared that the Government's writ ran through 90 per cent of the territory, except for the cantonments and a few administrative headquarters which were being held by the Army. About 50 foreign journalists watched and recorded the proceedings.

The proclamation named Syed Nazrul Islam as Vice-President, but explained that if the President, Sheikh Mujibur Rahman, "is absent, or cannot function or is incapacitated," Mr. Islam would carry on the functions of the President.

Pending the formulation of a new Constitution, the President would be the head of the armed forces and the sole legislative authority. He would appoint the Prime Minister and his colleagues, levy taxes and authorize expenditure and would convene or adjourn a Consitutent Assembly.

স্বাধীনতা ঘোষণার দুইমাস পর পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন মিথ্যা প্রচারণার জবাবে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলেন (দলিলপত্র। তৃতীয় খন্ড, পৃঃ৫৩)ঃ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রচারিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতকার।।	দি টাইমস অব ইন্ডিয়া।	৩ জুন, ১৯৭১।

FREEDOM AT ALL COSTS :
TAJUDDIN
Report of Mr. Tajuddin Ahmed's interview with All India Radio
On June 2, 1971.

The Bangladesh Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed said in Mujibnagar today that Bangladesh "is sovereign and independent and its people will defend its separate and free entity at all cost."

In an interview with All-India Radio, Mr. Ahmed reiterated "our irrevocabe commitment to a policy of friendship for all, especially or neighbours irrespective of variations in the response of world Powers to our present difficulties.

Mr. Ahmed said his Government had approached the United States for intervening for a political settlement. "We should like to make it absolutely clear to everyone that there is no room for compromise within the framework of Pakistan, Bangladesh is sovereign and independent and we shall defend its separate and free entity at any cost. "

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ৩রা মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় অধিবেশন স্থগিত হইয়া গেলে প্রচন্ড আন্দোলন আরম্ভ হয়। সামরিক জান্তা একদিকে আলোচনা অব্যাহত রাখে, অন্যদিকে ২২শে ফেব্রুয়ারির পর হইতেই প্রতিদিন সৈন্যদল ও সামরিক রশদ পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্বাঞ্চলে আসিতে থাকে। ৬ই মার্চ তারিখের এক ঘোষণায় ২৫শে মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করা হয়। কিন্তু ২৫শে মার্চের এক ঘোষণায় সংসদ অধিবেশন পূনরায় স্থগিত করিয়া জেনারেল ইয়াহিয়া সন্তর্পনে করাচী প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে গণহত্যা আরম্ভ হয় এবং ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার কিছুক্ষনের মধ্যেই সামরিক জান্তা তাহাকে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য যে ১৯৬৬ সন হইতে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্ব-শাসনের আন্দোলন শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে আরম্ভ হয়। ৬ দফার দাবীর ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। মার্চ মাসের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁহার নেতৃত্বেই ধাপে ধাপে আগাইয়া যায়। তাঁহার আকস্মিক গ্রেপ্তারে স্বভাবতই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে একটি বিরাট শুন্যতার সৃষ্টি হয়। নেতৃত্বের সেই সঙ্কট তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে শেখ মুজিবের সহকর্মীগণ অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সহিত মোকাবিলা করেন। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহারা Proclamation of Independence প্রদান করত একটি প্রবাসী

সরকার গঠন করেন এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহাদের কাহারই কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকিলেও এই চরম দুঃসময়ে এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তি ফৌজ গঠন ও যুদ্ধ পরিচালনায় তাহারা দক্ষতার পরিচয়ই দিয়া ছিলেন। তাহারা নিজেদের নির্ভেজাল ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দ্বারা তাহাদের অনভিজ্ঞতাকে পোষাইয়া লইয়াছিলেন। তাহারাই এত স্বল্প সময়ে বিজয় দিবস সম্ভব করিতে পারিয়াছিলেন।

২৬শে মার্চ বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতা ঘোষণার অপরাধে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাংলাদেশে পৃথিবীর ইতিহাসে নগ্নতম গণহত্যা ও সর্বপ্রকার অত্যাচার নিপীড়ন আরম্ভ করতঃ বাঙালি জাতিকে নিঃশেষে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই অসহনীয় অবস্থায় বাঙালি জাতি রুখিয়া দাঁড়ায়। মুক্তিযোদ্ধারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে।

(ঘ) স্বাধীনতা বিরোধী বাঙালি ঃ

কিন্তু সে সময়েও এক শ্রেণীর বাঙালি ভদ্রলোক গণহত্যাকারী সামরিক জান্তার পক্ষালম্বন করতঃ স্বাধীন বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধাচারণ করতঃ গণহত্যাকে সমর্থণ করিতে থাকে। এমন কয়েকজন বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের বিবৃতি-বর্ণনা এখানে প্রদান করা হইল (দলিলপত্র ঃ সপ্তম খন্ড, পৃঃ ৬৫৯-৬৬০)ঃ

দৈনিক পাকিস্তান, ৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভারত ভিত্তিহীন প্রচারণা চালাচ্ছে

-হামিদুল হক চৌধুরী

দলিলপত্র (বিডি ৭ম খন্ড পৃঃ ৬৫৯-৬৬০)

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিশিষ্ট এডভোকেট জনাব হামিদুল হক চৌধুরী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ-

পূর্ব পাকিস্তানীরা যাই চেয়ে থাক না কেন, তারা নিশ্চয়ই দেশের ঐক্য

বানচালের পরিকল্পনা করেনি বা করেনা।

পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন এবং সম্প্রসারণবাদী সুবিধার জন্য পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই ভারতের প্রচারণার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য পূরণ এবং বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য সকল তথ্য মাধ্যমে বোমা বর্ষণ করে শহর সমূহকে ধ্বংস ও হাজার হাজার লোককে হত্যার মিথ্যা অভিযোগ বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে।

বস্তুতপক্ষে খবর ও অভিমতের ব্যাপারে ভারতীয় বেতার-সময়ের অর্ধেকটাই এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যয় করা হচ্ছে। কতদিন এই ধরণের মিথ্যা টিকে থাকতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানীরা কি চায় তা মাত্র ১২০ দিন আগে ঘোষিত হয়েছে- এখন সমগ্র প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা একটি মাত্র জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দেন।

জনগণ সমগ্র দেশকে (পূর্ব ও পশ্চিম) একটি ইউনিট গণ্য করে একটি মাত্র জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে বসার জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে একটি একক দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তান সহ পাঁচটি স্বায়ত্বশাসিত ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত সেই দেশের সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

ভারতীয় প্রচারণাকারীরা কি করে দাবী করেন যে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং সেই অর্থহীন তত্ত্বের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন দিতে শুরু করেছে।

প্রকৃত পক্ষে এই ধরণের ব্যক্তিদের পাকিস্তান অপেক্ষা ভারতে বেশী পাওয়া যাবে। প্রাণহানি হয়েছে, কারণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা হতে বাধ্য, যখন আইন ও শৃংখলা এমন এক পর্যায়ে ভেংগে পড়েছিল যা আমার ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে দেখেছি। এটা খুবই দুঃখজনক এবং এটা এড়ানো প্রত্যেকেরই কাম্য।

আমি আশা করি গোটা অঞ্চলের শান্তি এবং উভয় দেশের জনগণের কল্যাণের খাতিরে ভারত এই শত্রুতামূলক পথ থেকে বিরত হবে। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে ভারতের কোন সন্দেহ থাকলে এখানে তাদের কূটনীতিকদের কাছ থেকে তারা সহজেই তা জানতে পারেন। এই কূটনীতিকরা আবাসিক এলাকায় নিরাপদে বাস করছেন যে আবাসিক এলাকা ভারতের উর্বর বেতার ও প্রচারণাকারীদের মতে ভূমিসাৎ করা হয়েছে।

এখন সকল শ্রেণীর জনগণের কর্তব্য হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে দ্বিগুণ নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করা। মার্চ মাসে তিন সপ্তাহ যাবৎ হরতালের ফলে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়।

প্রত্যেক নাগরিকের প্রত্যেক সরকারের কাছে এই আশা করার অধিকার আছে যে তাদের জীবন, স্বাধীনতা এবং পেশা রক্ষিত হবে। যত শীঘ্র সম্ভব বেসামরিক জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই

প্রসংগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিবৃতি অভিনন্দন যোগ্য ।

দৈনিক পাকিস্তান, ৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

দৈনিক পাকিস্তান ঃ ৮.৪.১৯৭১

পাকিস্তান ধ্বংস করার আরেকটি পদক্ষেপ ভারতের ভূমিকা প্রসংগে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ

(দলিলপত্র ৭ম খন্ড পৃঃ ৬৬৫-৬৬৬)

পাকিস্তান কাউন্সিল লীগের এগারো জন নেতা গত সোমবার সংবাদ পত্রে নিম্ন লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারত পাকিস্তানের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে আসছে। এর বিশেষ কারণ এই যে ভারতের অঞ্চল থেকে দুটো অঞ্চলকে আলাদা করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ভারত মানসিক দিক থেকে কখনোই মেনে নিতে পারেনি।

একথা সকলেরই জানা আছে যে ভারতবিভাগ বাতিল করার জন্য ভারত প্রতিটি সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। এমনকি ভারত ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের উপর সশস্ত্র হামলাও করেছিল। কিন্তু বীর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ এই জঘন্য প্রয়াসকে পুরোপুরি ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমাদের জনসাধারণ কখনোই ভুলবেনা যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে ভারতীয় মুসলমানদের এই বাসভূমি অর্জিত হয়েছে। কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ঐ আত্মত্যাগ করা হয়নি- হয়েছিল ইসলামিক সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে আদর্শ ভিত্তিক জীবনযাত্রা বাস্তবায়নের জন্য।

পাকিস্তান এখন বিভক্ত হয়েছে বলে ভারতীয় নেতারা যে অভিমত পোষণ করছেন তা পুরোপুরি ভুল। সমগ্র জনসাধারণ দেশের সংহতি রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পাকিস্তানের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সমস্যা পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং তা জনসাধারণকে দেশের সংহতি ও আদর্শ রক্ষা থেকে কখনোই বিরত করবেনা।

ভারতীয় পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আর একটি পদক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয়। ভারত তাই তার বেতার মারফত মিথ্যা ও অন্যায় প্রচারণা দ্বারা বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের জনসাধারণ এই ভিত্তিহীন প্রচারণায় কান দেবেন না।

ভারত আমাদের এই প্রিয় দেশ দখল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সশস্ত্র সৈন্য পাঠাচ্ছে।

আমরা দৃঢ় কণ্ঠে ভারতের এই দূরভিসন্ধিমুলক কার্যক্রমের নিন্দা করছি। আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য শত্রুর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন (১) পাকিস্তানের মুসলিম লীগের সহ সভাপতি এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, (২)পাকিস্তান মুসলিমলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাসেম, (৩) পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দিন, (৪)পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আতাউল হক খান (এডভোকেট), (৫)পাকিস্তান প্রদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আতাউল হক (এডভোকেট), (৬) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নুরুল হক মজুমদার (এডভোকেট), (৭) ঢাকা শহর মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সেরাজুদ্দিন, (৮) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম মুজিবুল হক, (৯) ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি কে এম সেরাজুল হক, (১০) ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক নেজামুদ্দিন, (১১) ঢাকা শহর মুসলিম লীগের সম্পাদক এ মতিন (এডভোকেট)।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১।

পূর্বদেশ ৫-৫-১৯৭১

নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য শাহ্ আজিজের আহবান

(দলিলপত্র ঃ ৭ম খন্ড পৃঃ ৬৭৫-৬৭৬)

ঢাকা, ৪ঠা মে (এপিপি)। জাতীয় পরিষদের সাবেক বিরোধী সহকারী নেতা শাহ্ আজিজুর রহমান গত সোমবার এক বিবৃতিতে ভারতের নয়া সম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিকে নস্যাৎ করার ব্যাপারে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতাদান করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান। শাহ্ আজিজের বিবৃতির অংশ বিশেষ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

আমার দেশবাসী পাকিস্তান সৃষ্টি ও তার অস্তিত্ব সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন রয়েছে। বিশ্ব পার্লামেন্টারী ফোরামে আমি ভারতের দুরভিসন্ধি ও কাশ্মীর সম্পর্কে, ন্যায়সঙ্গত দাবি সম্পর্কে আমাদের জাতীয় অভিমত পেশ করেছিলাম। পাকিস্তান সরকার এধরণের কয়েকটি বক্তৃতা প্রকাশ ও প্রচারও করেছিলেন।

রাজনৈতিক দলগুলোকে সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা দানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুণঃ প্রবর্তনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সচেষ্ট ছিলেন। আওয়ামী লীগ নামে পূর্ব পাকিস্তান প্রধান রাজনৈতিক দলটি সাম্প্রতিক নির্বাচনে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেও গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনের সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। আওয়ামী লীগের তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের স্লোগানে এখানে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বত্র ভীতি ও ত্রাস বিরাজ করছিল। গত নির্বাচনের সময় আমাকে ও আমার কর্মীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। এর

বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ উত্থাপন করেও কোন রকম সাড়া পাওয়া যায়নি। মানুষের দেশপ্রেমের নিশ্চয়তা পরিমাপেরকোন যন্ত্রনেই বলে তিনি জানান।

দেশের সংহতি বিনষ্ট করার জন্য ২৫শে মার্চের আগে যারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী তাদের সে প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে। ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেযে জঘন্য, হস্তক্ষেপ করছে তিনি তার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ভারত আন্তর্জাতিক সমস্ত বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করেছে। ভারতের বন্ধুত্বের মুখোশ বিশ্বের কাছে ধরা পড়ে গেছে। ভারত যাতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে সে জন্য তিনি হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেন। নয়া সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দেশ প্রেমিকদের সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতাদানের জন্য শাহ আজিজুর রহমান জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ছেন।

-পূর্বদেশ, ৫ মে, ১৯৭১।

দৈনিক পাকিস্তান ৯-৭-১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের জীবনের নিরাপত্তা নেই-একথা ভিত্তিহীন ।

-ডঃ সাজ্জাদ হোসেন

(দলিলপত্রঃ ৭ম খন্ড পৃঃ ৬৮০-৬৮১)

লন্ডন, ৮ই জুলাই (রয়টার)। -পূর্বপাস্তিানের শহর ও গ্রামে বাঙ্গালীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই বলে যে কথা বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের দুইজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক গতকাল তা অস্বীকার করেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এস সাজ্জাদ হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার ডঃ এম মোহর আলী টাইম পত্রিকায় লিখিত এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁদের এই অস্বীকৃতির কথা জানান।

বিদেশে প্রচারিত নৃশংসতার কাহিনী উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে এ ধরণের কাহিনী প্রচার অব্যাহত থাকার ফলেই এ রকম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে শহরে ও গ্রামে বাঙ্গালীদের বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জীবনেরকোন নিরাপত্তা নেই।

বুদ্ধিজীবীদের পাইকারী হত্যা করা হয়েছে বলেযে কাহিনী প্রচারিত হয়েছে, অধ্যাপকদ্বয় তাও অস্বীকার করেছেন।

চিঠিতে বলা হয় যে, মার্চের ২৫শে-২৬শে তারিখে জগন্নাথ ও ইকবাল হলের আশে পাশের এলাকায় যুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন শিক্ষক প্রণ হারিয়েছেন বলে জানা গেছে।

চিঠিতে বলা হয় যে, আমাদের ৩ জন সহযোগী প্রাণ হারাতেন না যদি না তারা যে ভবনগুলোতে বাস করতেন সে গুলোকে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতা ঘাঁটি হিসেবে

ব্যবহার করতো।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৯ জুলাই, ১৯৭১।

দৈনিক পাকিস্তান ২-৯-১৯৭১

বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী

করাচীতে গোলাম আজম

(দলিলপত্র ঃ ৭ম খন্ড পৃঃ ৬৮৫-৬৮৬)

করাচী, ১লা সেপ্টেম্বর (এপিপি)।- গতকাল পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম অবিলম্বে জাতীয় পরিষদ বাতিল এবং যখনই সময় অনুকূল হবে তার সাথে সাথে সমগ্র দেশে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবান জানিয়েছেন। গতকাল এখানে জামাত অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দান কালে তিনি বলেন যে, পরবর্তী আদমশুমারী সমাপ্ত হওয়ার পরই দেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়া উচিৎ।

তিনি অবিলম্বে পরবর্তী আদমশুমারী অনুষ্ঠানের জোর দাবী জানান। কারণ পরবর্তী আদমশুমারী অনুষ্ঠানের সময় বেশ আগেই হয়েছে। তিনি সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে শাস্তি দানের আহবান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী গ্রুপ), জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পারিচালিত ন্যাশনাল লীগ ও ন্যাপের (ওয়ালী গ্রুপ) পূর্ব পাকিস্তান শাখার নাম উল্লেখ করেন।

তাঁর মতে এসব দলের সদস্যরা এখনো পূর্ব পাকিস্তানে গোপনে তৎপরতা চালাচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে হতাশার ভাব সৃষ্টি করছে। পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য তিনি ৫ দফা পরিকল্পনার কথা সুপারিশ করেছেন। অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, ঢাকায় সদর দফতর সহ "পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনর্বাসনের জন্য অর্থনৈতিক কমিটি" নামে একটি বিশেষ সংস্হা নিয়োগ করা উচিত। এই সংস্হার কাজ হবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করে দেখা এবং সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবন ও সুপারিশ পেশ। দ্বিতীয়তঃ যত শীঘ্র সম্ভব বন্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তবে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনার তৃতীয় দফা হচ্ছে পৃথক উত্তরবঙ্গ প্রদেশ স্থাপন এবং এজন্য নয়া শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা রাখতে হবে। ঢাকা থেকে সরাসরি উত্তরবঙ্গ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম তদারক করা খুব অসুবিধাজনক। কারণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র নদ এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। তিনি বলেন, চতুর্থ দফা হচ্ছে ফসল হানির দরুণ পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারের ব্যবস্হা গ্রহণ করা উচিত। শেষ দফায় পূর্ব পাকিস্তানে বেকার সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বলা হয় যারা কাজ করতে চান, তাদেরকে কাজ দিতে হবে। অধ্যাপক আজম পাকিস্তান রক্ষা ও মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান

সেনাবাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

তিনি বলেন, কোন ভাল মুসলমানই তথা কথিত 'বাংলাদেশ আন্দোলনে'র সমর্থক হতে পারে না। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার জন্য একমন ও দেশ প্রেমিক লোকেরা একত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। রাজাকাররা খুবই ভাল কাজ করছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শহীদ রশীদ মিনহাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, এই আত্মত্যাগের নিদর্শন থেকে তরুণরা উপকৃত হতে পারবে।

-দৈনিক পকিস্তান, ২সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

দৈনিক পাকিস্তানঃ ২৪-১১-১৯৭১

'আক্রমন করাই দেশ রক্ষার বড় কৌশল'

দলাদলি ভুলে ঐক্যবদ্ধ হোন ঃ গোলাম আজম

(দলিলপত্রঃ ৭ম খন্ড পৃঃ ৭০১-৭০২)

লাহোর, ২৩শে নবেম্বর, (এপিপি)।-পূর্ব পাকিস্তানে জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম জনসাধারণের প্রতি রাজনৈতিক দলাদলি ভুলে গিয়ে কার্যকর ভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে এখানে পৌঁছে তিনি সাংবাদিকদে সাথে আলাপ করছিলেন। তার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব মন্ত্রী মাওলানা এ, কে, এম ইউসুফ এবং জামাতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা আবদুর রহিমও ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে সর্বশেষ ভারতীয় আক্রমণ প্রশ্নে, গোলাম আজম বলেন, এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। তফাৎ হলো এই যে, এবারের আক্রমণটা আরো বড় আকারের। তিনি বলেন, দেশকে রক্ষার সবচেয়ে বড় কৌশল হলো আক্রমণ করা। তিনি এ কথা বহুবার বলেছেন এবং এখন এটা আরো বেশী সত্য।

তিনি বলেন, আত্মরক্ষার কৌশল শত্রুকে আরো বেশী উৎসাহী ও শক্তিশালী করে তোলে। ভুট্টোর নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে ইচ্ছুক মাত্র একজন লোক দলীয় রাজনীতি করছেন।

ভারতীয় হামলার এই হুমকির মুখে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেশে জাতীয় সরকার গঠনের পক্ষপাতি। তার এই সুপারিশ তিনি তার দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেশ করবেন বলে জানান। গোলাম আজম বলেন, গত ৮ মাস ধরে সীমান্তের ঘটনাবলীর দরুন পূর্ব পাকিস্তানের লোক খুব উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, দুস্কৃতিকারীরা খুবই সক্রিয়, ভারত প্রকাশ্যে তাদের সাহায্য করছে এবং অস্ত্র সরবরাহ করছে।

সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চলছে এবং প্রকৃত ভোট গ্রহণ করার অসুবিধা রয়েছে। নয়া অর্ডিন্যান্সের ফলে আরো বহু প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করবেন বলে

আশা করা যায়। বিমানবন্দরে ভুট্টোকে সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে আগত বিপুল সংখ্যক পিপলস পার্টি কর্মী জামাতে ইসলামী ও অধ্যাপক গোলাম আজমের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। সমবেত জামাত কর্মীরাও পাল্টা শ্লোগান দেয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭১।

দৈনিক ইত্তেফাকঃ ২-১২-১৯৭১

সত্যিকার অর্থেই ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান

-গোলাম আজম

(দলিল পত্র ৭ম খন্ড পৃঃ ৭০৪)

রাওয়ালপিন্ডি, ১লা ডিসেম্বর (এপিপি) । - পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে সত্যিকার অর্থে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য গতকাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং প্রেসিডেন্টকে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য পররাষ্ট্র ও অর্থ দফতরের দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে দিতে হইবে।

প্রেসিডেন্টের সহিত ৭০ মিনিট কাল স্থায়ী এক বৈঠকের পর আয়োজিত এক সাংবাদিক সন্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেনঃ প্রেসিডেন্টের সহিত বৈঠকের সময় তিনি প্রেসিডেন্টকে এই মর্মে পরামর্শ দিয়াছেন যে অতীতে যে সমস্ত অবিচার করা হইয়াছে সেগুলি দুরীভূত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনই হইবে বর্তমানের প্রধান কর্তব্য। ইহাতে প্রেসিডেন্টের সাড়া প্রদান উৎসাহব্যঞ্জক বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, প্রেসিডেন্ট তাহাকে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনের ব্যাপারে তিনি আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাইবেন। তিনি বলেন জনগণের বর্তমানে প্রধান কাজ হইতেছে দেশের প্রতিরক্ষা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায় একত্রিত হওয়া। জনাব গোলাম আজম এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে বর্তমান সংকট মোকাবিলা করার জন্য জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবেন। তথাকথিত মুক্তিবাহিনীকে শত্রুবাহিনী রুপে আখ্যায়িত করিয়া তিনি বলেন যে তাহাদিগকে মোকাবিলা করার জন্য রাজাকাররাই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি আহবান জানান।

জনাব ভুট্টো সম্পর্কে গোলাম আজম বলেন যে, প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব নুরুল আমীন সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে ভুট্টো যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন সে ব্যাপারে তিনি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

-দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

এই বঙ্গভূমিতে যুগে যুগে যেমন সিরাজ উদ দৌলা, মীরমদন, মোহনলাল, তীতুমীর, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, মাষ্টার দা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার গং জন্ম গ্রহন করেছে করিয়াছে, যাহাদের স্মৃতি আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে গভীর মমত্ববোধ নিয়ে স্মরণ করি, তেমনি এই দেশে মীরজাফর এবং তাহার উত্তরসুরীগণও জন্ম লইয়াছে এবং তাহারা প্রতি পদে পদে দেশের স্বাধীনতা সম্মান বিকাইয়া দিয়া গিয়াছে। যাহার মূল্য যুগে যুগে এই দেশ ও দেশবাসীকেই দিতে হইয়াছে।

(ঙ) গণহত্যা, অত্যাচার নিপীড়ন ঃ

অত্র রীট্ মোকাদ্দমাটির দরখাস্তে অন্যান্য প্রার্থনাসহ রমনা রেসকোর্স ময়দানের যেস্থানে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করিয়াছিল সেই স্থানটি ঐতিহাসিক গণ্যে উক্ত স্থান হইতে সকল স্থাপনা অপসারণ করতঃ সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ইহা স্বীকৃত সত্য যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হইয়াছিল ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে এবং শত্রুসেনা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল ১৬ই ডিসেম্বর। ২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তাহা সাফল্যমন্ডিতভাবে সমাপ্তি লাভ করিয়াছিল। নিঃসন্দেহে এই দুইটি ঘটনা ঐতিহাসিক।

এই মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের জনগণের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সমাপ্তিতে আমরা একটি স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র লাভ করি যাহার নাম 'বাংলাদেশ'। প্রকৃতপক্ষে এই মুক্তিযুদ্ধ এবং রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যূদয় পৃথিবীর ইতিহাসকেও প্রভাবিত করিয়াছে।

উপরে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু এই বিজয় শুধুমাত্র একদিনের ঘটনা নয় বা ঐদিন যে কয়েকজন জেনারেল সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে শুধুমাত্র তাহারাই ঐ মহান বিজয়ের একমাত্র কুশিলব নহেন। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধের নয়মাসে যে অগণিত মানব সন্তান নির্মমভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন তাহারা সকলেই মুক্তিযুদ্ধের উপজিব্য, তাহারা নিজেরা লাশ হইয়া, কঙ্কাল হইয়া বিজয় দিবসের ইতিহাস বিনির্মাণ করিয়াছেন। তাহারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়া ইতিহাস হইয়াছেন। অগণীত বাঙালি নারী তাহাদের সম্ভ্রম ও জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। অগণীত তরুন, তরুণী, যুবক, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক যাহাদের যুদ্ধ সম্বন্ধে

বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না তাহারাও মুক্তিযুদ্ধে জীবনপন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সম্মুখে এক ভয়াবহ যুদ্ধ অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু তাহারা জীবনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং গৃহের নিরাপদ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এক ভয়াবহ যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই বাংলাদেশ আদৌ স্বাধীন হইবে কি না বা তাহারা যুদ্ধ হইতে আদৌ ফিরিতে পারিবেন কিনা কিছুই তাহারা জানিতেন না, সব কিছুই অনিশ্চিত ছিল। দেশের জন্য তাহাদের নিঃস্বার্থ এই ভালবাসা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের মধ্যেও দেখা যায় না। জর্জ ওয়াশিংটনকে তাঁহার সৈন্যদের সেনাবাহিনী হইতে পলায়ন রক্ষা করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। অথচ মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য হাজার হাজার বাঙালি তরুণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগদান করিত। তাহাদের সেই নিঃস্বার্থ সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে বাঙালি জাতি বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখন্ড, একটি জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত প্রাপ্ত হইয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই স্বাধীন ভূ-খন্ড মুক্তিযোদ্ধাদেরই অবিস্মরনীয় দান। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া কী বিজয় দিবসকে ঐতিহাসিক বলা যাইবে। এমনকি যাহারা বাঙালি হইয়াও আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহারাও নেতিবাচক হিসাবে এই ইতিহাসের অংশ ।

এই কারণে বিজয় দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে শুধুমাত্র উপরের বর্ণনা একেবারেই যথেষ্ট নয়। আমাদের কী প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা ঘোষণা হইল, কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের সুচনা হইল, কী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা হইল, কীভাবে মুক্তি সংগ্রাম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাইল তাহার সকল ঘটনাবলী কিছুটা হইলেও আমাদের জানিতে হইবে। আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে বাংলার মানুষ পাকিস্তান স্বাধীন করিলেও শুধুমাত্র নিজেদের স্বায়ত্বশাসন দাবী করিবার অপরাধে কীভাবে গণহত্যার স্বীকার হইতে হইল, লক্ষ লক্ষ নারী তাহাদের সর্ব্বস্ব হারাইল, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান কংকাল হইয়া ইতিহাসের অংশ হইয়াছে। তাহাদের বাদ দিয়া বিজয় দিবসের ঐতিহাসিকতা প্রাণহীন প্রহসনে পরিণত হইবে।

নিম্নে গণহত্যা ও নির্যাতনের বর্ণনা প্রকৃত ঘটনার তুলনায় মাত্র সামান্য অংশ হইলেও নমুনা হিসাবে আমরা বিবেচনায় লইব। উল্লেখ্য যে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র' (দলিলপত্র) হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৯৭১ সনের ২৫/২৬ মার্চ মাসের মধ্যরাত্রি হইতে বাংলাদেশে যে গণহত্যা আরম্ভ হয় সে সম্বন্ধে Major Siddiq Salik তাহার Witness to surrernder পুস্তকে বলেন যে 'The gates of hell had been cast open' । ঐ একই সময়কার ঘটনা লইয়া Lt. General AAK Niazi তাহার 'The Betrayal of East Pakistan' পুস্তকে লেখেন 'The military action was a display of stark cruelty, more merciless than the massacres at Bukhara and Baghdad by Chandgez Khan and Halaku Khan, or at Jallianwala Bagh by the British General Dyer.

২৫/২৬ মার্চ রাত্রি হইতে পরবর্তী নয় মাস বাংলাদেশে যে গণহত্যা, অত্যাচার, ধর্ষণ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী চালাইয়াছিল তাহার কোন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। এই সকল জঘণ্য অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল ইসলামের নামে, পাকিস্তান রক্ষার নামে যদিও পাকিস্তান বাঙালিদেরই সৃষ্টি।

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে স্বভাবতই আমরা আনন্দে উদ্বেলিত হই কিন্তু সেই আনন্দের পিছনে রহিয়াছে লক্ষ লক্ষ মানুষের লাশ, রক্ত, কংকাল অশ্রু,বেদনা। সেই আর্তনাদের মাত্র সামান্য কিছু অংশ নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জগন্নাথ হলে পাক বাহিনীর গণহত্যার উপর কয়েকটি প্রতিবেদন।	দৈনিক পূর্বদেশ	ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-১
পঁচিশের সেই ভয়ঙ্কর রাতে তিনি একটানা ১৯ ঘন্টা ম্যানহোলে ছিলেন
শ্রী পরিমল গুহ
(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৪১৬-৪১৭)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জগন্নাথ হল। সার্ভেন্টস কোয়ার্টার । পাশেই গোয়াল। এর নিকটের ম্যানহোলে একটানা ১৯ ঘন্টা আত্মগোপন করে থেকে তিনি আত্মরক্ষা করেছেন। নিজেকে রক্ষা করেছেন হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলা থেকে ম্যানহোলে । পুতি দুর্গন্ধময় । মাঝে মাঝে তার দম বন্ধ হয়ে যেত। মাথা ঝিম্

ঝিম্ পা রি রি করত। উপায় নেই বেরুবার। অবিরাম গোলাগুলির শব্দ। মানুষের আর্তনাদ, কান্নার শব্দ, সবই তার কানে ভেসে আসছিল।

একটু পর পর কিছু সময় অন্তর অন্তর ম্যানহোল থেকে কোন রকমে গলাটুকু পর্যন্ত বের করে তিনি শ্বাস- প্রশ্বাস নিয়েছেন। এক পলক দেখে নিতে চেষ্টা করেছেন ম্যানহোলের বাহিরের দুনিয়াটাকে, যখন তখন বিভৎস হত্যালীলা চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পরিমল গুহ আমার কাছে ২৫শে মার্চের ভয়াল ভয়ঙ্কর রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

তিনি এই দুঃস্বপনের রাতের একজন সাক্ষী হয়ে ছিলেন। ম্যানহোলে কোন রকমে ঢুকে পড়ে মৃত্যু পুরীর নিশ্চিত পরিণাম থেকে নিজেকে অনেকটা অলৌকিক ভাবে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন ২৫শে মার্চ রাতে প্রায় ১১ টার দিকে আমি প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রথীন রায়ের লক্ষীবাজারস্হ বাসা থেকে হলে ফিরি। তখনো হানাদার সামরিক বাহিনীর লোকেরা হামলা শুরু করেনি। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিকেড তৈরী করছেন। গাড়ীগুলো ক্ষীপ্র গতিতে চলাচল করছে। রথীনদার বাসা থেকে রাস্তায় পা বাড়াতেই লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোথায় যাবেন। আমি জগন্নাথ হলে যাব শুনে সবাই আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন, শহরের অবস্হা খুব উত্তপ্ত, যে কোন সময় সামরিক বাহিনী নামতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাই হবে এদের প্রধান লক্ষ্যস্হল।

আপনি যাবেন না। শ্রী পরিমল গুহ বলেছেন, লোক জনের কথা শুনে আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই। ভাবলাম রাত্রে হলে ফিরবনা, হলে তখন অনেক ছাত্র। হলে অবস্হানরত ৬০/৭০ জন ছাত্রের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তাদের কথা ভেবে আমি হলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মরলে সবাই এক সাথে মরবো আর বাঁচলে সবাই একসাথে বাঁচবো। ওদেরকে ও ভাবে ফেলে আমি নিজের প্রাণ রক্ষাকে বিরোধী ভেবে হলে ফিরি।

রাত্র তখন পুরো ১১টা। চারিদিকে থম থমে ভাব। গাড়ী ঘোড়া চলাচল বন্ধ। নিরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে দূর থেকে গগন বিদারী শ্লোগান "জয় বাংলা, বাংগালী জেগেছে-বাংগালী জেগেছে।" হলের ছাত্ররা হলের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত ! কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই অজানা আশংকায় শঙ্কগ্রস্থ।

আমি তাদেরকে পরিস্হিতি বুঝিয়ে বললাম। আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করলো না। কেউ বললেন আমাদের উপর হামলা করার কোন কারণ নেই। এরপর প্রায় ২৫ জন ছাত্র হলের বাহিরে নিরাপদ স্হানে আশ্রয় নেবার জন্য তৎক্ষণাৎ হল ত্যাগ করলেন। জানিনা তারা এখন কোথায়? সত্যিই কি নিরাপদ হতে পেরেছিলেন, না হানাদারদের লোমহর্ষক হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছিলেন। আমাদের হলে পাক বাহিনী আক্রমণ করে রাত সাড়ে বারটায়। এর আগেই আমরা চারিদিকে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

সেদিন আমরা রাইফেলের গুলির শব্দ শুনিনি। শুনেছিলাম মেশিনগান, মর্টার শেলিং ও মাঝে মধ্যে ট্যাঙ্কের প্রচন্ড শব্দ। আমাদের হলে সৈন্য প্রবেশের আগে আমরা যারা হলে ছিলাম তাদের মধ্যে কেউ কেউ হলের ছাদে উঠলো, কেউ কেউ সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে, আবার কেউ কেউ নিজেদের রুমেই আত্মগোপন করার চেষ্টা করলো। আমি পিছনের দিকের ড্রেনের মধ্য দিয়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলাম।

হানাদার সৈন্যরা তখন হলে ঢুকে পড়েছে। আমি দেখলাম তারা প্রতিটি রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। আমার কানে গুলির শব্দ পৌঁছাচ্ছিল। আমি পিছনের দিক দিয়ে বেরুলাম। ধীরে ধীরে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের ড্রেনের দিকে এগিয়ে গেলাম। হানাদার সৈন্যরা হলে ঢুকে পড়েছে। আমি তখনো ম্যানহোলে ঢুকে পড়িনি। দেখলাম সৈন্যরা তন্ন তন্ন করে প্রতিটি রুম খুঁজছে।

হলে বাতি নেই। হল আক্রমণের আগেই বিদ্যুৎ যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল ওরা। তবুও দেখছিলাম ছাত্রদের ধরে ওরা বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ত, কখনো বেদম প্রহার করতো আবার কখনো ধরে নিয়ে আসত। এর মাঝেই কাছ থেকে গুলির শব্দ কানে আসলো। গুলির শব্দে আমার অন্তর আত্মা কেপেঁ উঠলো। এর পরে আমি ম্যানহোলে ঢুকি। তখন রাত প্রায় ১টা।

২৬শে মার্চ। সকালে ভোরের সূর্য উঠলো। আমি ম্যানহোলে। সারাদিন ম্যানহোলে থাকলাম। সারাদিন আমার কানে শুধু গোলাগুলি আর মানুষের আত্ম কান্না ভেসে আসছে বা এসেছে। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। আর পারা যায় না। ১৯ ঘন্টা পর আমি প্রাণ হাতে নিয়ে রাস্তায় গুনে গুনে পা বাড়াই। দেওয়াল টপকিয়ে নিকটবর্তী স্টাফ কোয়ার্টারে যাই। প্রফেসর সন্তোষ ভট্টাচার্যের বাসায় আশ্রয় নেই।

দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় পাকবাহিনীর হত্যাভিযান।	দৈনিক বাংলা	১৯ জানুয়ারি, ১৯৭১

পঁচিশে মার্চ ও তার পরদিন–

॥ মনজুর হাসান ॥

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৪৩৫-৪৩৯)

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম শহীদ মিনারের সামনে ৩৪ নম্বরের এক তলার ফ্লাট বাড়িতে। আমাদের এ বিল্ডিং এর পশ্চিম দিকের তিনতলায় পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব মনিরুজ্জামান সে রাত্রে বিছানায় যেয়েও ঘুমোতে পারেননি, একথা তাঁর স্ত্রীর কাছে শোনা। দিন কতক আগে এখানে রাস্তায় গাছ ফেলে যে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছিল সেনা বাহিনীর একদল প্রথমে তা কেটে সরিয়ে দিতে আসে।

সেই সব ডালপালা কাটার শব্দ হচ্ছিল। এর কিছু পরই পাক সৈন্যের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আক্রমন শুরু হয়। ছাত্রাবাস গুলোর দিক থেকে সৈন্যদের গোলাগুলীর আওয়াজে মনিরুজ্জামান সাহেব অস্থির হয়ে উঠেন এবং বদনায় পানি নিয়ে পর পর তিনবার ওজু করেন। এমন সময় জগন্নাথ হলের কাছে গর্জে ওঠে বর্বর পাক সৈন্যদের গোলার আওয়াজ।

চারপাশে গোলাগুলির শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং পর মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের পাশেই মনে হলো তোপধ্বনির আওয়াজ। আমি যে ঘরে ঘুমাতাম, তার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার, তার দক্ষিণে শহীদ মিনার। সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঘর আলোকিত হয়ে উঠে মুহূর্তের জন্যে। আমি বিছানা থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ি।

আমার ছেলেটিকে আমি আর আমার স্ত্রী মেঝেতে শুইয়ে চেপে ধরে রাখি। ছোট ছেলে ভয়ে একবার শক্ত হয়ে যাচ্ছিল আর শুয়ে থেকে শুধু কাঁদছিল। আমি মেঝেতে পড়ে থেকে কয়েক মুহূর্তে চিন্তা করতে চেষ্টা করছিলাম, কি হলো ? চারদিকে অনবরত গোলাগুলির শব্দ আর রাস্তা দিয়ে ভারী গাড়ী চলার শব্দ পাচ্ছিলাম। ঠিক এমন সময় জগন্নাথ হলের পূর্ব দিকে আমাদের ৩৪ নং বাড়ীর গেটের ভিতরে তিনটি মিলিটারী গাড়ী ঢোকে। তারপরই অনেক ভারী বুটের শব্দ এবং আমাদের দরজায় লাথি ও ধাক্কা শুরু হয়- 'দরজা খোল, দরজা খোল'।

ঠিক এর পরই সব ফ্ল্যাটের দরজায় লাথি মারা আরম্ভ হয়ে গেছে এবং সব বাড়ীর কলিং বেল গুলো ওরা বাজাচ্ছে। মা, বোনেরা, এবং ছোট ভাইটি অন্য ঘর থেকে ছুটে আমার ঘরে এলো। মা বললেন, 'বাবা' ওদিক দিয়ে দেখলাম, মিলিটারীরা বাড়ী ঘিরে ফেলেছে আর বিল্ডিং এর টেলিফোনের লাইনগুলো কেটে দিল। আমার ঘরে সবাইকে মেঝেতে শুয়ে যেতে বললাম। মাকে বললাম 'ওরা যদি দরজা ভেঙ্গে আসে তাহলে আসুক, দরজা খুলব না আমরা।'

বাড়ীতে আমার বয়সী এক আত্মীয় ছিলেন, উনি এই সময় বিল্ডিং এর ভিতরে বাঁচার আশা ত্যাগ করে বলতে লাগলেন, 'আমি জঙ্গলে ঝোপের মধ্যে যেয়ে লুকাবো' এবং ফ্ল্যাট ছেড়ে পিছন দিক দিয়ে বাইরে যেতে উদ্যত হলেন। আমি আর মা ওকে জাপটে ধরলাম। উনি বারান্দার নেট ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হলেন। মা আর আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'যদি আমরা মরে যাই সবাই এক সাথে মরে যাবো'।

এমন সময় দুটো সৈন্য আমাদের জানালার পাশ দিয়ে দৌঁড়ে এসে ফ্ল্যাটের পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে গেল। দরজাটি ছিল বাগানে যাবার জন্যে খুব কম মজবুত একটা প্লাইউড দিয়ে বানানো দরজা। আমরা বারান্দা থেকে মূহুর্তে ঘরে ঢুকলাম; কিন্তু আমার ঘরের দরজা লাগাবার সাহস হলো না যদি শব্দ হয়ে যায়। এর অল্প পরই সৈন্য দুটো চলে গেল পাশের পশ্চিম দিকে এক তলার ফ্ল্যাটের পিছনে, সম্ভবতঃ ওদিককার দরজা খুলে ফেলার আওয়াজ শুনে। আমি দরজা লাগিয়ে দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম।

মৃত্যু আসন্ন, মনে হলো, আমরা সকলে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম। ততক্ষণে আমাদের দরজায় লাথি মারা থেমেছিল কিন্তু আবার শুরু হলো 'খোল খোল' আর লাথি। ভারী বুটের দুড়দাম করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার শব্দের মাঝে জোরে শুনতে পেলাম মনিরুজ্জামান সাহেবের গলার আওয়াজ- লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। চার -পাঁচবার শুনতে পেলাম উনার কলেমা পড়ার শব্দ, তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন যেন।

বাইরে চারিদিকে গোলাগুলীর আওয়াজ- এর পরই আমাদের বাইরের দরজার উপর গুলি হলো, আর কয়েকটা বুকফাটা আর্তনাদ ভেসে এলো। ১২/১৪ রাউন্ড গুলির শব্দ শুনলাম। মনে হলো, মেরে ফেললো- মরে গেল মানুষ। রাত তখন দেড়টা। তারপর আমাদের বিল্ডিং এ সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মিনিট দশেক পরে শুনলাম ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার চীৎকার, 'বাসন্তী-দোলা।' তিনি স্ত্রী ও মেয়ের নাম ধরে ডেকে উঠেছিলেন। বিল্ডিং এর সামনে তাঁকে গুলী করা হয়েছিল।

উনি ঘাসের উপর পড়েছিলেন। ডঃ জ্যোতির্ময় ২৫শে মার্চের পরও কয়েকদিন জীবিত ছিলেন এবং ২৭শে মার্চের সকালে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে নেয়া হয়। মনিরুজ্জামান সাহেবের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙ্গে গিয়েছিল মিলিটারীর বুটের ধাক্কায়। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী, এবং তাঁর বোন, জ্যোতির্ময় বাবুর গলার আওয়াজ শুনে পানি নিয়ে নীচে নামছিলেন। তাঁরা তিনতলা থেকে আর্মিদের চলে যেতে দেখেছেন এবং তখনো বুঝতে পারেননি যে নীচে তাঁদের বাড়ীর লোকজনদের একতলার দরজার উপর হত্যা করা হয়েছে।

মনে করেছিলেন এরেষ্ট করে নিয়ে চলে গেল। নীচে নামতেই দেখতে পেলেন এক ভয়াবহ দৃশ্য। মনিরুজ্জামান সাহেবের ষোল বছরের ছেলের তখন অন্তিম মুহূর্ত। সে কষ্টে বলেছিল 'মা পানি দাও'। মুখে পানি দেবার পর সে এক মুখ হাসি নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ছেলের পাশে পড়ে ছিলেন মনিরুজ্জামান সাহেব, তাঁর প্রায় ৩০ বছর বয়স্ক ছোট ভাই এবং ১৪ বছরের ভাগনেটি। এই চারজন শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে হেঁটে যেয়ে মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী জ্যোতির্ময় বাবুর মুখে পানি দেন।

পূর্ব দিকের দোতলায় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব দেখতে পান আর্মি চলে গেছে এবং জ্যোতির্ময় বাবুর গলার আওয়াজ শোনা গেল বিল্ডিং এর সামনে ঘাসের ওপর থেকে। তখন রাজ্জাক সাহেবের বাসা থেকে একজন লোক নীচে নামতে যেয়ে একতলার দরজায় এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ঘরে ঢুকে পড়ে। এর পর রাজ্জাক সাহেব তাঁকে নিয়ে নীচে নেমে আসেন। এ সময় জ্যোতির্ময় বাবুর স্ত্রী, সারভেন্ট কোয়ার্টার থেকে তাঁর ড্রাইভারকেও ডেকে এনেছিলেন।

তাঁরা কয়েকজন ধরাধরি করে পশ্চিম দিকের একতলায় জ্যোতির্ময় বাবুকে তাঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। ঠিক এই সময় আবার বিল্ডিং এর গেটের কাছে আর্মি এসে পড়ে। এর আগেই রাজ্জাক সাহেব দোতলায় তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন এবং

সকলেই দরজা বন্ধ করে ফেলেন । বাড়ীর বাগানে বেরুবার পেছন দিকের দরজা দিয়ে সৈন্যরা জ্যোতির্ময় বাবুর ফ্লাটে ঢোকে এবং তাঁকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় । একথা তাঁর কাছ থেকে শোনা। ২৭শে মার্চ জ্যোতির্ময় বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে মেডিক্যালে দেখা হয় এবং তাঁকে সাথে করে ডঃজ্যোতির্ময় বাবুর বেডের পাশে যেয়ে দাঁড়াই।

দেখেছিলাম তাঁর ঘাড়ের কাছে গুলি লেগে এদিক থেকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে এবং ডান হাত ও ডান পা অবশ হয়ে গেছে। জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল এবং খুব ভালো ভাবে তখন আমার সাথে কথা বলছিলেন। মনের জোড় তখনো অটুট ছিল । বলেছিলেন, "রাইট সাইডটা পেরালাইজ্‌ড কিন্তু বেশ বহাল তবিয়তেই আছি"। উনি বলেছিলেন যে নাম জিজ্ঞাসা করার পরই তাঁকে গুলী করা হয়। এরপর আরম্ভ হলো আমাদের বিল্ডিং এর উত্তর দিকে প্রায় বিশ গজ দূরে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোষ্টের বাড়ীর দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা ।

'খোল খোল, দরজা খোল'- আর দরজায় লাথি, ধাক্কা। কিছুক্ষণ চললো, তারপর থেমে গেল। তারা বাকী রাত্রিটুকুর মধ্যে ওখানে পুরনো দিনের মজবুত দরজা খোলার আরো দুবার চেষ্টা চালায়। চারিদিকে অনবরত গুলীর শব্দ। ভোর হলো। থেকে থেকে আশ পাশে গুলীর শব্দ হচ্ছে। সকাল ৯'টার দিকে শহীদ মিনারের কাছে একটা ক্ষীণ মাইক দিয়ে এক অবাঙ্গালী বাঙ্‌লাতে বললো, 'আপনারা বাড়ীর বাইরে বেরুবেননা, আপনাদের ঘেরাও করা হয়েছে।'মেঝেতে শুয়ে নিজে নিজে মনে করলাম হয়ত কারফিউ এর বাঙ্‌লা তরজমা করতে যেয়ে 'ঘেরাও' বললো। মনকে প্রবোধ দিলাম, কারফিউ-এর কথাই হয়ত বলছে। এর ঘন্টাখানেকের পর এত ঘন্টার পরিচিত গোলাগুলির আওয়াজের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে শহীদ মিনারের কাছে একটা জোর শব্দ হলো। মনে হলো হাত বোমা।

অল্পক্ষণের মধ্যে ঘরে বারুদের গন্ধ ভেসে আসলো, দরজার নীচে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে পোড়া কাপড়ের মত ছাই উড়ে এসে পড়তে লাগলো। এ হাত বোমার রহস্য উদঘাটন হয়েছিল পালিয়ে যে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেই ধলেশ্বরী নদীর ওপারে এক লোকের কাছ থেকে। সে আমাকে গ্রামে দেখতে পেয়ে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। কারণ সেও অনেকের মত শুনেছিল, প্রফেসর আব্দুল হাইয়ের ফ্যামিলির সকলেই ঐ বিল্ডিং-এ ২৫শে মার্চের রাত্রে মারা গেছে।' এই লোকটি হলো হাসেম । আমাদের ৩৪ নম্বর বিল্ডিং-এর পূর্ব দিকের তিন তলার ফ্লাটে জার্মান প্রফেসর ওয়াল্টার শোয়েপ্পির সে বাবুর্চি ছিল। তার জীবনের চরম মূহুর্তে সেই ২৫শে মার্চের রাতেই কেটে গেছে। তাঁকে দাঁড় করানো হয়েছিল অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, তার ছেলে, ভাই, ভাগনের সঙ্গে গুলী করে হত্যা করার জন্য। আর্মি অফিসার গুলী করার হুকুম দিতেই গুলির পূর্বক্ষণে সে চিৎকার দিয়ে পরে যায়-- ----------তার পরেই কতকগুলো গুলী হয়ে গেছে- তার শরীরের উপর লুটিয়ে পড়েছে অন্যেরা।

গুলী শেষ করে বর্বর পশুরা মৃত দেহের উপর লাথি মেরেছিল এবং হাসেমের কোমড়ে বুটের প্রচন্ড বাড়ি মারে। তারপর তারা সেখান থেকে সরে যেতেই হাশেম উঠে দাঁড়ায় এবং ছুটে তিনতলায় যেয়ে দরজা বন্ধ করে। তার সমস্ত জামায় রক্ত লেগে গেছে- সে বুঝতে পারছিল না তার কোথায় গুলী লেগেছে। জামা খুলে হাশেম তার শরীরটা পরীক্ষা করে দেখে যে গুলী লাগে নি। আমি হাশেমকে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল যে সে ঘুম কাতুরে এবং যখন দরজায় কলিং বেল বাজায়, মাত্র তখন তার ঘুম ভাঙ্গে এবং আমরা কেউ বেল বাজাচ্ছি মনে করে সে ঘুমের ঘোরে দরজা খোলে।

খুলতেই সেনা বাহিনীর লোক সাক্ষাৎ জমদূতের মত মধ্য বয়সী গোলগাল হাশেমের জামার কলার চেপে ধরে বলে- 'তোম প্রফেসর হো?' হাশেম বলে উঠে, 'জার্মান সাবকা নওকর হুঁ'। নিমেষে তাদের কয়েকজন ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে। যে তার কলার ধরেছিলো সে পকেটে হাত দিয়ে বলে, 'জয় বাংলাকা ফোটো হ্যায়?' তার পকেটে কয়েকটা বেতনের একশ' টাকার নোট ছিল। জার্মান প্রফেসর হাশেমকে তার আগামী তিন মাসের বেতন দিয়ে ব্যাঙ্কক চলে গিয়েছিল।

নোট গুলো হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেঝেতে। বলে 'শালা তোম রুপিয়ে লেকে কেয়া করোগে, আভি তোমকে গুলী করেঙ্গে'। বলেই হিড় হিড় করে ওকে নীচে নামিয়ে আনে এবং দুজন ওকে ধরে রাখে। এর পরই সে দেখতে পায় মনিরুজ্জামান সাহেব এবং তাঁর বাসার অন্যান্যদের ধরে নিয়ে আসতে। শ্মশ্রুধারী মনিরুজ্জামান সাহেব উচ্চস্বরে কলমা পড়ছিলেন-এমন সময় উনাকে চপেটাঘাত করে এক পাঞ্জাবী সৈন্য। এর পর মুহূর্তে গুলী করা হয় ! সেই হাশেম যখন মৃত্যুর হাত থেকে ছুটে এসে দম ফেলেছিল তখন আবার শুনতে পায় বিল্ডিং-এ মিলিটারী আসার শব্দ। এর কিছু পরে কে যেন তার ফ্ল্যাটের দরজায় কাতরাতে থাকে। ও মনে করেছিল হয়ত এ বিল্ডিং-এর কেউ আহত অবস্থায় দরজার কাছে এসেছে। সিঁড়িতে আলো জ্বলছিল। হাশেম কাঠের দরজার ছিদ্রপথে দেখে, এক সৈন্য অস্ত্র হাতে দরজার পাশে বসে অভিনয় করছে। হাশেম ছুটে বারান্দার প্রান্তে যায় এবং মশামাছি না ঢোকার পাতলা নেট কিছুটা ছিঁড়ে ফেলে তৈরী হয়ে যায় তিনতলা থেকে লাফ দেবার জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাক সেনারা ওই ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করেনি। এ হাশেমের কাছ থেকেই তখনি শোনা, শহীদ মিনারের অভাবিত দৃশ্যের কথা।

বেলা তখন দশটার মত। হাশেম বলে চললো, আমি লুকিয়ে তিনতলা থেকে শহীদ মিনারের দিকে তাকিয়ে দেখছি-চারজন পাঞ্জাবী সৈন্য শহীদ মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের বিল্ডিং এর দিকে মুখ করে আছে---এমন সময় কি হয়ে গেল সেখানে--বোমা ফেটে গেল, হাত বোমা। ধোয়া, আর শহীদ মিনারের পেছন দিকে দুটো লোক ছুটে পালিয়ে গেল। দেখা গেল সেমুহূর্তে দুজন সৈন্য শহীদ মিনার থেকে মেডিক্যাল কলেজের মোড়ের ট্রাফিক লাইটের দিকে দৌড়ে পালালো। কয়েক মিনিট পরেই এলো একটা গাড়ী। শহীদ মিনারের ওপর পড়েছিল দুটো

মিলিটারীর লাশ। সে গাড়ীটি মরা সৈন্য দুটোর অস্ত্রগুলো নিয়ে চলে গেল। কয়েক মিনিট পর আর একটি গাড়ী এলো এবং লাশ দুটোকে নিয়ে চলে গেল। সে দিন ছিল ২৬শে মার্চ, শুক্রবার। শহীদ অধ্যাপক মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছি-

যে, ২৬শে মার্চে শুক্রবার তাঁর ফ্ল্যাটে বার পাঁচেক পাক সেনারা ঢোকে এবং বলতে থাকে 'আওর এক আদমী হ্যায় ও কিধার হ্যায় ?' উনারা জানান যে বড় পুরুষ মানুষ আর কেউ জীবিত নেই। তখন তাঁরা সমস্ত ঘর তন্ন-তন্ন করে খোঁজে এবং জিনিষ পত্র তছনছ করে ফেলে। হয়ত এই অপর এক আদমী ছিল হাশেম। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী ও হাশেম এই বিল্ডিং এর তিনতলা থেকে জগন্নাথ হলের মাঠে বুলডজার দিয়ে গর্ত করে বহু মৃতদেহ সে গর্তে ফেলে দিতে দেখেছিলেন।

রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গেও গ্রামে একদিন দেখা হয়, উনিও বুলডজার দিয়ে গর্ত করে লাশ পুঁতে ফেলার কথা বলেন। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী ধরা গলায় বলেছিলেন, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিকেল বেলা আর্মি গেঞ্জী পরা ১২/১৪ বছরের চারটে ছেলে নিয়ে এসে মনিরুজ্জামান সাহেবের লাশ টানিয়ে নিয়ে গেল গর্তের ওখানে। তখন বোধহয় আর লাশ মাঠে ছিলনা। ছেলে চারটিকে গর্তের পাশে লাইন করে ওরা গুলী করেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ওপর দুটি প্রতিবেদন ।	দৈনিক বাংলা	২১ জানুয়ারি ও ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে ধীরেন দত্ত ও লেঃ কর্ণেল জাহাঙ্গীর সহ শত শত বাঙালীকে গুলি করে হত্যা করা হয়

॥ সাখাওয়াত আলী খান প্রদত্ত ॥

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৪৫৬-৪৫৮)

২৫শে মার্চের কালোরাতে জল্লাদ ইয়াহিয়া দখলদার বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের উপর ঝাপিয়ে পড়ার পর কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে কি ঘটেছিল ? উল্লেখযোগ্য যে হানাদার বাহিনী যে সমস্ত ক্যান্টনমেন্টে সবচেয়ে বেশী হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, ময়নামতি তার মধ্যে অন্যতম। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে যে সমস্ত বাঙালী সামরিক অফিসার ও জোওয়ান আটকা পড়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় কেউই বেরিয়ে আসতে পারেননি।

বাঙালী সামরিক অফিসারদের পত্নীরা কেউ কেউ বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন, কিন্তু তারাও বন্দী অবস্থায় থাকায় প্রকৃত ঘটনার কথা বেশী জানতে পারেননি। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই ময়নামতি ঘটনা সম্পর্কে জনগণকে জনশ্রুতি উপর নির্ভর করতে হয়েছে। ময়নামতির মত কাব্যিক নামের একটি

স্হানে নর পিশাচরা যে নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছিল, তার প্রত্যক্ষদর্শী ১ জনার কাছ থেকে আমরা সেখানকার ঘটনার বিবরণ পেয়েছি। এ দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন, সাবেক পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান এবং অপর জন হচ্ছেন ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের বেসামরিক কর্মচারী শ্রী রমনী মোহন শীল। শ্রী রমনীমোহন শীল ক্যান্টনমেন্টে ক্ষৌর কর্ম করতেন । প্রথমোক্ত লেফটেন্যান্ট ইমাম বেঁচেছেন সম্পূর্ণ অলৌকিক ভাবে। তিনি জানিয়েছেন যে, তার বেঁচে থাকার এবং মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণের কথা তার বাবা যেন এখনো বিশ্বাস করতে চান না।

মোঃ সাহেব আলী
সুইপার ইন্সপেক্টর,
ঢাকা পৌরসভা, ঢাকা।

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড, পৃ ঃ ৩৫-৩৮)

আমি ১৯৬১ সন থেকে ঢাকা পৌরসভার অধীনে সুইপার ইন্সপেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি। ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ আমি আমার সুইহারের দল নিয়ে দায়িত্ব পালন করে সন্ধ্যায় ৪৫/১, প্রসনু পোদ্দার লেনস্হিত আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়ীতে অবস্হান করছিলাম। রাত নয়টার দিকে আমি ঢাকা ইংলিশ রোডের দিকে বের হয়ে দেখলাম রাস্তাঘাট চারিদিকে থমথমে, সকল প্রকার যানবাহন দ্রুত গন্ত ব্যস্হলের দিকে যেতে দেখলাম। ছাত্র জনতাকে রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড তৈরী করতে দেখলাম। প্রতিরোধ তৈরীতে ব্যস্ত ছাত্র জনতার নিকট জানতে পারলাম ঢাকা সেনানিবাস থেকে পাক সেনারা রাজধানী ঢাকার দিকে সামরিক ট্রাক নিয়ে এগিয়ে আসছে। পাক পশুদের প্রতিরোধ করার জন্য ছাত্র জনতার এ প্রচেষ্টা ও প্রয়াস। আমি সবকিছু দেখে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বাসায় চলে গেলাম। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, পুলিশ অফিস ও মালিবাগ, গোয়েন্দা অফিসের দিকে আকাশ ফাটা গোলাগুলির ভীষণ গর্জ্জন শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলাম রাজধানীর উত্তরে বস্তি এলাকা জ্বলছে। রাজারবাগ থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনার সময় ঢাকা শাখারীবাজার প্রবেশ পথে বাবুবাজার ফাঁড়ীতে ভীষণ শেলিং এর গর্জ্জন শুনলাম। আমি নিকটবর্তী নয়াবাজার সুইপার কলোনীর দোতলায় দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে গোলাগুলির ভীষণ গর্জ্জন শুনলাম।

২৬শে মার্চ অতি প্রত্যুষে আমি সুইপার কলোনীর দোতলা থেকে দৌড়ে নেমে বাবুবাজার ফাঁড়িতে গিয়ে দেখলাম ফাঁড়ির প্রবেশ পথ, ভিতরে, চেয়ারে বসে, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দশজন পুলিশের ইউনিফরম পরা গুলির আঘাতে

ঝাঁজড়া ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। আমি ফাঁড়ির ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম ফাড়ির চারিদিকে দেওয়াল হাজারো গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া হয়ে আছে। দেওয়ালের চারিদিকে মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত, তাজা রক্ত জমাট হয়ে আছে, দেখলাম কেউ জিভ বের করে পড়ে আছে, কেউ হাত পা টানা দিয়ে আছে, প্রতিটি লাশের পবিত্র দেহে অসংখ্য গুলির আঘাত। মানবতার অবমাননা ও লাঞ্চনার বীভৎস দৃশ্য দেখে আমি একটি ঠেলাগাড়ীতে করে সকল লাশ ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে লাশ ঘরে রেখে আবার ঠেলাগাড়ী নিয়ে শাঁখারী বাজারে প্রবেশ করে একেবারে পূর্বদিকে ঢাকা জজকোর্টের কোণে হোটেলের সংলগ্ন রাস্তায় দশটি ফকির মিসকিন ও রিকসার মেরামতকারী মিস্ত্রির উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ লাশ উঠালাম। কোন হিন্দুর লাশ আমি রাস্তায় পাই নাই। সবকয়টি লাশ মুসলমানে ছিল। রাস্তায় পড়ে থাকা গুলিতে ঝাঁজড়া দশটি লাশ ঠেলাগাড়ীতে তুলে আমি মিডফোর্ড নিয়ে গিয়েছি। মুসলমানের লাশ এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না। তাই আমরা স্হানীয় ছাত্র জনতা সবাই মিলে লাশ গুলি তুলে মিটফোর্ডে জমা করেছি। রাজধানী ঢাকার সর্বত্র কার্ফু থাকা সত্বেও গণহত্যার সেই বীভৎস দৃশ্য দেখার জন্য ছাত্র জনতা রাস্তায় রাস্তায় বের হয়ে পড়লে পাকসেনারা ঘোষণা করে ঢাকায় কার্ফু বলবৎ রয়েছে কেউ রাস্তায় বের হলে গুলি করা হবে। পাকসেনাদের এ ঘোষণার পর আমরা সরে পড়লাম। দিনের শেষে বেলা পাঁচটার সময় তাঁতিবাজার, শাঁখারী বাজার এবং কোর্ট হাউস ষ্ট্রিট এলাকায় পাক সেনারা আগুন ধরিয়ে দেয়। সাথে সাথে চলতে থাকে বৃষ্টির মত অবিরাম গুলি বর্ষণ। সারারাত পাক সেনারা তাঁতিবাজার, শাঁখারীবাজার ও গোয়াল নগর এলাকায় অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে থাকে। ১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ বেলা একটায় সময় পাক সেনারা নওয়াবপুর থেকে ইংলিশ রোডের বাণিজ্য এলাকার রাস্তার দুদিকের সকল দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেলা তিনটা পর্যন্ত ইংলিশ রোডের রাস্তার দুদিকে আগুন জ্বলতে থাকে। আগুনের সেই লেলিহান শিখায় পার্শ্ববর্তী এলাকার জনতা আশ্রয়ের জন্য পালাতে থাকে। পালাতে গিয়ে পাকসেনাদের গুলির আঘাতে অনেকে প্রাণ হারায়। বেলা তিনটায় পাক সেনারা তাঁতিবাজারের বাহির পথ ও মালিবাগের পুলের পশ্চিম পার্শ্বে হিন্দু মন্দিরের উপর শেলিং করে মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়। ইংলিশ রোডের আগুন বাসাবো এলাকা অতিক্রম করে সুইপার কলোনীর দিকে ধেয়ে আসতে থাকলে আমি সুইপারদের কলোনীর পানি রিজার্ভ করে রাখার নির্দেশ দেই। পাক সেনাদের ডিঙ্গিয়ে সকল সুইপার মিলে সুইপার কলোনীটি রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হলে আমরা পাক সেনাদের গুলির মুখে চলে আসি।১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ সকালে রেডিও মারফত সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে এ নির্দেশ পেয়ে পরদিন আমি সকাল দশটার সময় ঢাকা পৌর সভায় ডিউটি রিপোর্ট করলে ঢাকা পৌর সভার তৎকালীন কনসারভেন্সি অফিসার মিঃ ইদ্রিস আমাকে ডোম নিয়ে অবিলম্বে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা লাশ তুলে ফেলতে বলেন। ইদ্রিস

সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলতে থাকেন, ‘‘সাহেব আলি বের হয়ে পড়, যদি বাঁচতে চাও তবে ঢাকার রাজপথ ও বিভিন্ন এলাকা থেকে লাশ তোলার জন্য বের হয়ে পড়। কেউ বাঁচবে না কাউকে রাখা হবে না, সবাইকে পাক সেনাদের গুলি বর্ষণে মরতে হবে, সবাইকে কুকুরের মত হত্যা করা হবে’’। পৌর সভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলী খান শূর আমাদের সাথে কুকুরের মত উত্তেজিত হয়ে, অত্যন্ত কর্কশস্বরে ক্রুদ্ধ ভাবে বকাবকি করতে থাকেন। সেখানে আমি, সুইপার ইন্সপেক্টর আলাউদ্দিন, সুইপার ইন্সপেক্টর কালিচরণ, সুইপার সুপারভাইজার পাঞ্চাম, সুইপার ইন্সপেক্টর আওলাদ হোসেন আমরা পাঁচজন উপস্থিত ছিলাম। আমাকে পরদেশী ডোম, মন্টু ডোম,লেমু ডোম,ডোম গোলাপ চান, দুখিলা ও মধুডোমকে নিয়ে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে লাশ তুলে স্বামিবাগ আউটকলে ফেলতে বলা হয়। ১৯৭১ সনের ২৯শে মার্চ আমার দল ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশ ঘর থেকে দুট্রাক লাশ তুলেছে। আমার দল যে সকল লাশ তুলেছে আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি। অধিকাংশই ছিল সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ,আনসার ও পাওয়ারম্যানদের খাকী পোশাক পরা বিকৃত লাশ । লাশ তুলতে তুলতে পরদেশী নামে আমার জনৈক ডোমের হাতে এক ষোড়শী রুপসীর উলঙ্গ ক্ষত বিক্ষত লাশ দেখলাম, দেখলাম সেই যুবতীর পবিত্র দেহে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন, তার বুক থেকে স্তন সজোরে তুলে নেওয়া হয়েছে, লজ্জাস্থান ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে, পিছনের মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে। হরিণের মত মায়াভরা মধুময় বড় বড় চোখ ঘুমিয়ে আছে, সারাদেহে সৃষ্টিকর্তা যেন দুধের সর দিয়ে আবৃত করে দিয়েছে, মাথায় কালো কালো চুল তার কোমর পর্যন্ত লম্বা হয়ে পড়েছিল, তার দুই গালে আঘাতের চিহ্ন দেখলাম। পরক্ষণেই দেখলাম দশ বছরের এক কিশোরীর উলঙ্গ ক্ষত বিক্ষত লাশ। অপরুপা রুপসী ফলের মত টকটকে চেহারা, সারা দেহে বুলেটের আঘাত। ১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল থেকে ভারপ্রাপ্ত পাক সেনাদের মেজর পৌর সভায় টেলিফোনে সংবাদ দেন রোকেয়া হলের চারিদিকে মানুষের লাশের পচা গন্ধে সেখানে বসা যাচ্ছে না, অবিলম্বে ডোম পাঠিয়ে লাশ তুলে ফেলা হোক। আমি ছয়জন ডোম নিয়ে রোকেয়া হলে প্রবেশ করে রোকেয়া হলের সমস্ত কক্ষে তন্ন তন্ন করে খুজে কোন লাশ না পেয়ে চারতলা ছাদের উপর গিয়ে আঠার বছরের জনৈক রুপসী ছাত্রীর উলঙ্গ লাশ দেখতে পেলাম। আমার সাথে দায়িত্বরত জনৈক পাক সেনাকে জিজ্ঞাসা করলাম এ ছাত্রীর দেহে গুলির কোন আঘাত নাই, দেহের কোন স্হানে কোন ক্ষত চিহ্ন নাই অথচ মরে চিত হয়ে পড়ে আছে কেন? সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো আমরা সকল পাকসেনা মিলে ওকে ধর্ষণ করতে করতে মেরেছি। পচা-ফুলা সেই রুপসীর উলঙ্গ দেহ পড়ে আছে দেখলাম। ডাগর ডাগর চোখ ফুলে বের হয়ে আছে, মাথার চুল নিকটেই ছিড়ে ফেলা হয়েছে, লজ্জাস্হান তার পেট থেকে ফুলে অনেক উপরে উঠে আছে, যোনিপথ রক্তাক্ত। তার দুদিকের গালে পশুদের কামড়ের চিহ্ন দেখলাম, বক্ষের স্তনে

মানুষের দাঁতের দংশনের চিহ্ন দেখলাম। আমি একটি চাদর দিয়ে লাশটি ঢেকে দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসি। রোকেয়া হলের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের ভিতরে প্রবেশ করে পাঁচজন মালীদের স্ত্রী পরিজনদের পাঁচটি লাশ এবং আটটা পুরুষের লাশ (মালী) পেয়েছি। লাশ দেখে মনে হলো মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সবাই শুয়ে ছিল। আমি ট্রাক নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিববাড়ীর তেতলা থেকে জনৈক হিন্দু অধ্যাপক, তার স্ত্রী ও দুই ছেলের লাশ তুলেছি। স্হানীয় জনতার মুখে জানতে পারলাম তার দুই মেয়ে বুলেট বিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে আছেন। সংগৃহীত লাশ স্বামীবাগ আউটকলে ফেলে দিয়ে আমরা ট্রাক নিয়ে ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসমান হাত-পা, চোখ বাঁধা অসংখ্য যুবকের লাশ তুলেছি। আমরা ৩০শে মার্চ ঢাকা বুড়ীগঙ্গা নদী থেকে তিন-ট্রাক লাশতুলে স্বামীবাগ ফেলেছি। পাক সেনারা কুলি দিয়ে পূর্বেই সেখানে বিরাট বিরাট গর্ত করে রেখেছিল। পরের দিন আমরা মোহাম্মদপুর এলাকার জয়েন্ট কলোনীর নিকট থেকে সাতটি পচা-ফুলা লাশ তুলেছি। ইকবাল হলে আমরা কোন লাশ পাই নাই। পাকসেনারা পূর্বেই ইকবাল হলের লাশ পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দেয়। বস্তি এলাকা থেকে জগন্নাথ হলে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসা দশজন নর-নারীর ক্ষত-বিক্ষত লাশ তুলেছি। ফেরার পথে আমরা ঢাকা হলের ভিতর থেকে চারজন ছাত্রের উলঙ্গ লাশ তুলেছি। ১৯৭১ সনের ১লা এপ্রিল আমরা কচুক্ষেত, ড্রাম ফ্যাক্টরী, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, দ্বিতীয় রাজধানী এলাকাস্হ ঢাকা বিমান বন্দরের অভ্যন্তর, ঢাকা ষ্টেডিয়ামের মসজিদের পূর্ব দক্ষিণ দিক থেকে কয়েকজন ছাত্রের পচা লাশ তুলেছি। এরপর থেকে প্রতিদিন আমরা বুড়িগঙ্গা নদীর পাড় থেকে হাত-পা, চোখ বাঁধা অসংখ্য যুবকের লাশ তুলেছি। রায়ের বাজার ইটখোলায় আমরা কয়েক হাজার বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছি। মিরপুর এক নম্বর সেকশনের রাস্তা পার্শ্বে ছড়ানো, ছিটানো, বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছি। মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজের হল থেকে দশজন ছাত্রের ক্ষত-বিক্ষত লাশ তুলেছি। রায়ের বাজার রাস্তা, পিলখানা, গনকটুলি, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান, এয়ারপোর্ট রোডের পার্শ্ববর্তী এলাকা, তেজগাও মাদ্রাসা থেকে অসংখ্য মানুষের পচা-ফুলা লাশ তুলেছি। অনেক লাশের হাত-পা পেয়েছি মাথা পাই নাই। মেয়েদের লাশ সবই উলঙ্গ ও ক্ষত বিক্ষত দেখেছি। কিছুদিন পর আমি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত কারখানায় গিয়ে সাধনা ঔষধালয়ের মালিক প্রফেসর যোগেশচন্দ্র বাবুর বেয়নেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত তাজা লাশ তুলে স্বামীবাগ ফেলেছি। পাক পশুরা যোগেশ বাবুর সর্বস্ব লুন্ঠন করে তাকে তার নিজস্ব কামড়ায় বক্ষে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করে রেখে যায়। পরে তার পবিত্র ক্ষত-বিক্ষত লাশ নীচে নামিয়ে এনে খাটের উপর রেখে দিয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম প্রফেসর যোগেশ বাবুর লাশ জীভ বের করে হা' করে আছে। গায়ে ছিল ধুতি আর গেঞ্জি।

স্বাক্ষর/-

মোঃ সাহেব আলী

১৯/৫/৭৪

মোহাম্মদ সালেহুজ্জামান
সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
রমনা থানা, ঢাকা।
(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড, পৃ ঃ ৩৯-৪০)

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি এক প্লাটুন ফোর্স সহ মীরপুর এক নম্বর সেকশনে টহলে ছিলাম। সন্ধ্যার পর পরই আমি মীরপুরের সর্বত্র থমথমে ভাব লক্ষ করছি। রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার সময় আমার ওয়ারলেস সেটটি আকস্মাৎ সক্রিয় হয়ে উঠে। ওয়ারলেস সেটে এক বাঙ্গালী পুলিশ কণ্ঠ অজানা স্টেশন থেকে বলছিল, "ঢাকা সেনানিবাস থেকে ট্যাঙ্ক ও কামানবাহী সশস্ত্র পাক সেনাদের ট্রাক সারিবদ্ধ ভাবে রাজধানীতে সদর্পে প্রবেশ করছে, বাঙ্গালী পুলিশ তোমরা সাবধান হও।" ইহার পর আমার ওয়ারলেস সেটের মারফত ঢাকা পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে মেসেজ দেওয়া হয়, "পুলিশ ডিউটি উইথড্রন"। ওয়ারলেস মারফত এসব মেসেজ আসার পর পরই আমি ঢাকা রাজধানীর আকাশে সর্বত্র আগুনের ফুলকি উঠতে দেখলাম। অকস্মাৎ রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ইকবাল হল, ই, পি, আর হেডকেয়ার্টারে ভীষণ কামান ও ট্যাঙ্ক হামলার আকাশ ফাটা শব্দ শুনতে পাই। এ পরিস্হিতিতে আমি আমার টহলরত পুলিশ ফোর্সকে মীরপুরের পশ্চিম দিকে গ্রামের দিকে চলে গিয়ে প্রাণ পণ প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়ে আমি আমার রাইফেল ও গুলি নিয়ে থানার বাসায় চলে যাই । থানায় ফিরে এসে আমি তৎকালীন মীরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ আবুল হাসেম এবং অন্যান্য সাব ইন্সপেক্টর, এ, এস, আই ও বাঙ্গালী পুলিশদের অত্যন্ত বিমর্ষ ও বিমূঢ় দেখতে পাই। থানায় বসে আমরা ওয়ারলেসে বাঙ্গালী কণ্ঠের বহু বীভৎস আর্তনাদ শুনতে পাই। রাত সাড়ে চারটার দিকে পাক পশুরা পুলিশ কন্ট্রোল রুম দখল করে সেখানকার ওয়ারলেসে বাইরে টহল নিযুক্ত বাঙ্গালী পুলিশদের কর্কশ কণ্ঠে বলছিল "বাঙ্গালী শালালোগ, আভী আ-কার দেখো, তোমারা কেতনা মা বাহেন হামারা পাস হায়, ---------------।" একথা শুনে আমাদের বাঙ্গালী পুলিশদের গা' শিউরে উঠে। আমি তৎক্ষণাৎ ওয়ারলেস সেট বন্ধ করে দেই। সকাল হওয়ার পূর্বেই আমি থানা ও থানার বাসা ছেড়ে দিয়ে মীরপুরে অন্য এক বাসায় আত্মগোপন করে থাকি। সকালে আমি দেখলাম বাঙ্গালী ই, পি, আরদের মীরপুর ই, পি, আর ক্যাম্প থেকে বন্দী করে আমাদের থানার সম্মুখে এনে পাক পশুরা নিরস্ত্র করে থানায় বন্দী করেছে। আমি আরও দেখলাম মীরপুরের সকল বাঙ্গালী বাড়ীতে বিহারীরা কপালে সাদা কাপড় বেধেঁ দানবের মত উল্লাসে ফেটে পড়ে আগুন লাগাচ্ছে, লুট পাট করছে। বাড়ী বাড়ী থেকে বাঙ্গালী শিশু যুবতি বৃদ্ধাদের টেনে এনে রাস্তায় ফেলে ছোড়া দিয়ে জবাই করছে, বাঙ্গালী রমণীদের ধরে এনে রাস্তায় উলঙ্গ করে ফেলে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে তৎক্ষণাৎ ধরালো ছোড়া দিয়ে স্তন ও পাছার মাংস ছলাৎ করে কেটে ফেলে নৃসংসভাবে হত্যা করছে।

কাউকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলছে, কারও যোনিতে লোহার রড ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কারও গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। ভীত সন্ত্রস্থ হাজারো মানুষ তখন প্রাণ ভয়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। যে সকল নিরীহ মানুষ পালাতে পারছিলনা তাদেরকে বিহারীরা নির্মমভাবে জবাই করছিল। পাক সেনারা এ ব্যাপক বাঙ্গালী হত্যায় বিহারীদের পিছনে থেকে সাহায্য করছিল। ২৭শে মার্চ সকালে কিছুক্ষনের জন্য কার্ফু তুলে নিলে আমি আমার পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মীরপুরের বাইরে যাত্রা করি। মীরপুর গরুর হাট অতিক্রম করার সময় আমি দেখলাম পাক সেনাদের টহল ভেদ করে একটি ট্রাকে মহিলা ও শিশু মীরপুর ব্রীজের দিকে যাচ্ছিল- পাক সেনারা ঐ ট্রাকে আগুন ধরিয়েদেয়। আর দু'টি যুবতী মেয়েকে তাদের জীপে উঠিয়ে নিয়ে যায়। মেয়ে দু'টি পাক পশুদের হাতে পড়ে প্রাণফাটা চিৎকারে আর্তনাদ করছিল। আমরা দূর থেকে গরুর হাট বরাবর বোরো ধানের ক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বহু দুর্দশা ও লাঞ্চনা ভোগ করে আমি আট দিন পায়ে হেঁটে ও নৌকা যোগে দেশের বাড়ীতে পোঁছি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সালেহুজ্জামান
৭-২-৭৪

পরদেশী
পিতা-ছোটন ডোম
সুইপার, সরকারী পশু হাসপাতাল,
ঢাকা।
(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড, পৃ ঃ ৫০-৫২)

১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ সকালে রাজধানী ঢাকায় পাকসেনাদের বীভৎস হত্যাকান্ডের পর ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলি খান শূরের প্রশাসনিক অফিসার মিঃ ইদ্রিস পৌরসভার আরও কয়েকজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে একটি মিউনিসিপ্যাল ট্রাকে পশু হাসপাতালের গেটে এসে বাঘের মত "পরদেশী পরদেশী" বলে গর্জ্জন করতে থাকলে আমি ভীতসন্ত্রস্ত ভাবে আমার কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসি। ইদ্রিস সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কর্কশ স্বরে বলতে থাকেন, "তোমরা সব সুইপার ডোম বের হও, যদি বাঁচতে চাও অবিলম্বে সবাই মিলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় স্তুপকৃত লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলে দাও। নইলে কাউকে বাঁচানো হবে না, কেউ বাঁচতে পাবে না।"পৌরসভার সেই ট্রাকে নিম্নবর্ণিত সুইপাররা বসা ছিল ঃ ১। ভারত ২। লাডু ৩। কিষন।

আমি তার নির্দেশ অমান্য করার কোন উপায় না দেখে ট্রাকে উঠে বসলাম।সেই ট্রাকে করে ঢাকা পৌরসভা অফিসে আমাদের প্রায় আঠারজন সুইপার ও ডোমকে একত্রিত করে প্রতি ছয়জনের সাথে দুইজন করে সুইপার ইনসপেক্টর আমাদের সুপারভাইজার নিয়োজিত করে তিন ট্রাকে তিনদলকে

বাংলাবাজার, মিটফোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রেরণ করা হয়। আমি মিটফোর্ডের ট্রাকে ছিলাম। সকাল নয়টার সময় আমাদের ট্রাক মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশ ঘরের সন্মুখে উপস্থিত হলে আমরা ট্রাক থেকে নেমে লাশঘরের ভিতর প্রবেশ করে বুকে এবং পিঠে মেশিন গানের গুলিতে ঝাঁজড়া করা প্রায় একশত যুবক বাঙ্গালীর বীভৎস লাশ দেখলাম। আমি আমার সুপারভাইজারের নির্দেশে লাশ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে প্রতিটি লাশের পায়ে ধরে টেনে বের করে বাইরে দাঁড়ানো অন্যান্য সুইপারের হাতে তুলে দিয়েছি ট্রাকে উঠাবার জন্য। আমি দেখেছি প্রতিটি লাশের বুক ও পিঠ মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁজড়া। সব লাশ তুলে দিয়ে একপাশে একটা লম্বা টেবিলের উপর চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া একটি লাশের উপর থেকে চাদর টেনে উঠিয়ে দেখলাম একটি রুপসী ষোড়শী যুবতীর উলঙ্গ লাশ- লাশের বক্ষ যোনিপথ ক্ষতবিক্ষত, কোমরের পিছনের মাংস কেটে তুলে নেওয়া হয়েছে, বুকের স্তন থেতলে গেছে, কোমড় পর্য্যন্ত লম্বা কালো চুল, হরিণের মত মায়াময় চোখ দেখে আমার চোখ বেয়ে পানি পড়তে থাকলো, আমি কিছুতেই চোখের পানি রাখতে পারলাম না। আমি আমার সুপারভাইজারের ভয়াল এবং ভয়ঙ্কর কর্কশ গর্জ্জনের মুখে সেই সুন্দরীর পবিত্র দেহ অত্যন্ত যত্ন, সম্ভমের সাথে ট্রাকে উঠিয়ে দিলাম। মিটফোর্ডের লাশঘরের সকল লাশ ট্রাকে উঠিয়ে আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে নিয়ে গিয়ে বিরাট গর্তের মধ্যে ঢেলে দিলাম।দেখলাম বিরাট বিরাট গর্তের মধ্যে সুইপার ও ডোমেরা রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্হান থেকে নিয়ে আসা লাশ ট্রাক থেকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। আমি অধিকাংশ লাশের দেহে কোন কাপড় দেখি নাই, যে সমস্ত যুবতী মেয়ে ও রমণীদের লাশ গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো তার কোন লাশের দেহেই আমি কোন আবরণ দেখি নাই। তাদের পবিত্র দেহ দেখেছি ক্ষতবিক্ষত, তাদের যোনিপথ পিছন দিক সহ আঘাতে বিভৎস হয়ে আছে। দুপুর প্রায় দুটার সময় আমরা রমনা কালিবাড়ীতে চলে আসি পৌরসভার ট্রাক নিয়ে। লাশ উঠাবার জন্য ট্রাক রমনা কালিবাড়ীতে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে, দুজন ট্রাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা চারজন কালিবাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখি সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে আছে। কালিবাড়ীর ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো ৪১টি পোড়া লাশ আমি ট্রাকে তুলেছি। কালিবাড়ীর এসকল লাশ আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে গর্তের মধ্যে ফেলেছি। লাশ তুলে তুলে মানুষের পঁচা চর্বির গন্ধে আমার পাকস্হলি বের হতে চাচ্ছিল । পরের দিন আমি আর লাশ তুলতে যাই নাই,যেতে পারি নাই, সারাদিন ভাত খেতে পারিনাই, ঘৃণায় কোন কিছু স্পর্শ করতে পারি নাই। পরের দিন ২৯শে মার্চ সকালে আমি আবার ঢাকা পৌরসভা অফিসে হাজির হলে আমাকে ট্রাক দিয়ে লাশ তোলার জন্য আরও কয়েকজন সুইপারের সাথে ঢাকা শাখারীবাজারে যেতে বলা হয়। জজ কোর্টের সন্মুখে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও জ্বলছিল, আর পাক সেনারা টহলে মোতায়েন ছিল বলে আমরা ট্রাক নিয়ে সে পথ দিয়ে শাখারীবাজার প্রবেশ করতে পারি নাই। পাটুয়াটুলি ঘুরে

আমরা শাখারীবাজারের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে পাটুয়াটুলি ফাঁড়ি পার হয়ে তাহাদের ট্রাক শাঁখারী বাজারের মধ্যে প্রবেশ করল। ট্রাক থেকে নেমে আমরা শাখারী বাজারের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করলাম-দেখলাম মানুষের লাশ নারী পুরুষ, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বালক বালিকা, কিশোর শিশুর বিভৎস পচা লাশ, চারিদিকে ইমারত সমূহ ভেঙ্গে পড়ে আছে, মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলংগ দেখলাম, দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারও কারও যোনিপথে লাঠি ঢুকানো আছে। বহু পোড়া, ভস্ম লাশ দেখেছি। পাঞ্জাবী সেনারা পাষন্ডের মত লাফাতে লাফাতে গুলি বর্ষণ করছিল, বিহারী জনতা শাখারী বাজারের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনা দানা লুন্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে প্রাণের ভয়ে দুই ট্রাক লাশ তুলে লাশ তোলার জন্য সেদিন আর শাখারীবাজারে প্রবেশ করার সাহস পাই নাই। ৩০শে মার্চ সকালে আমার দলকে মিলব্যারাক থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি মিলব্যারাক ঘাটে পৌরসভার ট্রাক নিয়ে গিয়ে দেখলাম নদীর ঘাটে অসংখ্য মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বহু লাশ রশি দিয়ে বাঁধা দেখলাম, প্রতিটি রশির বন্ধন খুলে প্রতি দলে দশ জন পনের জনের লাশ বের করলাম, সব যুবক ছেলে ও স্বাস্হ্যবান বালকদের লাশ দেখলাম। প্রতিটি লাশের চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা, শক্ত করে পিছন দিক থেকে। প্রতিটি লাশের মুখমন্ডল কালো দেখলাম এসিডে জ্বলে বিকৃত ও বিকট হয়ে আছে। লাশের সামনে গিয়ে ঔষধের অসহ্য গন্ধ পেলাম। লাশের কোন দলকে দেখলাম মেশিনগানের গুলিতে বুক ও পিঠ ঝাঁজরা হয়ে আছে, অনেক লাশ দেখলাম বেটন ও বেয়নেটের আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে, কারো মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে আছে, কারো কাটা হৃদ পিন্ড বের হয়ে আছে। নদীর পাড়ে ছয়জন রুপসী যুবতীর বীভৎস ক্ষতবিক্ষত, উলঙ্গ লাশ দেখলাম।চোখ বাঁধা হাত, পা, শক্ত করে বাঁধা, প্রতিটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া, মুখমন্ডল, বক্ষ, ও যোনিপথ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ও বীভৎস দেখলাম। দুইবারে দুই ট্রাকে আমি সত্তরটি লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। এরপর আমাকে সদরঘাট, শ্যামবাজার, বাদামতলী ঘাট থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি উপরোক্ত এলাকার নদী ঘাট থেকে পচা লাশ তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। আমি যেদিন কালিবাড়ী লাশ তুলেছি সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের পিছনে ষ্টাফ কোয়ার্টার, রোকেয়া হলের পশ্চিম দিকে জনৈক অধ্যাপকের বাসা থেকে আমি লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলের পিছনের ষ্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর থেকে আমি যেয়ে পুরুষ ও শিশু সমেত নয়টি লাশ তুলেছি। আর অধ্যাপকের বাসা থেকে সিড়ির সামনে লেপের ভিতর পেচানো জনৈক অধ্যাপকের লাশ আমি তুলে নিয়ে গেছি।

স্বাক্ষর
পরদেশী ২১/৩/৭৪।

মিসেস রাবেয়া খাতুন
সুইপার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন,
ঢাকা ।

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃঃ ৫৩-৫৬)

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে হানাদার পাঞ্জাবীসেনারা যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় তখন আমি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এস, এফ, কেন্টিনে ছিলাম। আসন্ন হামলার ভয়ে আমি সারাদিন পুলিশ লাইনের ব্যারাক ঝাড়ু দিয়ে রাতে ব্যারাকেই ছিলাম। কামান, গোলা, লাইটবোম আর ট্যাঙ্কের অবিরাম কানফাটা গর্জ্জনে আমি ভয়ে ব্যারাকের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে থেকে থরথরিয়ে কাঁপছিলাম। ২৬শে মার্চ সকালে ওদের কামানের সন্মুখে আমাদের বীর বাঙ্গালী পুলিশ বাহিনী বীরের মত প্রতিরোধ করতে করতে আর টিকে থাকতে পারে নাই। সকালে ওরা পুলিশ লাইনের এস, এফ, ব্যারাকের চারদিকে আগুন লাগিয়ে এবং ব্যারাকের মধ্যে প্রবেশ করে বাঙ্গালী পুলিশদের নাকে, মুখে, সারা দেহে বেয়নেট ও বেটন চার্জ করতে করতে ও বুটের লাথি মারতে মারতে বের করে নিয়ে আসছিল। ক্যান্টিনের কামড়া থেকে বন্দুকের নলের মুখে আমাকেও বের করে আনা হয়, আমাকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় এবং আমার উপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করছিল আর কুকুরের মত অট্ট হসিতে ফেটে পড়ছিল। আমার উপর উপর্যূপরি পাশবিক অত্যাচার করতে করতে যখন আমাকে একেবারে মেরে ফেলে দেওয়র উপক্রম হয় তখন আমার বাঁচবার আর কোন উপায় না দেখে আমি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য ওদের নিকট কাতর মিনতি জানাচ্ছিলাম। আমি হাউ মাউ করে কাঁদছিলাম, আর বলছিলাম আমাকে মেরোনা, আমি সুইপার, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পায়খানা ও নর্দমা পরিস্কার করার আর কেউ থাকবেনা, তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা আমাকে মেরোনা, মোরোনা, মোরোনা, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পুলিশ লাইন রক্ত ও লাশের পচা গন্ধে মানুষের বাস করার অযোগ্য হয়ে পড়বে। তখনও আমার উপর এক পাঞ্জাবী কুকুর, কুকুরের মতই আমার কোমড়ের উপর চড়াও হয়ে আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করছিল। আমাকে এভাবে ধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলে দিলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন পরিস্কার করার জন্য আর কেউ থাকবেনা একথা ভেবে ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে এক পাঞ্জাবী সেনা ধমক দিয়ে বলতে থাকে, "ঠিক হায়, তোমকো ছোড় দিয়া যায়েগা জারা বাদ, তোম বাহার নাহি নেকলেগা, হারওয়াকত লাইন পার হাজির রাহেগো।" একথা বলে আমাকে ছেড়ে দেয়।

পাঞ্জাবী সেনারা রাজাকার ও দালালদের সাহায্যে রাজাধানীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা এবং অভিজাত জনপদ থেকে বহু বাঙ্গালী যুবতী,

মেয়ে, রুপসী মহিলা এবং সুন্দরী বালিকাদের জীপে, মিলিটারী ট্রাকে করে পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ব্যারাকে জমায়েত করতে থাকে। আমি কেন্টিনের ড্রেন পরিস্কার করছিলাম-দেখলাম আমার সন্মুখ দিয়ে জীপ থেকে আর্মী ট্রাক থেকে লাইন করে বহু বালিকা যুবতী ও মহিলাকে এস, এফ কেন্টিনের মধ্য দিয়ে ব্যারাকে রাখা হল। বহু মেয়েকে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং এর উপর তলায় রুমে নিয়ে যাওয়া হল, আর অবশিষ্ট মেয়ে যাদেরকে ব্যারাকের ভিতরে যায়গা দেওয়া গেল না তাদের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হল। অধিকাংশ মেয়ের হাতে বই ও খাতা দেখলাম, অনেক রুপসী যুবতীর দেহে অলঙ্কার দেখলাম, তাদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়ের চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু পড়ছিল। এর পরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই বাঙ্গালী নারীদের উপর বীভৎস ধর্ষণ। লাইন থেকে পাঞ্জাবী সেনারা কুকুরের মত জীভ চাটতে চাটতে ব্যারাকের মধ্যে উম্মত্ত অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে প্রবেশ করতে লাগলো। ওরা ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী, মহিলা ও বালিকার পরণের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল।কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেই নিরীহ বালিকাদের উপর ধর্ষনে লেগে গেল কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেই নিরীহ বালিকাদের উপর ধর্ষণে লেগে গেল, আমি ব্যারাকে ড্রেন পরিস্কার করার অভিনয় করছিলাম আর ওদের বীভৎস পৈশাচিকতা দেখছিলাম। ওদের উম্মত্ত উল্লাসের সামনে কোন মেয়ে কোন শব্দ পর্যন্তও করে নাই, করতে পারে নাই। উম্মত্ত পাঞ্জাবী সেনারা এই নিরীহ বাঙ্গালী মেয়েদের শুধু মাত্র ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয় নাই-আমি দেখলাম পাক সেনারা সেই মেয়েদের উপর পাগলের মত উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারাল দাঁতা বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ওদের উদ্ধত ও উম্মত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসছিল, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমড়ের অংশ ওদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে গেল। যেসকল বাঙ্গালী যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করলো দেখলাম তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবী সেনারা ওদের চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছো মেরে টেনে ছিড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারাল ছুড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছিল। অনেক পশু ছোট ছোট বালিকাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজনে দু পা' দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিড়ে ফেলে দিল, আমি দেখলাম সেখানে বসে বসে, আর ড্রেন পরিস্কার করছিলাম, পাঞ্জাবীরা শশ্মানের লাশ যেকোন কুকুরের মত মদ খেয়ে সব সময় সেখানকার যার যে মেয়ে ইচ্ছা তাকেই ধরে ধর্ষণ করছিল। শুধু সাধারণ পাঞ্জাবী সেনারাই এই বীভৎস পাশবিক অত্যাচারে যোগ দেয় নাই, সকল উচ্চ পদস্হ পাঞ্জাবী সামরিক অফিসারই মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মত হয়ে দুই হাত বাঘের মত নাচাতে নাচাতে সেই উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙ্গালী মহিলাদের উপর সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ কাজে লিপ্ত থাকতো। কোন মেয়ে, মহিলা যুবতীকে এক মূহুর্তের জন্য অবসর দেওয়া হয়

নাই, ওদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, পরের দিন এসকল মেয়ের লাশ অন্যান্য মেয়েদের সন্মুখে ছুরি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিত। এ সকল মহিলা, বালিকা ও যুবতীদের নির্মম পরিণতি দেখে অন্যান্য মেয়েরা আরও ভীত ও সন্তস্ত হয়ে পড়তো, এবং স্বেচ্ছায় পশুদের ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করতো। যে সকল মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সাথে মিল দিয়ে ওদের অতৃপ্ত যৌণ ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের হাসি তামাশায় দেহ দান করেছে তাদেরকেও ছাড়া হয় নাই। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়েদের উপর সম্মিলিত ভাবে ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুড়ি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যোণি ও গুহ্য ধারে মধ্যে সম্পুর্ণ ছুড়ি চালিয়ে দিয়ে অট্ট হাসিতে ফেটে পরে ওরা আনন্দ উপভোগ করত।

এর পর উলঙ্গ মেয়েদেরকে গরুর মত লাথি মারতে মারতে পশুর মত পিটাতে পিটাতে উপরে হেডকোয়ার্টারে দোতলা, তেতলা ও চার তলায় উলঙ্গ অবস্হায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পাঞ্জাবী সেনারা চলে যাওয়ার সময় মেয়েদেরকে লাথি মেরে আবার কামড়ার ভিতর ঢুকিয়ে তালাবদ্ধ করে চলে যেত। ইহার পর বহু যুবতী মেয়েকে হেড কোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দায় মোটা লোহার তারের উপর চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়- প্রতিদিন পাঞ্জাবীরা সেখানে যাতায়াত করত সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের কেউ এসে তাদের উলঙ্গ দেহের কোমড়ের মাংস বেটন দিয়ে উন্মত্তভাবে আঘাত করতে থাকত, কেউ তাদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে যেত, কেউ হাসতে হাসতে তাদের যোণীপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ উপভোগ করত, কেউ ধারালো চাকু দিয়ে কোন যুবতীর পাছার মাংস আস্তে আস্তে কেটে কেটে আনন্দ করত, কেউ উচু চেয়ারে দাড়িয়ে উন্মত্তকক্ষ মেয়েদের স্তনে মুখ লাগিয়ে ধারাল দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্ট হাসি করতো। কোন মেয়ে এই সব অত্যাচারে কোন প্রকার চিৎকার করার চেষ্টা করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হত। প্রতিটি মেয়ের হাত বাধা ছিল পিছনের দিকে শুন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবী সেনারা সেখানে এসে সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েদের এলোপাথারী বেদম প্রহার করে যেত। প্রতিদিন এভাবে বিরামহীন প্রহারে মেয়েদের দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিল, মেয়েদের কারও মুখের সম্মুখের দিকে দাঁত ছিল না, ঠোটের দুদিকে মাংস কামড়ে, টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙ্গুল, হাতের তালু ভেঙ্গে, থেতলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এসব অত্যাচারিত ও লাঞ্চিত মহিলা ও মেয়েদের প্রস্রাব ও পায়খানা করার জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেওয়া হতো না এক মুহূর্ত্তের জন্য। হেড কোয়ার্টারের উপর তলার বারান্দায় এই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েরা হাত বাধা অবস্হায় লোহার তারে ঝুলে থেকে সেখানে প্রস্রাব পায়খানা করত - আমি

প্রতিদিন সেখানে গিয়ে এসব প্রস্রাব পায়খানা পরিস্কার করতাম। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক মেয়ে অবিরাম ধর্ষণের ফলে নির্মমভাবে ঝুলন্ত অবস্হায় মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই বাঁধন থেকে অনেক বাঙ্গালী যুবতীর বীভৎস মৃতদেহ পাঞ্জাবী সেনাদেরকে নামাতে দেখেছি। আমি দিনের বেলায়ও সেখানে সেই সকল বন্দী মহিলাদের পুতগন্ধ, প্রস্রাব-পায়খানা পরিস্কার করার জন্য সারাদিন উপস্হিত থাকতাম। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ব্যারাক থেকে এবং হেড কোয়াটার অফিসের উপর তলা হতে বহু ধর্ষিতা মেয়ের ক্ষত বিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন নতুন মেয়েদের চুলের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে নিয়ে নির্মম ভাবে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। এইসব উলঙ্গ নিরীহ বাঙ্গালী যুবতীদের সারাক্ষশ সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনারা প্রহরা দিত। কোন বাঙ্গালীকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। আর আমি ছাড়া অন্য কোন সুইপারকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না।

মেয়েদের হাজারো কাতর আহাজারীতেও আমি ইচ্ছা থাকা সত্বেও ফেব্রুয়ারি মেয়েদের বাঁচাবার জন্য কোন ভূমিকা পালন করতে পারি নাই। এপ্রিল মাসের দিকে আমি অন্ধকার পরিস্কার হওয়ার সাথে সাথে খুব ভোরে হেড কোয়ার্টারের উপর তলায় সারারাত ঝুলন্ত মেয়েদের মলমূত্র পরিস্কার করেছিলাম। এমন সময় সিদ্ধেশ্বরীর ১৩৯ নং বাসার রানু নামে এক কলেজের ছাত্রীর কাতর প্রার্থনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ি এবং মেথরের কাপড় পরিয়ে কলেজ ছাত্রী রানুকে মুক্তি করে পুলিশ লাইনের বাইরে নিরাপদে দিয়ে আসি। স্বাধীন হওয়ার পর সেই মেয়েকে আর দেখি নাই। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনী বাংলাদেশ মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত পাঞ্জাবী সেনারা এই সকল নিরীহ বাঙ্গালী মহিলা, যুবতী ও বালিকাদের উপর এভাবে নির্মম - পাশবিক অত্যাচার ও বিভৎসভাবে ধর্ষণ করে যাচ্ছিল। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে মিত্র বাহিনী ঢাকায় বোমা বর্ষনের সাথে সাথে পাঞ্জাবী সেনারা আমাদের চোখের সামনে মেয়েদের নির্মমভাবে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে। রাজারবাগ হেড কোয়ার্টার অফিসের উপর তলায়, সমস্ত কক্ষে, বারান্দায় এই নিরীহ মহিলা ও বালিকাদের তাজা রক্ত জমাট হয়েছিল। ডিসেম্বরে মুক্তি বাহিনী ও মিত্র বাহিনী রাজধানীতে বীর বিক্রমে প্রবেশ করলে পুলিশ লাইনের সকল পাঞ্জাবী সেনা আত্ম সমর্পন করে।

টিপসহি
রাবেয়া খাতুন
১৮/২/৭৪

সুবেদার খলিলুর রহমান
আর্মস এস,আই, বি,আর, পি

রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা।
(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড, পৃ ঃ ২৫-২৯)

১৯৭১ সনের ২৯শে মার্চ সকাল দশটায় আমরা মিল ব্যারাক পুলিশ লাইনে উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রিয় পুলিশ সুপার মিঃ ই, এ, চৌধুরী, পুলিশ কমান্ডেন্ট মিঃ হাবিবুর রহমান, ডি,এস,পি, লোদী সাহেব, রেঞ্জ রিজার্ভ ইন্সপেক্টর মিঃ সৈয়দ বজলুল হক, ডি,এস,পি, আব্দুস সালাম, রিজার্ভ ইন্সেপেক্টর মিঃ মতিয়ুর রহমান সবাইকে উপস্থিত দেখলাম। মিঃ ই,এ,চৌধুরী সাহেব ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, আহত, ক্ষত বিক্ষত সিপাহীদের দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। লাইনে মুহূর্তে কান্নার রোল পড়ে গেল। তিনি লাইনের মধ্যে প্রবেশ করে প্রতিটি সিপাহীর আহত, ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখলেন, তার দু' চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু পড়ছিল। তিনি অবিলম্বে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি বললেন "তোমাদের কোন অসুবিধা নাই, তোমরা নীরবে তোমাদের কাজ করে যাও।" আমি তোমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখবো।"

আমার সাথে আমার আরও তিনজন সুবেদার, সুবেদার সফিকুর রহমানের সহকর্মীর সাথে আটজন হাবিলদার-মোঃ ফজলুল হক, আঃ ওয়াদুদ, আব্দুল কুদ্দুস ও অন্যান্য বিশজন পুলিশ কনেষ্টবল দিয়ে ঢাকা কোতোয়ালী থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমরা থানায় প্রবেশ করে দেওয়ালে, মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত দেখতে পেলাম, দেখলাম থানার দেওয়াল গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া হয়ে আছে, বুড়ীগঙ্গার পাড়ে অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ দেখলাম, আমাদের পি,আর, এফ, এর কনেষ্টবল আবু তাহেরের (নং ৭৯৮) পোষাকপরা লাশ ভাসছে, আরও বহু সিপাহীর ক্ষত বিক্ষত লাশ দেখতে পেলাম। আমার চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ছিল, আমি দিশাহারা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার প্রিয় সিপাহী তাহেরের লাশ ধরতে গেলে পিছন থেকে এক পাঞ্জাবী সেনা গর্জ্জন করে কর্কশ ভাবে বলতে থাকে "শূয়ার কা বাচ্চা, তোমকো ভি পাকড়াতা হায়, কুত্তা কা বাচ্চা, তোমকো ভি সাথ মে গুলি করেগা।" আমি আর্ম সাব ইন্সপেক্টর হওয়া সত্বেও একজন সাধারণ পাকসেনা আমার সাথে কুকুরের মত ব্যবহার করলো। দুঃখে অপমানে, লজ্জায় আমি যেন অবশ হয়ে পড়লাম। প্রতিবাদ করতে চাইলাম সর্বশক্তি দিয়ে কিন্তু পারলাম না। প্রতিবাদ করার কোন উপায় ছিলনা। তাই ওদের অসহ্য আপত্তিকর কার্যকলাপের প্রতিবাদ করি নাই, সবকিছু নীরবে সহ্য করেছি ওদের যথেচ্ছ কার্য্যকলাপের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছি।

কোতোয়ালী থানার বরাবর সোজাসুজি গিয়ে বুড়ীগঙ্গার লঞ্চঘাটের পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম বুড়ীগঙ্গার পাড়ে লাশ, বিকৃত, ক্ষত-বিক্ষত, অসংখ্য মানুষের লাশ ভাসছে, ভাসছে পুলিশের পোষাক পরা বীভৎস লাশ। দেখলাম বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ, বৃদ্ধা-যুবা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশুর অসংখ্য লাশ। যতদূর আমার দৃষ্টি যায় দেখলাম বাদামতলী ঘাট থেকে শ্যামবাজার ঘাট পর্য্যন্ত নদীর পাড়ে অসংখ্য মানুষের বীভৎস পঁচা ও বিকৃত লাশ, অনেক উলঙ্গ যুবতীর

লাশ দেখলাম, এই পূত পবিত্র বীরাঙ্গনাদের ক্ষত বিক্ষত যোনিপথ দেখে মনে হলো, পাঞ্জাবী সেনারা কুকুরের মত ওদের পবিএ দেহের উপর ঝাপিয়ে পড়ে ওদেরকে যথেচ্ছভাবে ধর্ষণ করে গুলিতে ঝাঁজড়া করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। অনেক শিশুর ও ছোট ছোট বালক-বালিকাদের থেতলে যাওয়া লাশ দেখলাম। ওদেরকে পা ধরে মাটিতে আছড়িয়ে মারা হয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রুভরা চোখে আমি লাশ দেখলাম-লাশ আর লাশ- অসংখ্য নিরীহ বাঙ্গালীর লাশ- প্রতিটি লাশে বেয়নেট ও বেটনের আঘাত দেখলাম, দেখলাম কারও মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আছে, পাকস্থলি সমেত হৃৎপিন্ড বের করা হয়েছে, পায়ের গিট হাতে কব্জা ভাঙ্গা, ঝুলছে পানিতে। সদরঘাট টার্মিনালের শেডের মধ্যে প্রবেশ করে শুধু রক্ত আর রক্ত দেখলাম---দেখলাম মানুষের তাজা রক্ত এই বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড়ে। এই টার্মিনাল শেড ছিল ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে ওদের জল্লাদখানা। ওরা বহু মানুষকে ধরে এনে ঐ টার্মিনালে জবাই করে বেটন ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে টেনে হেঁচড়িয়ে পানিতে ফেলে দিয়েছে। অসংখ্য মানুষকে এভাবে নদীতে ফেলে দেওয়ার পরিস্কার ছাপ দেখতে পেলাম সেই রক্তের স্রোতের মধ্যে। শেডের বাইরের প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখলাম অসংখ্য কাক ও শকুন মানুষের সেই রক্তের লোভে ভীড় করছে। সদরঘাট টার্মিনাল থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বের হয়ে পূর্বদিকে পাকসেনাদের সদর আউট পোষ্টের দিকে দেখলাম নদীর পাড়ের সমস্ত বাড়িঘর ভস্ম হয়ে ওদের নৃশংসতা ও বীভৎসতার সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। দেখলাম রাস্তার পার্শ্বে ঢাকা মিউনিসিপালিটির কয়েকটি ময়লা পরিস্কার করার ট্রাক দাড়িয়ে আছে, সুইপাররা হাত পা' ধরে টেনে হেচড়িয়ে ট্রাকে লাশ উঠাচ্ছে, প্রতিটি ঘর থেকে আমাদের চোখের সামনে বহু নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশু ও বৃদ্ধ-বুড়ার লাশ সুইপাররা টেনে টেনে ট্রাকে উঠাচ্ছিল। পাঞ্জাবী সেনারা নদীর পাড়ে দাড়িয়ে কুকুরের মত নির্মম ভাবে প্রহরা দিচ্ছিল। ভয়ে সন্ত্রাসে আমি আর এগুতে পারলামনা। পূর্ব দিকের রাস্তা দিয়ে আমি সদরঘাটের কাপড়ের বাজারের নীরব নিথর রাস্তা ধরে সদরঘাট বেপটিষ্ট মিশনের চৌরাস্তার সম্মুখ দিয়ে নওয়াবপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমাদের কারো শরীরে পুলিশের পোশাক ছিলনা---- আমি এবং আমার সাথে আরও দু'জন সিপাহী সাধারণ পোশাক পরে দায়িত্ব পালন করছিলাম। কাপড়ের বাজারের চারদিকে রুপমহল সিনেমা হলের সুমুখে সর্বত্র বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য মানুষের ইতস্ততঃ ছড়ানো বীভৎস লাশ দেখলাম, বহু যুবতী মেয়ের ক্ষত বিক্ষত লাশ দেখলাম। খৃষ্টান মিশনারী অফিসের সন্মুখে, সদরঘাট বাস ষ্টপেজের চারদিকে, কলেজিয়েট হাইস্কুল, জগন্নাথ কলেজ, প্রগোজ হাইস্কুল, ঢাকা জজকোর্ট, পুরাতন ষ্টেট ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, সদরঘাট গির্জা, নওয়াবপুর রোডের সর্বত্র, ক্যাথলিক মিশনের বাইরে এবং ভিতরে আদালত প্রাঙ্গণে বহু মানুষের মৃতদেহ দেখলাম। রাস্তায় রাস্তায় দেখলাম পুলিশের পোশাকপরা বহু মৃতদেহ, রায় সাহেব বাজার ব্রীজ পার হয়ে নওয়াবপুর রোডে পা দিয়েই দেখলাম বিহারীদের উল্লাশ ও উন্মত্ত

লাফালাফি, ওরা পশুর মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অসংখ্য বাংগালীর লাশ পাড়িয়ে জয়ধ্বনি করে মিছিল করে নওয়াবপুরের রাস্তায় বের হয়ে পড়ছিল। পাঞ্জাবী সেনা কর্তৃক নির্বিচারে বাঙ্গালী হত্যার খুশীতে দেখলাম বিহারীরা রাস্তায় পড়ে থাকা নিরীহ বাঙ্গালীদের লাশের উপর লাথি মারছে, কেউ প্রস্রাব করে দিচ্ছে, হাসতে হাসতে, রাস্তায় রাস্তায় বিহারী এলাকায় দেখলাম সরু বাঁশের মাথায় বাঙ্গালী বালক ও শিশুর লাশ বিদ্ধ করে খাড়া করে রাখা হয়েছে । দেখলাম উম্মত্ত বিহারী জনতা রাস্তায় পড়ে থাকা লাশগুলিকে দা দিয়ে কুপিয়ে কুচি কুচি করে কেটে আনন্দ করছে, উশৃঙ্খল বিহারী ছেলেরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে উল্লাশ করছে, রাস্তার দুই পার্শ্বে সর্বত্র আগুন আর আগুন দেখলাম। বিহারী জনতা রাস্তার পার্শ্বের প্রতিটি বাড়ীতে প্রবেশ করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, জ্বলছিল বাঙ্গালীদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র পণ্যদ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদ মূল্যবান জিনিষপত্র। ঠাটারী বাজারের ট্রাফিক ক্রসিংয়ে এসে দেখলাম একটি যুবক ছেলের বীভৎস লাশের উপর পেট চিড়ে বাঁশের লাঠি খাড়া করে, লাঠির মাথায় স্বাধীন বাংলার একটি মলিন পতাকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। লাশের উপর জয় বাংলার পতাকা ঝুলিয়ে রেখে বিহারী জনতা চারদিকে দাঁড়িয়ে থেকে হাসছে, উল্লাস করছে। দেখলাম লাশের গুহ্যদ্বার দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। বিজয় নগরের রাস্তা ধরে আমি শান্তিবাগে আমার কোয়ার্টারে আসছিলাম-দেখলাম তখনও রাস্তার চারিপার্শ্বের ঘরবাড়ি জ্বলছে।

আমি কোতোয়ালী থানায় দায়িত্ব পালন করতাম, ৩০শে মার্চ কোতয়ালী থানার মধ্যে আমরা কামড়ায় কামড়ায় প্রবেশ করে দেওয়ালের সর্বত্র চাপ চাপ রক্ত দেখলাম,দেখলাম থানার পায়খানা, প্রশ্রাবখানা ও অনান্য দেওয়াল গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া হয়ে আছে। ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের পর কোতোয়ালী থানার কোন বাঙ্গালী পুলিশকে বাইরে কোন টহলে পাঠানো হতো না, থানায় বসিয়ে রাখা হতো। এক পাঞ্জাবী মেজর আমাদেরকে তদারক করে যেতেন মাঝে মাঝে এসে। ৫ই এপ্রিল আমাদের সবাইকে কোতোয়ালী থানা থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আনা হয়। পুলিশ লাইনে এসে আমাদের ব্যারাক কেন্টিন, আসবাবপত্র, পোশাক পরিচ্ছদ সবকিছুর ভস্ম ছাই দেখলাম। তিন নম্বর ব্যারাকে প্রবেশ করে আমার দুজন প্রিয় সিপাহীর অগ্নিদগ্ধ লাশ দেখলাম-লাশের পায়ে শুধুমাত্র বুট ছিল, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সারা দেহ জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রিয় সিপাহী জাহাঙ্গীর ও আবদুস সালামের বীভৎস লাশ দেখে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। লাশের দিকে মাথা নত করে আমার দু'জন বীর সিপাহীকে সালাম জানালাম, অশ্রুসিক্ত নয়নে। পুলিশ লাইনের উত্তর পূর্বদিকের পুকুরের উত্তর পাড়ে শহীদ সিপাহীদের যথার্থ মর্যাদার সাথে সমাহিত করলাম।

পুলিশ লাইন থেকে পাঞ্জাবীরা চলে গেলেও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে চরম ভয় ভীতি, সন্ত্রাস ও হতাশা বিরাজ করছিল। আমরা সব সময় মৃত্যু ভয়ে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্থ থাকতাম। ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট বিশেষ পুলিশ ফোর্সের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর ছিলেন

এ সময় বোস্তান খাঁ নামে এক চরম বাঙ্গালী বিদ্বেষী পাঠান ভদ্রলোক। এ ভদ্রলোক পুলিশ লাইনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। তিনি ৬ই এপ্রিল লাইনে বসেই বাঙ্গালী পুলিশের সাথে কুকুরের মত যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করে দেন। লাইনে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যবান, শক্তি-সমর্থ কনেষ্টেবলদের ধরে, হাড়ের গিরায় গিরায় বেদমভাবে পিটুনি দেন। খুঁজে খুঁজে তার পছন্দ ও ইচ্ছামত যাকে ইচ্ছা তাকেই ধরে মুক্তি বাহিনী বলে ঢাকা সেনানিবাসে প্রেরণ করেন। বোস্তান খাঁ এভাবে প্রতিদিন যে সকল বাঙ্গালী পুলিশকে ঢাকা সেনানিবাসে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তারা আর কোন দিন লাইনে ফিরে আসে নাই। সাথে সাথে ঢাকা সেনানিবাস থেকে মিলিটারী ট্রাকে করে পাঞ্জাবী সেনারা হঠাৎ পুলিশ লাইনে উপস্থিত হয়ে বাঙ্গালী পুলিশদের তদারক আরম্ভ করে দিতঃ পাইকারীভাবে নাম ও নাম্বার জিজ্ঞাসা করতে করতে আকস্মাৎ অনেককে “তোম শালা মুক্তি বাহিনী হায়, চলো” বলে গরুর মত বুটের লাথি মারতে মারতে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। আমি তখন পি, আর, এফ-এর ফোর্স সুবেদার ছিলাম। মিলিটারী ট্রাক লাইনে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমি যে কোন অজুহাতে লাইনের বাইরে চলে যেতাম। পাঞ্জাবী সেনারা লাইনে প্রবেশ করলে লাইনের সর্বত্র যেন সবার মুখে মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে আসতো। বাঙ্গালী পুলিশ যার যার মত ব্যারাকে প্রবেশ করে ওদের দৃষ্টির আড়ালে থাকার চেষ্টা করতো। কারণ ওদের দৃষ্টিতে পড়ে গেলেই ওরা যে কোন অজুহাতে বাঙ্গালী পুলিশদের বিপন্ন করতো, বিপদগ্রস্থ করে তুলতো।

১৯৭১ সনের মে মাসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পশ্চিম পাকিস্তানী পাঞ্জাবী পুলিশ এসে গেলে পাঠান রিজার্ভ ইন্সপেক্টর কুকুরের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলতে থাকে ‘যাও শালা লোক শোয়ার কা বাচ্চা হামারা ব্যারাক ছোঁড়ো, হামারা আদমী আগিয়া, শালা লোগ, ভাগো”। একথা বলার সাথে সাথে বিহারী, পাঞ্জাবী, পাঠান পুলিশ ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশরা পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র সবকিছু ব্যারাকের বাইরে ফেলে দিয়ে আমাদের ঘাড়ে ধরে বের করে দেয়। আমরা বাঙ্গালী পুলিশরা অসহায় এতিমের মত আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ কুড়িয়ে নিয়ে লাইনের আস্তাবলে বারান্দায় গাছের নিচে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আশ্রয় গ্রহণ করি। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যোগদান করার পর আমরা দেখেছি পাঞ্জাবী সেনারা মিলিটারী ট্রাকে ও জীপে করে প্রতিদিন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ঢাকার বিভিন্ন এলাকার বালিকা যুবতী মেয়ে ও সুন্দরী রমনীদের ধরে আনতে থাকে। অধিকাংশ বালিকা, যুবতী মেয়ের হাতে বই ও খাতা দেখেছি। প্রতিটি মেয়ের মুখমন্ডল বিষন্ন, বিমর্ষ, ও বিষময় দেখেছি। মিলিটারি জীপে ও ট্রাকে যখন এভাবে যুবতী মেয়েদের রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আনা হতো তখন পুলিশ লাইনে হৈচৈ পড়ে যেত, পাঞ্জাবী, বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ জীভ চাটতে চাটতে ট্রাকের সন্মুখে এসে মেয়েদের টেনে হেঁচড়িয়ে নামিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ দেহের পোশাক পরিচ্ছদ কাপড় চোপড় খুলে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে

উলঙ্গ করে আমাদের চোখের সামনেই মাটিতে ফেলে কুকুরের মত ধর্ষণ করতো। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ও অঞ্চল থেকে ধরে এসকল যুবতী মেয়েদের সারাদিন নির্বিচারে ধর্ষণ করার পর বৈকালে আমাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং এর উপর তাদেরকে উলঙ্গ করে চুলের সাথে লম্বা লোহার রডের সাথে বেঁধে রাখা হ'তো। রাতের বেলায় এসব নিরীহ বাঙ্গালী নারীদের উপর অবিরাম ধর্ষণ চালানো হতো। আমরা গভীর রাতে আমাদের কোয়ার্টারে বসে মেয়েদের আর্তচিৎকার শুনে আকস্মাৎ সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠতাম। সেই ভয়াল ও ভয়ঙ্কর চিৎকারে কান্নার রোল ভেসে আসতো "বাঁচাও, আমাদের বাচাঁও,তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাদের বাচাঁও, পানি দাও, এক ফোটা পানি দাও, পানি পানি !"

মিলিটারী ট্রাক ও ভ্যানে প্রতিদিন পাঞ্জাবী সেনারা রাজধানী বিভিন্ন জনপদ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে নিরীহ বাঙ্গালী যুবক ছেলেদের চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে অফিসের কক্ষে কক্ষে জমায়েত করে অকথ্য অত্যাচার চালাতো।হেডকোয়ার্টার অফিসের উপর তালায় আমাদের প্রবেশ করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। দিনের বেলায় পুলিশ লাইনে প্যারেডের আওয়াজের জন্য উপরতলা থেকে নির্যাতিত বন্দীদের কোন আর্তনাদ আমরা শুনতে পেতাম না। সন্ধ্যার পর আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কোয়ার্টার থেকে তাদের আর্তনাদ শুনতে পেতাম। সন্ধ্যার পর পাক সেনারা বিভিন্ন প্রকার বন্দীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যেত। আর লোহার রডের উপর ঝুলন্ত বালিকা, যুবতী নারী ও রুপসী রমনীদের উপর চলতো অবিরাম ধর্ষণ, নির্মম অত্যাচার। বন্দীদের হাহাকারে আমার অনেক সময় একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়তাম, অনেক সময় প্রতিবাদ বরতে চাইতাম। কিন্তু ওদের শক্তির মোকাবেলায় আমাদের কিছুই করার ছিলনা, আমরা কিছুই করি নাই, করতে পারি নাই। এভাবে প্রতিদিন 'মুক্তি হায়' বলে যে সব নিরীহ বাঙ্গালী ছেলেদের চোখ বেঁধে পুলিশ লাইনে এনে হেডকোয়ার্টার অফিসে জমায়েত কার হত রাতের শেষে পরের দিন সকালে আর এ সকল বন্দীদের দেখা যেতনা এবং সেস্থানে নতুন বন্দীদের এনে রাখা হতো।

স্বাক্ষর/-খলিলুর রহমান
২-১-১৯৭৪।

আবদুল কুদ্দুস মিয়া
রিজার্ভ ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
বি, আর, পি, হেড কোয়ার্টার, রাজারবাগার, ঢাকা।
(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড, পৃ ঃ ২৩-২৪)

১৯৭১ সনের ১৫ই মে থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশদের জমায়েত করা হয়। পাঞ্জাবী পুলিশ লাইনে এসেই আমাদের সাথে যথেচ্ছা ব্যবহার আরম্ভ করে দেয়; কথায় কথায় পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশরা আমাদের বুটের লাথি ও বন্দুকের বাট দিয়ে পিটাতে থাকে, চোখ রাঙ্গিয়ে বলতে থাকে "শূয়ারকা বাচ্চা, হিন্দুকা লাড়কা, বেঈমান শালা লোগ, হামলোগ আদমী

নাহি মাংতা, জামিন মাংতা”। আমাদেরকে হেডকোয়ার্টারের সকল কক্ষ থেকে কুকুর বিড়ালের মত তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশদের যায়গা দেওয়া হয়, আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, কাপড়, আসবাবপত্র সব বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, আমরা অসহায়ের মত আমাদের আসবাবপত্র তুলে নিয়ে আসতাবলের সামনে, ব্যারাকের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করি। পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ রাজারবাগ আসার পরই বাঙ্গালীদের উপর নির্মম অত্যাচার নেমে আসে। প্রতি দিন “ইয়ে শালা লোগ মুক্তি হায়” বলে বহু নিরীহ বাঙ্গালী যুবককে চোখ বেঁধে মিলিটারী ট্রাক ও জীপ থেকে আমাদের চোখের সামনে নামিয়ে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের উপর তলায় নিয়ে রাখা হয়। সারাদিন এভাবে চোখ বেঁধে বাঙ্গালী যুবকদের রাজারবাগ এনে জমায়েত করা হয় এবং সন্ধ্যার পর এ সব অসংখ্য বাঙ্গালী যুবককে মিলিটারী ট্রাকে করে ঢাকা সেনা নিবাসে নিয়ে হত্যা করা হয়। হেডকোয়ার্টারের তেতলা ও চারতলায় বহু যুবতী মেয়েকে উলঙ্গ করে রাখা হয়-পাঞ্জাবী সেনা ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এসব ধরে আনা বালিকা ও মহিলাদের উপর অবিরাম ধর্ষণ চালায়। লাইনে পুলিশের কলরবের জন্য আমরা অত্যাচারিত মেয়েদের ক্রন্দন রোল শুনতে পেতাম না- লাইনের দূরে গিয়ে দাঁড়ালেই ধর্ষিতা মেয়েদের আর্তনাদ ও আহাজারি শুনতে পেতাম-রাতে ধর্ষিতা মেয়েদের বুকফাটা চিৎকারে আমরা কোয়ার্টারে ঘুমাতে পারতাম না-সারারাত পরিবার পরিজন নিয়ে জেগে থাকতাম । হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং থেকে ভেসে আসা ধর্ষিতা মেয়েদের আর্তনাদে আমরা বাঙ্গালী মেয়েদের দুর্দশা দেখে দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমরা ঐ সকল অসহায় মেয়েদের উদ্ধার করার জন্য কিছুই করি নাই, করতে পারি নাই, কারণ ওদেরকে উদ্ধার করার জন্য, ওদের অত্যাচারে সহানুভূতি ও দরদ দেখানোর কোন সুযোগ আমাদের ছিলনা।হেডকোয়ার্টারের তেতলা ও চারতলায় যেখানে বাঙ্গালীমেয়েদের উলঙ্গ অবস্থায় ঝুলিয়ে রেখে ধর্ষণ করা হ’তো সেখানে সব সময় পাঞ্জাবী সৈন্যরা প্রহরায় মোতায়েন থাকতোসেখানে আমাদের প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না। মিঃ বোস্তান খাঁ নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এ সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইনের রিজার্ভ ইনসপেক্টর ছিলেন। এই ভদ্রলোক আমাদের লাইনে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর আমাদের উপর সর্বদিক দিয়ে অত্যাচার ও দমন নীতি আরম্ভ হয়ে যায়। পুলিশ লাইনে কখন আমাদের উপর মৃত্যুর করাল গ্রাস নেমে আসে, আমরা এভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতাম। ১৯৭১ সনের ৪ঠা এপ্রিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে তৎকালীন ষ্টোর-ইন-চার্জ পুলিশ সার্জেন্ট মিঃ মুর্তজা হোসেন এবং সুবেদার আবুল হোসেন খান এবং সুবেদার মোস্তফাকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পাঞ্জাবী সেনারা এই তিনজন বাঙ্গালী পুলিশকে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নির্মম অত্যাচার চালায়- পাঞ্জাবী সেনারা লাইন হয়ে ওদেরকে ঘেরাও করে দাড়িয়ে ফুট বলের মত বুট দিয়ে লাথি মেরে খেলতে থাকে। ওদের তিন জনের দেহ লাঠি,বেত বুট ও বেয়নেট দিয়ে গরুর মত পিটিয়ে চুরমার করে

দেওয়া হয়, সারা দেহ চাক চাক করে কেটে দেওয়া হয়। ওদের দেহ রক্তাক্ত হয়ে একেবারে অবশ ও অচল হয়ে গেলে তাদের তিনজনকে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওদের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ দেখে যাকে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই পাঠান তাদেরকে ছেড়ে দেন। পদস্থ পাঞ্জাবী অফিসারদের তাদের হত্যা করার জন্য তিনটি ফাঁকা গুলির শব্দ শুনিয়ে দেয় এবং বন্দীদের বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকার জন্য বলা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি উপরোক্ত তিন সহকর্মীর নিকট উক্ত ঘটনা বিস্তারিত জানতে পেরেছি।

১৯৭১ সনের ডিসেম্বরে ঢাকা রাজধানীতে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী সম্মিলিত অভিযানের মুখে আমরা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পশ্চিম পাকিস্থানী পুলিশ ও পাঞ্জাবী সেনাদের বেসামাল অবস্থা দেখতে পাই । বাংলাদেশ মুক্ত হলে মিত্রবাহিনী ও মক্তি বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল পশ্চিম পাকিস্থানী পুলিশ ও পাঞ্জাবী সেনাদের বন্দী করে নিয়ে যায়।

স্বাক্ষর/- আবদুল কুদ্দুস
২৩-৩-৭৪
রিজার্ভ ইন্সেপেক্টর অব পুলিশ,
বি,আর,পি,
রাজারবাগ,ঢাকা।

তাহমীনা কোম (দিপালী)
গ্রাম ঃ বৈতপুর
ডাকঘর ও থানা ঃ বাগেরহাট
জেলা ঃ খুলনা
(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃঃ ২৪০-২৪১)

২৪শে এপ্রিল পাকসেনারা কাড়াপাড়া হোয়ে বাগেরহাট আসে। এসেই কাড়াপাড়া এলাকাতেই ১০০ শতর উপরে লোককে হত্যা করে। নাগের বাজার তেলপট্টি ইত্যাদি এলাকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া শুরু করে এবং বলে দেয় লুট করার জন্য, মুসলমানের অধিকাংশ ঘরবাড়ী সব লুট করা শুরু করে।

মে মাসে এখানে শান্তি কমিটি সেই সঙ্গে রাজাকার বাহিনী গঠন হয় পরবর্তীকালে রজব আলী ফকির শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। সমগ্র বাগেরহাট এলাকাতে পাক সেনার চাইতে রাজাকাররাই অত্যাচার চালিয়েছে বেশী।

শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে বাগেরহাট শহর এলাকাতে যত হিন্দু ছিল কিছু হত্যা বাদে সবাইকে মুসলমান ধর্মে দিক্ষীত করে। এরপর গ্রামের দিকে হাত বাড়ায় গ্রামকে গ্রাম ধরে সবাইকে মুসলমান করতে থাকে।

আমি আমার স্বামী ছেলেমেয়ে বাবা, মা, কাকা, কাকীমা তাদের ছেলেমেয়ে সবাই ইসলাম ধর্মে দিক্ষা নিই। কিন্তু রাজাকাররা এরপরেও অত্যাচার করতে ছাড়েনি। এরপরও অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে।

২২শে আশ্বিন রাত তিনটার দিকে ৫০/৬০ জন রাজাকার আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলে। প্রথমে তারা মুক্তিবাহিনী বলে পরিচয় দিয়ে থাকতে চায় রাতের মত। অনেক অনুনয়-বিনয় করে। প্রথমে আমার ভাই প্রদীপ গুহ দেখেই চিনেছিল তারা রাজাকার। তাই সে ছাদ দিয়ে গাছে বেয়ে পিছনে নামবার চেষ্টা করেছে। উপর থেকে নিচে নামলেই রাজাকাররা ধরে ফেলে। ওকে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে বেয়োনেট দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। তারপর বাবা কাকা এবং পাশের বাড়ীর তিনজনকে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে শিরাজ মাষ্টার এবং তার দল গুলি করে মাথা সব উড়িয়ে দেয়। সকালবেলা আমরা সেসব লাশ উদ্ধার করি। হত্যা করে বাড়ীঘর লুট করে সব নিয়ে চলে যায়। আমরা যারা বেঁচে ছিলাম বাগেরহাট শহরে আসি। বাড়ীতে কেবল একজন কৃষান এবং আমার ৭০ বছরের বৃদ্ধা দিদিমাকে রেখে আসি।

কার্ত্তিক মাসের ১২/১৩ তারিখ হবে। রাজাকাররা আবার যায় আমাদের গ্রামে। দড়াটানা নদীর ওপার থেকে মুক্তিবাহিনী গোলাগুলি করতো। তাই রজব আলী অর্ডার দেয় সমস্ত এলাকা ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ধ্বংস করে গাছপালা পরিস্কার করে ফেলার জন্য। ঐদিন আমাদের বাড়িতে ঢোকে এবং দিদিমাকে লেপকাঁথা দিয়ে জড়িয়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে। আগুন দিলে দিদিমা আমার কাকার নাম ধরে বারবার চিৎকার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত এলাকা পুড়িয়ে ধ্বংস করে। ভোলা বোসকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। রাধা বল্লভ গ্রামে মেয়েদের রাজাকাররা ধরে নিয়ে আসে। রাজাকাররা সারারাত পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে দিনের বেলা গুলি করে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে রাখে। বলরাম সাহাকে রাজাকাররা গুলি করে হত্যা করে। তার বিরাট গদির উপরে রজব আলী বসত, চারিদিকে রাজাকার ঘিরে থাকাতো। ওখানে একটি ঘরে লোকদের জবাই করতো। প্রত্যেকদিন ১০টি লোক যোগাড় করতেই হতো, ১০টি করে জবাই করতোই। লোক না পারলে যে ভাবেই হোক ফকির হোক এনে দিতেই হতো। আমি একদিন এক লোকের সুপারিশ করতে গিয়ে দেখলাম ঘরের ভিতর চাপ চাপ রক্ত পড়েছে। মদনের মাঠ ওয়াপদা রেষ্ট হাউসে একটি কক্ষে অসংখ্য লোককে জবাই করেছে। খাদ্দার গ্রামে এক বাড়ী থেকে সবাইকে ধরে এনে হত্যা করে। ডাক বাংলা ঘাটে প্রত্যহ অসংখ্য লোককে জবাই করেছে বেয়োনেট দিয়ে।

এক বৃদ্ধ রামদা দিয়ে অসংখ্য লোককে কেটেছে। সে পিঠ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। লোক ধরে বলতো 'বাবা নীচু হও তা নইলে কাটতে আমার কষ্ট হয়। তাড়াতাড়ি বসে পড় তোমাদের কষ্টও কম হবে, আমারও কষ্ট কম হবে।

ইসহাক মিয়ার বাড়ীতে অনেক মেয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কেউ রেহাই পায়নি। সমস্ত এলাকাতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ব্যাপকভাবে হিন্দু মেয়ে ধরে পাকসেনাদের হাতে তুলে দিত রাজাকাররা। এছাড়া রাজাকাররা গ্রামে গ্রামে ঢুকে অধিকাংশ মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে।

বাগের হাট থানার মীর্জাপুর গ্রাম এবং সারাগ্রামে বহু মেয়ে অপমানিতা হয়ে আত্মহত্যা করেছে বিষ পানে কেউবা গলায় দড়ি দিয়ে।

রাজাকার, আল-বদর এদের মানুষ চরম ভাবে ঘৃণা করতো। আমার মনে হয় সমস্ত বাংলাদেশে রাজাকাররা এমন ভাবে সন্ত্রাস আর নৃশংস অত্যাচার কোথাও চালায়নি। নদীর ঘাটে দড়িবাঁধা অবস্হায় এক মাসে ৪/৫টি লোককে গলা কাটা অবস্হায় পেয়েছি। গলা সম্পূর্ণ কাটতো না অল্প কেটে ছেড়ে দিতো, ছটফট করে শেষ হয়ে যেত। হাড়ি খালীতে (বাগেরহাট থানা) বিষ্ণু মহাশয়কে তার বৌয়ের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আরও পাঁচজনকে ধরে ওর স্ত্রীর সামনে গুলি করে হত্যা করে। অত্যাচার চালায় সারাগ্রামে। বি,এ, পাশ এক মেয়েকে ধরে অত্যাচার চালিয়ে ছুরি দিয়ে হত্যা করে। মদনের মাঠের এক ঘরে ওরা নিয়মিত মানুষ কেটেছে।

স্বাক্ষর
তাহমীনা কোম (দিপালী)
৩.৮.৭৩

মোসাম্মৎ মনোয়ারা খাতুন
গ্রামঃ সলঙ্গা মধ্যপাড়া ভরমহনী
থানাঃ রায়গঞ্জ
জেলাঃ পাবনা

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃঃ ১৯২-১৯৩)

১৯৭১ সালের ভাদ্রমাসে (১৫ তারিখ) মুসলীম লীগের অন্যতম দালাল দূরবর্তী তারাশ থানার ক্যাম্প থেকে একদল পাকিস্তানী খান সেনাদের সলঙ্গা বাজারের দিকে লেলিয়ে দেয়। বলা প্রয়োজন সেই সময় কিছু সংখ্যক মুক্তি বাহিনী সলঙ্গা বাজারে রাজাকার ক্যাম্প আপারেশন করার জন্য গোপনে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল। ঠিক ঐ তারিখেই আরও ২০/২৫ জন খান কুকুরেরা লাহিড়ী মোহনপুর থেকে স্পীড বোট যোগে সলঙ্গা বাজারের দিকে চলে আসে। সলঙ্গা বাজারে এসে তারা বাজারের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে। কোন রকম দুস্কৃতকারীকে না পেয়ে তারা আপন ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হয়। যাওয়ার পথে পাক সৈন্য আমাদের বাড়ীতে ঢুকেই আমাকে ও আমার শ্বাশুড়ীকে দেখতে পায়। ইতিপূর্বেই আমার স্বামী জীবনের ভয়ে বাড়ী থেকে সরে পড়ে। পাক সৈন্য আমার শ্বাশুড়ীকে উর্দুতে বলে যে, "ইয়ে বুড়িমা তোম জলদী হেঁয়াছে ভাগ যাও।" বুড়ী জীবনের ভয়ে বাড়ীর বাইরে চলে যায়। আমি তখন পাক ফৌজের হাতের তল দিয়ে দৌড়ে পাশের বাড়ীতে আশ্রয় নেই। পাক ফৌজ তখন দৌড় দিয়ে সেই বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। আমি তখন উক্ত বাড়ীওয়ালার যুবতী মেয়েকে জড়িয়ে ধরি। পাক ফৌজ তখন উক্ত যুবতী মেয়েকে না ধরে আমাকে জোর করে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। আমি তখন বলি যে বাবা তুমি আমার মানহানি কোরোনা, তোমার পায়ে ধরি মিনতি করি। তখন পাকফৌজ উর্দুতে বলে যে, তুমি আমাকে বাবা বোলোনা, আমি

তোমার ভাই আর তুমি আমার মায়ের পেটের বোন। এই কথা কয়টি বলে আমার হাত ধরে জোর করে পরবর্তী বাড়ী হারু কবিরাজের পাকের ঘরে ঢুকে পড়ে। তৎপর আমার উপর পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ করে। আমার শরীরের উপরে অমানুষিক উপায়ে ধর্ষণ ও মর্দন করতে আরম্ভ করে দেয়। আমি তখন অচৈতন্য অবস্হায় মাটিতে পড়ে থাকি। খান পিশাচ তার কাম বাসনা তৃপ্তি করে অপরাপর খান সেনাদের তাদের কাম বাসনা চরিতার্থ করার জন্য হুকুম দেয়। এই সংবাদ শুনে খান কুকুরদের আরও চারজন আমার কাছে এসে পড়ে। আমাকে তারা আরও বলে যে, তোমার স্বামী কোথায়, সে নাকি মুক্তি ফৌজ, সে নাকি লুট করেছে? অবশ্য সব কথা উর্দুতে জিজ্ঞাসা করে।

তখন আমি বলি যে, না না, সব মিথ্যা কথা, বাবা আমার স্বামী ওসব কিছুই করে নাই বা সে কোন মুক্তি ফৌজ নয়। তখন খান দস্যুরা আমার ঘরের ভিতর ঢুকে তল্লাশী চালায়। ঘরে ঢুকে কোন রকম লুটের মালপত্র তারা দেখতে পায় না। তারা শুধু তামাক ও তামাক তৈরীর মসলাদি দেখতে পায়। কারণ আমার স্বামী একজন দরিদ্র তামাক ব্যবসায়ী। খান সেনারা আমাকে জানায় যে, তুমি এখানে থাক, আমরা বাইরে থেকে এখনি আস্‌ছি। তাদের কুমতলব বুঝতে পেরে আমি দুরে একটা বাড়ীর দিকে ছুটে যাই। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে আরও একদল খানসেনা একটি হিন্দু মেয়েকে জোর করে টানাটানি করছে তাদের কাম বাসনা মিটানোর জন্য ঐ দেখে আমি আরও দুরের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেই। তারপর দেখতে পেলাম খান সেনারা ধীরে ধীরে তাদের স্পীড বোটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এর পর পরই তারা বাজার ছেড়ে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়।

টিপসহি/-
মনোয়ারা খাতুন।

রেবা রাণী নাথ
ডাক ও থানা ঃ ডুমুরিয়া
জেলা ঃ খুলনা

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃঃ ২৩৬-২৩৭)

জুন মাসের শেষের দিকে আমরা পাথরঘাটা হয়ে ভারতে যাচ্ছিলাম । দলে ছিলাম প্রায় ৮/১০ হাজার লোক, সবাই আমরা ভারতে যাব। রাত থেকে সকালে ৮/৯টার দিকে আমরা যাহোক কিছু রান্না বান্না করেছি এমন সময় ৩/৪ গাড়ী মিলিটারী আসে। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা গুলি চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করে। এবং বহু লোককে ধরে গাড়ীতে তোলে। প্রত্যেক গাড়ীতে ১৫/২০ জন করে মেয়েদের তুলে নেয়। ওখানেই অনেকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। পাকঘাঁটি ঝাউডাঙ্গাতে আমাদের নিয়ে যায়। ছেলেগুলিকে একজায়গায় করে গুলি করে সবাইকে হত্যা করে শুধু আমাদেরকে নিয়ে যায়। ওখানে গিয়ে ৫০/৬০জন মেয়েকে দেখলাম বিভিন্ন জায়গার, ঝাউডাঙ্গারও অনেক মেয়ে দেখলাম। অনেক

কলেজে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়েকে দেখলাম।

পাকসেনারা আমাদের ৪/৫দিন রাখে। ওখানে ৩/৪টি তাঁবু ছিল। এক একটি সীটের কাছে ২/৩টি মেয়ে নিয়ে এসে রাখতো। পাকসেনারা জোর করে ধরলে দুটি মেয়ে কিছুতেই তাদের শিকার হতে চায় না। তখন পাকসেনারা ভীষণভাবে দৈহিক পীড়ন করে গুলি করে হত্যা করে। পাকসেনারা একদল সবসময় ঘরে থাকতো, অপরদল আসা পর্যন্ত আমাদের উপর অত্যাচার চালাতো।

আমি যে তাঁবুতে ছিলাম সেখানে ১৫/১৬টি মেয়ে ছিল। সীট ছিল ৮/১০টি। পাকসেনারা যখন তখন আমাদের উপর দৈহিক পীড়ন চালাতো। প্রায় সব সময় বিভিন্ন স্হান থেকে পাকসেনারা আসতো আর আমাদের উপর আত্যাচার চালাতো। পাকসেনারা বলতো বাংলাদেশ হবেনা, তোমাদের আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে, জোর করলে গুলি । আমাদের উপর একই সময় ৫/৭টি করে পাকসেনা অত্যাচার চালাতো। বিভিন্নভাবে তারা তাদের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। আমাদের ৪ দিনের মধ্যে ১ দিন ভাত দিয়েছিলো। একজনের সাথে অপরজনের কথা বলতে দিন না। আমরা ওখানে হিন্দু মেয়ে বেশী ছিলাম কিন্তু সবাই আমরা মুসলমান বলে পরিচয় দিই। আমাদের গায়ে ব্লাউজ রাখতে দিত না। সবাইকে কেবল শাড়ী পরিয়ে রাখতো।

আমার থাকতে আরও প্রচুর মেয়েকে ধরে আনে। পাকসেনেরা তখন আমাদের রাজাকারদের হাতে তুলে দেয়। প্রত্যেক রাজাকার এক একজনকে নিয়ে যায়। আমাকে এক রাজাকার তার বাড়ীতে নিয়ে যায়।

৩/৪দিন রাজাকারটি আমার উপর অত্যাচার চালায়। রাজাকারটির বৌ এবং মা নিষেধ করলে গুলি করতে যেতো। এরপর ওখান থেকে রাজাকারের মা এবং বৌয়ের সহায়তায় পালিয়ে ভারতে চলে যাই। সেখানে গোল পুকুর ক্যাম্পে থাকতাম। দেশ স্বাধীন হলে দেশে ফিরে আসি। আমি তখন ৭/৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম।

আমি নারী পুর্নবাসন কেন্দ্রে আবেদন করি সমাজকল্যান দপ্তরের মাধ্যমে। ওরাই আমার চিকিৎসা এবং কাজের ব্যবস্হা করেন।

স্বাক্ষর/-
রেবা রাণী নাথ
২৫/৭/৭৩

ইব্রাহিম ভূইয়া
লাইব্রেরীয়ান, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড, পৃ ঃ ১৮)

১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমি গ্রামের বাড়ী যাওয়ার জন্য ঢাকা সদরঘাটের দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। সদরঘাট টার্মিনালের প্রবেশ পথে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনাদের প্রহরায় মোতায়েন দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে এক অতি বৃদ্ধ

ভদ্রলোক মুন্সিগঞ্জ যাওয়ার জন্য টার্মিনালে আসলেন। সঙ্গে তার নবপরিণিতা পুত্রবধু এবং যুবতী মেয়ে ছিল। পাঞ্জাবী সেনারা আমাদের সবাইকে তল্লাশি করতে বললো "ইয়ে দো আওরাত নাহি যায়েগী"। বৃদ্ধ নিরুপায় হয়ে কান্নাকাটি করে সামনে যাকে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন, "আপনারা আমার মেয়ে ও পুত্র বধুকে বাঁচান।" কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিল না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেই অসহায় যুবতী মেয়ে দুজন রক্ষা করার জন্য কোন কথা বলতে পারি নাই, কিছুই করতে পারি নাই। আমাদের সকলের চোখের সামনে পাঞ্জাবী সেনারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যুবতী মেয়ে দু'টিকে টেনে হেঁচড়িয়ে ওদের আর্মী ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল।মেয়ে দু'টি এ সময় করুণ আর্তনাদে ভেঙ্গে পড়েছিল। দু'ঘন্টা পর আবার যুবতী মেয়ে দু'টিকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। দেখলাম মেয়ে দুটির চলার কোন শক্তি নাই, এলোমেলো চুল, অশ্রু ভরা মুখমন্ডল। আমরা লঞ্চে রওনা হয়ে গেলাম। 'পাগলার' এম, এম ওয়েল পাক আর্মী ঘাটিতে আমাদের লঞ্চ আটকিয়ে তল্লাশি চালানো হয়-পাক সেনারা যাত্রীদের মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। লঞ্চে দাড়িয়ে আমার দেখলাম-ওদের কামড়ার জানালার সন্মুখে চারটি বাঙ্গালী যুবতী মেয়ে এলোমেলো চুলে করুণ ও অসহায় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। জানালা দিয়ে তাদের দেহের যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হলো তাদেরকে বিবস্ত্র করে রাখা হয়েছে। বুড়ীগঙ্গা নদীতে ১৫-২০ জন করে এক সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা বাঙ্গালী যুবকদের বহু লাশ ভাসতে দেখলাম ।

১৯৭১ সনের অক্টোবর মাসের এক দিন আমি বাড়ীতে ছিলাম। সকাল নয়টার সময় আমি বাগড়া বাজারে গিয়েছিলাম বাজার করতে। বহু লোকের সমাগম ছিল। বাজারের দক্ষিণ দিকে পদ্মা নদী। পূর্বের দিন সন্ধ্যায় পাক সেনাদের নোঙ্গর করা স্টিমারটি পদ্মার ঘাট ছেড়ে চলে যাচ্ছিল- স্টিমারের চারিদিকে সশস্ত্র পাক সেনারা প্রহরায় মোতায়েন ছিল। অকস্মাৎ দেখলাম পাক সেনারা স্টিমার থেকে সজোরে টেনে একটি লাশ ফেলে দিচ্ছে-স্টিমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর আমরা নৌকা নিয়ে গিয়ে দেখলাম এক ক্ষত বিক্ষত যুবতীর বীভৎস উলঙ্গ লাশ। এছাড়া কাশবনের পাড়ে পড়ে আছে ফুলা বীভৎস লাশের গালে ও দেহের অন্যান্য স্থানে ক্ষত চিহ্ন দেখলাম। তাঁর ডান দিকের স্তনের বোটা তুলে নেওয়া হয়েছে।

স্বাক্ষর/-ইব্রাহিম ভূইয়া
৮/৬/৭৪

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
কেউ পাশবিকতা থেকে অব্যাহতি পায়নি।	দৈনিক আজাদ	৮ মার্চ, ১৯৭২

(দলিলপত্র ৮ম খন্ড পৃ ঃ ৫৬৭)

বারো বছরের কচি কিশোরী কিংবা পঞ্চাশের বৃদ্ধা

কেউ পাশবিকতা থেকে অব্যাহতি পায়নি

॥ আবুল হোসেন মীর ॥

'উধার আটঠো লাশ হ্যায়। কুওাছে খিলানা হ্যায়, খিলাদো। আউর না কিসিকো দেনা হ্যায় দে দো। যাও, যো তোমহারা মর্জি করো।"

পাক জল্লাদদের কথাগুলো অবিকল মনে রেখেছেন আমির হোসেন। ঠিক তেমনি মুখ বিকৃত করে শব্দগুলো শোনালেন আমাদের। ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছেড়ে আমরা পশ্চিম দিকের মনোহরপুর গ্রামে গিয়ে উঠতেই দেখা হয়েছিল আমির হোসেনের সাথে। আমির হোসেন মুক্তি বাহিনীকে গোপনে তথ্য সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পাক বাহিনীর হাতে ধরাও পড়েন। দীর্ঘ চারমাস হানাদারদের নরকে কাটাবার পর সৌভাগ্যক্রমে ছাড়া পেয়ে যান। ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফেরার পথে গাঁয়ের বিসু মন্ডলের বাড়ীর কাছে দেখা হয় একদল দস্যুর সাথে। সেই দস্যুদের একজন আমির হোসেনকে শোনায় উপরোক্ত কথাগুলো। তিনি ক পা এগুতেই সত্যি সত্যিই দেখতে পান হাত পা বাঁধা উলঙ্গ অবস্থায় আটটি মরদেহ। তাদের কারো কারো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা। বিমূঢ় আমির হোসেন দেয়ালটা ভেঙ্গে লাশগুলো মাটিচাপা দিয়ে চলে যান আপন ঘরের দিকে। নীল বেদনার্ত হৃদয়ে।

আমির হোসেনের কাছ থেকে জানা গেল ক্যান্টনমেন্টের অসংখ্য হত্যাযজ্ঞের কাহিনী। তিনি বললেন, সেভেন ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের ও, সি লেঃ কর্ণেল আব্দুল হাইয়ের লাশ হত্যার দু'দিন পর আনা হয় সি, এম, এইচ এ। তাঁর লাশ পাওয়া যায় গ্যারিশন সিনেমা হল সংলগ্ন পশ্চিম দিকের তালতলায়। তাঁর তলপেটে সতেরটি বুলেটের চিহ্ন ছিল। এই কোম্পানীর কোয়ার্টার মাষ্টার ক্যাপ্টেন শেখের ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটেছিল।

আমির হোসেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আরো জানালেন, সি-এম-এইচ-এর নার্সিং ষ্টাফ হাবিলদার আব্দুল খালেক এবং তার সঙ্গী ফজর আলী ও একজন সুবেদার এম, আই রুমে ঔষধ আনতে যাওয়ার পথে রানওয়ের নিকটবর্তী দরজার কাছে ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের সিপাইরা তাদেরকে গুলী করে হত্যা করে। এ ছাড়া সি-এম-এইচের মসজিদের ইমামকেও তারা গুলী করে হত্যা করে। হত্যা করার আগে দস্যুরা ইমাম সাহেবকে কলেমা পড় বললে তিনি শ্রদ্ধার সাথে পবিত্র কলেমা আবৃত্তি করে শোনান। কিন্তু জনৈক দস্যু মুখ বিকৃত করে বলে, শালা গদ্দার এক মাওলানা কলেমা ভী পড়নে নেহী স্যাক্তা।

আমির হোসেন জল্লাদদের নরহত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কে বললেন, বাঙ্গালীদের ধরে এনে প্রথমে আই, এস, আই, অতঃপর সেখান থেকে ৬১৪ এম, আই, ইউ এবং পরে ৪০৯ জি, এইচ, কিউএ পাঠিয়েদেয়া হতো। ৬১৪ এফ, আই, ইউতেই নাকি জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। এম, ই, এসের জনৈক কর্মচারী হারেছ উদ্দীন জানান যে, ৩০শে মার্চ তিনি গ্রেফতার হন।

১৪ দিন ধরে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে পাক সেনাবাহিনীর জল্লাদেরা তার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়।

হারেছ উদ্দীনের কাছ থেকে ক্যান্টনমেন্টে অবস্হানরত তৎকালীন সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী কর্মচারীদের পরিবারের মহিলাদের একটি বন্দী শিবিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সে জানিয়েছে যে, ৫৫ নং ফিল্ড রেজিমেন্টে আর্টিলারীর ফ্যামিলী কোয়ার্টারের বারো থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের দু'শ পচানব্বই জন মেয়েকে ঐ সময় আটক করে রেখে প্রতিদিন রাতে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হতো। তিনি আরো জানান যে, তাদের সেলটি কিছুটা দূরে হলেও প্রতিদিন রাতেই ভেসে আসতো মেয়েদের করুণ আর্তনাদ। সেই সাথে বর্বর পাক সেনাদের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি বাতাসের সঙ্গে মিশে এক মর্মবিদারী দৃশ্যের সৃষ্টি করতো।

প্রতিদিন বিকেলে জনৈক সুবেদার এসে এইসব মেয়েরা কে কোথায় যাবে তারই একটি তালিকা প্রস্তত করে যেতো। অতঃপর সন্ধ্যা হলেই উক্ত লিষ্ট মোতাবেক নির্ধারিত মেয়েটিকে পাঠানো হতো নির্ধারিত স্হানে। কখনো কখনো আপন খেয়াল খুশীতে বাইরে নিয়ে এসে পাহারারত কুকুরের দল উপর্যুপরি নারী ধর্ষণে লিপ্ত হতো। একদিন একটি মেয়েকে এইভাবে পরপর চৌদ্দজন নির্যাতন চালালে মেয়েটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। কিন্ত তবুও দুর্বৃত্তরা তাকে রেহাই দেয়নি। অচৈতন্য অবস্হায়ই নিজেদের লালসা চরিতার্থ করেছে। মেয়েটির পুনরায় জ্ঞান ফিরে আসতে নাকি ৩৬ ঘন্টা সময় লেগেছিল। জনাব হারেছ বলেন, চৌদ্দদিন পর তাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর ঐ মহিলা বন্দী শিবিরের বাসিন্দাদের পরিণতি সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে পারেন না।

অপর একটি মহিলা শিবিরের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর জেলখানা থেকে পুনরায় তাকে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে আসা হলে সেখায় এফ, আই, ইউ-এ তার উপর নতুনভাবে নির্যাতন করা হয়। সেখানে তিনি ১২নং এফ, আই, ইউ ব্যারাকের ১০নং রুমে বহু মহিলাকে বন্দী অবস্হায় দেখতে পান। প্রতিরাতে ঐ ঘর থেকে তাদের চীৎকার শুনা যেতো। এবং একই উপায়ে তারা পাশবিক নির্যাতন চলাতো। এইসব মেয়েদের যৌবন সাধারণত ঃ অফিসাররাই উপভোগ করতো। এ সম্বন্ধে হারেছ উদ্দীন আরো বলেন বন্দীশিবিরের মহিলাদের সাধারণত ঃ তিন ভাগে ভাগ করে রাখা হতো। প্রথম ভাগে ছিল যুবতী, দ্বিতীয় ভাগে মধ্যবয়সী এবং তৃতীয় ভাগে কয়েক সন্তানের মাতা। তিনি স্কুল কলেজের সুন্দরী মেয়েদের প্লেনে করে ঢাকা পাঠাতেও দেখেছেন।

হারেছ উদ্দীনের বর্ণনা থেকে আরো অনেক তথ্য জানা যায়। দখলদাররা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আন্ডার গ্রাউন্ড সেল তৈরী করেছিল। যশোর পতনের পর ঠিক এমনি একটি সেল থেকে ১১৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল। সবাই জীবিত অবস্হায় থাকলেও তাদের মধ্যে প্রাণ ছিলোনা বললেই চলে। আলো বাতাস ও খাদ্যের অভাবে মাংসহীন হয়ে তাদের শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল। হাডডি কংকালসার দেহগুলি অসহ্য নির্যাতনের জ্বালা বহন করে এনেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দানবীর নূতনচন্দ্র সিংহও বাঁচতে পারেনি।	দৈনিক বাংলা	১৩ এপ্রিল, ১৯৭২

(দলিলপত্র ৮ম খন্ড পৃ ঃ ৫৭৬)

দানবীর নূতনচন্দ্র সিংহ ঃ গতবছর এই দিনে খান সেনারা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল

তাঁর একমাত্র ইচ্ছে ছিল তিনি যেনো দেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। সে ইচ্ছা তাঁর পূরণ হয়েছে। দেশের মাটিতে তিনি মরতে পেরেছেন। তবে বড় নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁকে-কখনো কেউ যা কল্পনাও করেনি।

গত বছর এই ১৩ই এপ্রিল চট্টগ্রামের অদূরে নিজের হাতে গড়া কুন্ডেশ্বরী ভবনে তাঁকে হত্যা করা হয়। কুন্ডেরশ্বরী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা বাবু নূতন সিংহের কথা বলছি। এপ্রিলের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম শহরের পতন হয়েছিল। ১৩ তারিখে পাক বাহিনী কুন্ডেশ্বরী আক্রমন করে। বাবু নূতন সিংহ তখন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪৭ জন অধ্যাপক সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে। সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ এ, আর, মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ কোরাইশী প্রমুখের নাম উল্লেখ যোগ্য। চট্টগ্রাম থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে জনাব এম, আর, সিদ্দিকীও কুন্ডেশ্বরীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

পাক বাহিনীর অগ্রগতির খবর শুনে সবাই কুন্ডেশ্বরী ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। বাবু নূতন সিংহকে যাওয়ার কথা বললে তিনি রাজী হননি। বলেছিলেন, যদি মরতে হয় দেশের মাটিতেই মরব। অনেক পীড়াপীড়ির পরও তাকে রাজী করান গেল না। এদিকে পাকবাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসছিল। ১৩ই এপ্রিল পাকবাহিনী কুন্ডেশ্বরী ভবনে প্রবেশ করে।

ছেলেরা আগেই পালিয়ে গিয়াছিল। বাবু নূতন সিংহ তখন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন। জনৈক সালাহউদ্দীন তাঁকে সেখান থেকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এসেছিল। তাঁর চোখের সামনে মন্দির উড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁরপর তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল নৃশংসভাবে। মেজর তিনটি গুলি করার পরও সালাহউদ্দীন রিভলবারের গুলি ছুঁড়েছিল নুতন বাবুর দিকে। তিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন। তেমনি মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন তিন দিন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'বর্বরতার রেকর্ড'	দৈনিক আজাদ	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

বর্বরতার রেকর্ড

॥ রহিম আজাদ প্রদত্ত ॥

বরিশাল ঃ 'মহাদেবের জটা থেকে' নয় বাংলা মায়ের নাড়ী ছিঁড়ে জন্ম দিয়েছিলেন যে সোনার মেয়ে সে ভাগীরথীকে ওরা জ্যান্ত জীপে বেঁধে শহরের রাস্তায় টেনে টেনে হত্যা করেছে। খান দস্যুরা হয়তো পরখ করতে চেয়েছিল ওরা কতখানি নৃশংস হতে পারে। বলতে হয় এক্ষেত্রে ওরা শুধু সফলই হয়নি, বর্বরতার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

অষ্টাদশী ভাগীরথী ছিল বরিশাল জেলার পিরোজপুর থানার বাঘমারা কদমতলীর এক বিধবা পল্লীবালা। বিয়ের এক বছর পর একটি পুত্র সন্তান কোলে নিয়েই তাকে বরণ করে নিতে হয় সুকঠিন বৈধব্য।

স্বামীর বিয়োগ ব্যথা তাঁর তখনও কাটেনি। এরই মধ্যে দেশে নেমে এল ইয়াহিয়ার ঝটিকা বাহিনী। গত মে মাসের এক বিকালে ওরা চড়াও হলো ভাগীরথীদের গ্রামে। হত্যা করলো অনেককে যাকে যেখানে যেভাবে পেলো।

এ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের মধ্যেও ভাগীরথীকে ওরা মারতে পারলোনা। ওর দেহলাবণ্য দস্যুদের মনে যে লালসা জাগিয়েছিল তাতেই হার মানল তাদের রক্ত পিপাসা। ওকে ট্রাকে তুলে নিয়ে এল পিরোজপুরে। তারপর ক্যাম্পে তার উপর চালানো হলো হিংস্র পাশবিক অত্যাচার।

সতী নারী ভাগীরথী। এ পরিস্থিতিতে মৃত্যুকে তিনি একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতেই এক সময় এল নতুন চিন্তা - হ্যাঁ মৃত্যুই যদি বরণ করতে হয় ওদেরইবা রেহাই দেব কেন?

ভাগীরথী কৌশলের আশ্রয় নিল এবার। এখন আর অবাধ্য মেয়ে নয় দস্তুরমত খানদের খুশী করতে শুরু করল, ওদের আস্থা অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলো।

বেশীদিন লাগলোনা, অল্প ক'দিনেই নারী লোলুপ ইয়াহিয়া বাহিনী ওর প্রতি দারুণ আকর্ষণ অনুভব করল। আর এই সুযোগে ভাগীরথী ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে শুরু করল পাক বাহিনীর সব গোপন তথ্য।

এক পর্যায়ে বিশ্বাস ভাজন ভাগীরথীকে ওরা নিজের ঘরেও যেতে দিল। আর কোন বাঁধা নেই। ভাগীরথী এখন নিয়মিত সামরিক ক্যাম্পে যায় আবার ফিরে আসে নিজ গ্রামে।

এরই মধ্যে চতুরা ভাগীরথী তাঁর মূল লক্ষ্য অর্জনের পথেও এগিয়ে গেল অনেকখানি। গোপনে মুক্তি বাহিনীর সাথে গড়ে তুলল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

এরপরই এল আসল সুযোগ। জুন মাসের একদিন ভাগীরথী খান সেনাদের নিমন্ত্রণ করলো তাঁর নিজ গ্রামে। এদিকে মুক্তি বাহিনীকেও তৈরী রাখা হলো যথারীতি। ৪৫ জন খান সেনা সেদিন হাসতে হাসতে বাগমার কদমতলা এসেছিল

কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৪/৫ জন ক্যাম্পে ফিরতে পেরেছে বুলেটের ক্ষত নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে। বাকিরা ভাগীরথীর গ্রামেই শিয়াল কুকুর শকুনের খোরাক হয়েছে।

এরপর আর ভাগীরথী ওদের ক্যাম্পে যায়নি। ওরাও বুঝেছে, এটা তারই কীর্তি। কীতিমানরা তাই হুকুম দিল জীবিত অথবা মৃত ভাগীরথীকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

কিন্তু ভাগীরথী তখনও জানতোনা ওর জন্য আরও দুঃসহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষ্য করছে। একদিন রাজাকারদের হাতে ধরা পড়লো ভাগীরথী। তাকে নিয়ে এল পিরোজপুর সামরিক ক্যাম্পে।

খান সেনারা এবার ভাগীরথীর উপর তাদের হিংস্রতার পরীক্ষার আয়োজন করলো। এক হাটবারে তাকে শহরের রাস্তায় এনে দাঁড় করানো হলো জনবহুল চৌমাথায়। সেখানে প্রকাশ্যে তার অঙ্গাবরণ খুলে ফেলল কয়েকজন খান সেনা। তারপর দু'গাছি দড়ি ওর দু'পায়ে বেঁধে একটি জীপে বেঁধে জ্যান্ত শহরের রাস্তায় টেনে বেড়াল ওরা মহাউৎসবে। ঘন্টাখানেক রাজপথ পরিক্রমার পর আবার যখন ফিরে এল সেই চৌমাথায় তখনও ওর দেহ প্রাণের স্পন্দন রয়েছে।

এবার তারা দু'টি পা দু'টি জীপের সাথে বেঁধে নিল এবং জীপ দু'টিকে চালিয়ে দিল বিপরীত দিকে। ভাগীরথী দু'ভাগ হয়ে গেল। সেই দু'ভাগে দু'জীপে আবার শহর পরিক্রমা শেষ করে জল্লাদ খানরা আবার ফিরে এল সেই চৌমাথায় এবং এখানেই ফেলে রেখে গেল ওর বিকৃত মাংসগুলো।

একদিন দু'দিন করে সে মাংসগুলো ঐ রাস্তার মাটির সাথেই একাকার হয়ে গেল এক সময়। বাংলা মায়ের ভাগীরথী এমনি ভাবে আবার মিশে গেল বাংলার ধুলিকণার সাথে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রমনা পার্কের বধ্যভূমি	দৈনিক বাংলা	৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

রমনা পার্কের বধ্যভূমি ঃ

ক্ষয়ে যাওয়া পোষাক দেখে কি
তাদের সনাক্ত করা যাবে ?
॥ হাসিনা আশরাফ ॥

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৪৮৩)

রমনা পার্কের উত্তর পূর্ব কোণটা কি পাক সামরিক চক্রের কোন বধ্যভূমি অথবা সমাধিস্থল ? রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্হলে অবস্হিত রমনা পার্কের উত্তর কোণটায় যেদিকে ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট হাউসের সীমানা শুরু হয়েছে, তার থেকে কিছুটা ভেতরের দিকেই এটি অবস্থিত। পুরো জায়গাটাই প্রায় জুড়ে রয়েছে, বেগুনী বর্ণের বোগেন ভিলা বা বাগান বিলাসের রঙিন কুঞ্জ।

এই ঝোপটির নীচে বড় বড় কয়েকটি গর্তে এবং পাশের উচু নীচু স্হানে ইতস্তত ঃ ছড়িয়ে রয়েছে নরকংকালের অস্হি এবং মাথার খুলি। মাটির সাথে সমান হয়ে ছড়িয়ে আছে হঠাৎ দেখলে বোঝা যায়না। জায়গাটা যে সত্যিকার কতখানি বিস্তৃত বার থেকে তা আজ বুঝার উপায় সেই।

তবে এখানকার অনেকেই জানিয়েছে যে, পশুরা অসংখ্য মানুষকে ট্রাকে করে প্রেসিডেন্ট হাউসের মধ্যে নিয়ে হত্যা করার পর গর্তের মধ্যে পুতে রাখতো।

বৃষ্টির পানিতে গর্তগুলো যখন ভরে যায় তখন পানির সাথে সাথে কতকগুলো আধপঁচা লাশ এবং সঙ্গে অসংখ্য স্কুল, কলেজের বই ভেসে উঠত। এসব লাশের মধ্যে কয়েকটি লাশের লম্বা চুল এবং দেহের গঠন দেখে মহিলা বলে চেনা গিয়েছিল। রমনা পার্কের নির্ভৃত এই প্রান্তে কোন্ হতভাগা ভাইবোনদের সমাধি স্হল যে রচিত হয়েছিল কংকালের অস্হি আর ভগ্ন খুলির মাঝে আজ তা জানা যাবে না।

তবে প্রশ্ন জাগে মনে এরা কি সেই হতভাগা পুলিশ ভাইদের কেউ, যারা অসহযোগ আন্দোলনের সময় দস্যু ইয়াহিয়াকে পাহারা দেবার জন্য প্রেসিডেন্ট হাউসে নিযুক্ত হয়েছিল; প্রশ্ন জাগে মনে, এরা কি সেই ছাত্র ভাইদের কেউ, যারা শুধু দেশ প্রেমের শপথ নিয়ে জীবন্ত আত্মার তাগিদে শুন্য হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল জল্লাদ পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ?

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূমি	দৈনিক বাংলা	১৯ জানুয়ারী, ১৯৭২

রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূমিঃ শিক্ষক শ্রমিক ছাত্র কিষাণ কিষাণীর অতলান্ত সেই রক্তস্রোত

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৪৮৭-৪৮৯)

"আবার গোলযোগ হলে আমাদের পালানোর জায়গা আছে। ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেবো, বেঁচে যাবো। ভাই, আপনারা যাবেন কোথায়? আপনাদের যে আর কোন পথ রইলোনা।" প্রিয় মুসলিম সহকর্মিদের জন্য অকৃত্রিম সমবেদনায় সহকারী অধ্যাপক রেজাউল হককে এই কথাগুলো বলেছিলেন বরিশাল জেলার অধিবাসী অধ্যাপক রামকৃষ্ণ অধিকারী। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে। আইয়ুবের যোগ্যতর উত্তরসুরি রক্ত পিপাসু নয়া সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন জারীকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

কিন্তু না। অধ্যাপক অধিকারী পালাতে পারেননি। বাচাঁতেও পারেননি তার প্রাণ। তার এই তৎপর্যবহ মন্তব্যের সাক্ষী দেওয়ার জন্য সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক রেজাউল হক আজও বেঁচে আছেন। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর আক্রমন শুরুর পর অধ্যাপক অধিকারী পালিয়ে ছিলেন। গাইবান্দা

মহকুমার সুন্দরগঞ্জে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় অপর সহকর্মি অধ্যাপক আবুল কাশেমকে বলেছেন টাকা পয়সা নেওয়ার জন্য কেউ যদি মেরে ফেলে তাদের হাতে মরতেও রাজী আছি। কিন্তু বর্বর খানসেনাদের হাতে নয়। বেতন নেওয়ার জন্য রংপুরে এসেছিলেন। কিন্তু বেতন নিয়ে আর ফিরে যেতে পারেননি।

১৯৭১ সালের ৩০শে এপ্রিল। রংপুর কারমাইকেল কলেজের ২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে দমদমার পুলের নীচে তার অপর তিন সহকর্মি রসায়নের লেকচারার কুমিল্লার শ্রী কালিচাঁদ রায় ও তার পিতা, দর্শণের লেকচারার বরিশালের শ্রী সুনিল বরণ চক্রবর্তী ও গণিতের লেকচারার বরিশালের শ্রী চিত্তরঞ্জন রায়ের সাথে খুনি পাক সেনাদের গুলিতে প্রাণ হারান।

বাড়ী গিয়েই রেহাই নেই

রংপুর কারমাইকেল কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শাহ মোহাম্মদ সোলায়মান দিনাজপুরে তার গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। গ্রামের বাড়ী থেকেই সেনাবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তাঁর আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি।

তিনি কাজে যোগ দিতে পারেননি

রসায়নের লেকচারার কুড়িগ্রাম মহকুমার নাগেশ্বরীর অধিবাসী জনাব আব্দুর রহমান মে মাসের শেষ দিকে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কাজে যোগ দেওয়া আর হয়নি। তখন হয়ত এ দু'জন অধ্যাপককে হত্যা করেছে। খান সেনাদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন রংপুর শহরের বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ও রাজনৈতিক নেতা জনাব ইয়াকুব মাহফুজ আলী।

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে রংপুরের শ্মশান ঘাটে তার সাথে আরো ১০ জনকে এক সঙ্গে হত্যা করা হয়েছে এক দিনে।

আর পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পূর্ব মূহুর্তে ১২ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের কোন এক সময়ে রংপুর বার এর বিশিষ্ট আইনজীবি একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী রংপুর জেলা ন্যাপের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী শিবেন মুর্খাজীকে সম্ভবতঃ হত্যা করা হয়েছে। শেষ দিকে তিনি দিনাজপুরে জেলে ছিলেন। ১১ই ডিসেম্বর তাকে মুক্তি দেওয়ার নাম করে দিনাজপুর জেল থেকে বের করে আনা হয়। তারপর আর শিবেন বাবুর কোন খোঁজ মেলেনি।

কত যে বধ্যভূমি

গোটা জেলায় প্রতিটি শহরে মহকুমায়, থানার আনাচে কানাচে, কত যে বধ্যভূমি আছে তার অন্ত নাই। বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ নয়, যেখানে শতশত এমনকি হাজার হাজার লোককে মেরেছে এমন বধ্যভূমি গুলির মধ্যে উল্লেখ করার মত রংপুর শহরও সদর মহকুমার নবিরহাট, জাফরগঞ্জের পুল, নিশবেতগঞ্জ, শ্মশান ঘাট (রংপুর শহরের কাছে) সাহেবাজ্ঞ এবং রংপুর শহরের কাছে মডার্ন সিনেমা হলের পিছনে এবং দেবিপুর।

এসব এলাকায় মানুষের হাড়গোড় অসংখ্য পড়ে আছে। ভাল করে খনন করা হলে শতশত নয় হাজার হাজার মানুষের কংকাল খুঁজে পাওয়া যাবে। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে কুকুরণের বিলে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

গাইবান্ধা

এ ছাড়া গাইবান্ধা শহরের হেলাল পার্ক, লালমণির হাট, শহর, এবং সৈয়দপুরে হাজার হাজার নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুন্দর গানুর এলাকা থেকে বহু ঘরের মা, বোনদের ধরে এনে পাশবিক লালসা চরিতার্থ করে হত্যা করা হয়েছে। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্হিত উত্তম নামক স্হানের রিক্সা চালক আহাব উদ্দিন মডার্ন সিনেমা হলের পিছনের একদিনের হত্যাকান্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

গত নবেম্বর মাসের ৮ তারিখে আমি যখন রংপুর রেলষ্টেশনে আমার রিক্সার খোঁজ পাই তখন জুম্মাপাড়া নিবাসী পাক বাহিনীর জনৈক দালাল আমাকে ন্যাপের কর্মী হিসাবে দুস্কৃতকারী ও মুক্তি ফৌজ বলে পাক বাহিনীকে সনাক্ত করে দেয়। তখন পাক বাহিনীর জোয়ানরা আমাকে আটক করে রংপুর মডার্ন হলে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে ১৪দিন আটক করে রাখে। আটক অবস্হায় পাঞ্জাবী পুলিশ আমার দু'হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে আমাকে অমানুষিক অত্যাচার করে। তেরদিন পর আমাকে ও আমার সাথে আটক আরো ১৩জন লোককে যথাক্রমে লালমণির হাটের এক ক্ষত্রিয় মেয়ে জিনকি, মালেকা, গাইবান্ধার আলী হোসেন, ফারুক, পলাশ বাড়ীর আশরাফ আলী রংপুর উপশহরের রিক্সা চালক আলী ও অন্যান্য সবাইকে রাত্রি ১০ টার সময় মর্ডান হলের পিছনে নিয়ে যায়। আমার সামনে তিনজন পাঞ্জাবী পুলিশ (এদের মধ্যে আজমল খান নামক এক সুবেদার পরে মুক্তি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে) পরপর পাঁচজনকে যথাক্রমে জিনকি, মালেকা, আলী হোসেন, ফারুক ও আর একজনকে যার নাম জানিনা আমার সামনে জবাই করেছে। তখন আমি অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে প্রাণভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করি এবং পরে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাই।

যখন আমি মর্ডান হলে আটক ছিলাম তখন সেখানে ৩৪০ জন লোক ছিল। তাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে তা বর্ণনা করা যায়না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কংকালের মিছিল এখানে	দৈনিক সংবাদ	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নরপশু পাকসেনাদের ধ্বংসযজ্ঞের আর এক অধ্যায়ঃ কংকালের মিছিল এখানে

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৪৯১-৪৯২)

বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহাঙ্গন যেন এক একটি বধ্যভূমি। প্রতিটি ভিটা এক একটি শহীদ মিনার। পল্লীর শ্যামল দিগন্ত তাই বেদনায় মলিন। বিস্তৃত মাঠের

মাটি ঘাসে লেগে আছে শহীদের রক্ত। নরসিংদী শহরের অদূরে নরসিংদী তারাবো রাস্তার খাটারা পুলটিও হানাদার জল্লাদের একটি বধ্যভূমি। নর পিশাচরা এই সেতুটিকে পরিণত করেছিল নির্যাতন কেন্দ্রে ও বধ্যভূমিতে।

হায়েনার দল পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে তরুণ, তরুণী, ছেলে বুড়ো নির্বিচারে সকলকে ধরে নিয়ে আসতো এখানে। ওদের উপর চলতো নির্যাতন। নির্যাতনের পর্ব চুকলে তাদের হত্যা করে লাশগুলো পুলের আশে পাশে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হতো। হত্যালীলার নীরব সাক্ষী এই পুলের চারিদিকে বহু নর কঙ্কাল ও মাথার খুলি আজও ছড়িয়ে আছে।

ব্যাপক অনুসন্ধানে পাক বাহিনীর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন ও পাইকারী নর হত্যার অনেক মর্মন্তুদ কাহিনী প্রকাশ হতে পারে বলে সকলে মনে করেন। স্হানীয় সমাজ কর্মীরা অনুসন্ধান চালিয়ে ইতিমধ্যেই খাটারা পুলের আশে পাশের পতিত জমি থেকে বহু নর কঙ্কাল উদ্ধার করেছেন। এসব নর কঙ্কালের মধ্যে একটি কঙ্কাল জনৈক মহিলার বলে অনুমান করা হচ্ছে।

কঙ্কাল গুলোর আশে পাশে পাওয়া পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হত ভাগ্য ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তেমনি অনুমানের ভিত্তিতে ঐ কঙ্কালটি কোন যুবতীর বলে ধারণা হচ্ছে। কারণ কঙ্কালটির হাতে কাঁচের চুড়ি রয়েছে। আরো একটি কঙ্কাল সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে সেখানে। এই কঙ্কালটি শিবপুর থানার করার চর গ্রামের জনৈক ব্যক্তির। পোশাক পরিচ্ছদ দেখে আরো দুটি কঙ্কাল সনাক্ত করা হয়েছে। সম্ভব কঙ্কাল দুটি নরসিংদী মহাবিদ্যালয়ের নিখোঁজ দুজন হিন্দু অধ্যাপকের বলে উদ্ধারকারীরা ধারণা করেছেন। তাঁত বস্ত্রের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ সেখের চরের জনৈক সমাজকর্মী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান যে, বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবতীদের ধরে এনে হানাদার পাক সেনারা নরসিংদী টেলিফোন একচেঞ্জে নিজেদের পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতো। যারা নর পশুদের কাছে আত্মসমর্পণ করতোনা তাদের হত্যা করা হতো। তারপর সেই মৃতদেহের উপর পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে লাশগুলো ফেলে দেওয়া হতো।

এই একচেঞ্জেই নর পশুরা ক্যাম্প খুলেছিল। এখান থেকেই নরপশুরা দালালদের সাহার্য্যে রাতে গ্রামে হানা দিয়ে বাংগালী নর নারীদের ধরে আনতো। তারপর তাদের উপর চালাতো বর্বর অত্যাচার। নির্যাতন শেষে তাদের এই খাটারা পুলের কাছে এনে হত্যা করতো। পাঁচদোলাপুল ও খাটারাপুল ছাড়াও আরো কয়েকটি বধ্যভূমি রয়েছে নরসিংদীতে। সেগুলো হচ্ছে পুটিয়া পুল, সানখোলা পুল, খাসির দিয়া, রায়পুরা থানার হাটু ভাংগা, বাদুয়ার চর রেলপুল। এসব বধ্যভূমিতে কত বাঙ্গালী লাঞ্ছিতা ধর্ষিতা, মা বোনের বিদেহী আত্মা আজো হাহাকার করে ফিরছে তার হিসেব কেউ দিতে পারবেনা।

বাংলার মানুষদের হত্যা করে, তাদের বসত বাটি জালিয়ে, সম্পত্তি লুট করে কৃষকের গবাদি পশু জবাই করে, মাঠের ফসল বিনষ্ট করেই এসব নর পশুরা ক্ষান্ত হয়নি, তাদের ধ্বংস যজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়নি শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান,

এমনকি মসজিদ মন্দির গীর্জাও। স্যার কেজি গুপ্ত হাই স্কুলটিও এইসব বর্বর পশুরা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। জিনারদি এলাকার অবিভক্ত বাঙ্গালার কৃতী সন্তান স্যার কে, জি গুপ্ত ১৯১৯ সালে নরসিংদী তারাবো রাস্তার পাশে এই স্কুলটি স্হাপন করেন। তার নামানুসারেই স্কুলটির নামকরণ করা হয়। এই স্কুলের সন্নিকটে অবস্হিত পাঁচদোলাপুল। এখানেই ছিল নর পশুদের একটি ক্যাম্প। নরপশুরা নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, লুন্ঠন ও গণহত্যা চালাতো এখান থেকে। নর পশুদের জবাব দিচ্ছিলো মুক্তি বাহিনী। মাঝে মাঝে মুক্তি বাহিনী পাক সেনাদের আত্রুমন করে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতো। অতর্কিত আত্রুমণের জন্য মুক্তি সেনারা স্কুলটিকে ব্যবহার করতো বর্ম হিসাবে।

তাই পাক সেনারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে অগ্নি, সংযোগ করে। বর্তমানে এই স্কুলের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় ২০ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি এই সব অক্ষরজ্ঞানহীন পশুরা নষ্ট করে দিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আর এক বধ্যভূমি চট্টগ্রামের দামপাড়া	দৈনিক বাংলা	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

আর এক বধ্যভূমি চট্টগ্রামের দামপাড়া ঃ

ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী এখানে কয়েক হাজার লোক হত্যা করেছে।

॥নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৪৯৪-৪৯৫)

চট্টগ্রাম, ৩১শে জানুয়ারী। এই শহরের দাপাড়াস্থ গরীবুল্লা শাহ্‌র মাজারের পাশে একটি লোমহর্ষক বধ্যভূমি আবিস্কৃত হয়েছে। গত ৩০শে মার্চ থেকে জিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই বধ্যভূমিতে বর্বর পাক বাহিনী প্রায় কয়েক হাজার লোককে হত্যা করেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বধ্যভূমির স্হানটি আমাকে দেখিয়েছেন গরীবুল্লা শাহ্‌র মাজারের সংলগ্ন, দোকানদার নাসির আহমদ।

গত ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞের ষোল আনাই তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি তাঁর দোকানেই ছিলেন। নাসির আহমদ আমাকে বলেছেন, গত ৩০শে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অতিরিক্ত বৃষ্টির দিন ছাড়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় কড়া মিলিটারী পাহারায় পাঁচ থেকে ছয় ট্রাক বোঝাই লোক নিয়ে আসা হত।

এই হতভাগ্যদের চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকতো। তাদের বধ্যভূমিতে নামিয়ে দিয়ে ট্রাক গুলি চলে যেতো। এই হতভাগ্যদের মধ্যভূমিতে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হতো। তারপর অন্য একদল মিলিটারী ট্রাক নিয়ে বধ্যভূমিতে এসে লাশ গুলি ট্রাক বোঝাই করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেত।

নাসির আহমদ আমাকে আরো বলেছেন যে, নিয়মিত এই হত্যাযজ্ঞের শুরুতে লাশ পুঁতবার জন্য বধ্যভূমির পাশে একটি গভীর গর্ত খনন করা হয়।

মাত্র কয়েক দিনে লাশে এই গভীর গর্ত ভর্তি হয়ে গেলে সদ্য মরা লাশ গুলিকে ট্রাকে চড়িয়ে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার ব্যবস্হা করা হয়। আমার অনুরোধে নাসির আহমদ এই গর্তের মুখ থেকে সামান্য মাটি সরিয়ে পাঁচটি নরকংকাল উঠান। তাঁর মতে সেই গর্তে কমপেক্ষে পাঁচ হাজার নরকংকাল রয়েছে। এই লোমহর্ষক বধ্যভুমি চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। বধ্যভূমির চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে হতভাগ্যদের জামা-কাপড় জুতা প্রভৃতি। মাটিতে রয়েছে চাপ চাপ বিস্তর রক্তের দাগ যা প্রমাণ করেছে যে গত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এখানে কয়েক'শ লোককে হত্যা করা হয়েছে!

বধ্যভূমির পাশে হাঁটার সময়ে মাটিতে আমি গোটাদশ স্যুটও দেখতে পেয়েছি। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রেলওয়ে পোর্ট ট্রাষ্ট এবং অন্যান্য অফিসের যেসব হতভাগ্য অফিসার নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁদের অনেককেই এই বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়েছে। নাসির আহমদের মতে অত্যাচারের কালো দিন গুলোতে বর্বর পাক বাহিনী এই বধ্যভূমিতে কয়েক হাজার লোককে হত্যা করেছে। তিনি বলছেন যে, নিয়মিত এই হত্যাযজ্ঞের শুরুতে চোখ বাঁধা অবস্হায় বধ্যভূমিতে আনা এক দল লোককে গুলি করে হত্যা করলে গুলির আওয়াজে হতভাগ্যদের লাইন করে দাঁড়ানো অন্যদল মৃত্যু ভয়ে চীৎকার করতো বলে পরে রাইফেলে সাইলেন্সার লাগিয়ে গুলি করে মারার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

নিয়মিত এই লোম হর্ষক হত্যাকান্ডের আরও দুইজন সাক্ষী পাওয়া গেছে। এরা হচ্ছেন গরীবুল্লাহ শাহ্‌র মাজারের দারোয়ান আব্দুল জব্বার।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নাটোরের ছাতনীতে পাক বাহিনীর বর্বরতা।	পূর্বদেশ	৬ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নাটোরের ছাতনী মাইলায়ের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৫০৯-৫১০)

হাজার মাইলাইয়ের এক ছাতনী। বঙ্গবন্ধুর আহবানে সমগ্র বাংলার মানুষ যেমন সাড়া দিয়েছিল তেমনি ছাতনীর মানুষও সমস্বরে শ্লোগান দিয়েছিল ঃ শোষকের মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

আর এটাতেই সমগ্র বাংলার ধ্বংসের মতো ছাতনীর ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে পড়ে। "আমাকে তোমরা খুন করো, তার বিনিময়ে আমার গ্রামের মানুষকে বাঁচাও। তোমাদের খোদার কসম তোমরা আমার মানুষদের মেরোনা।" মৃত্যুমুখোযাত্রী ভাবশী গ্রামের মণি সরকার আর্তি করেছিলেন হানাদার পাক বাহিনীর সৈন্যদের নিকট। হানাদার বাহিনী তাকে হত্যা করেছে। নির্মমভাবে গায়ের চামড়া উঠিয়ে হত্যা করেছে। ছাতনীর হত্যা কান্ডের প্রত্যক্ষদর্শী যুবক আবুল কালাম কান্নাবিজড়িত কন্ঠে শোনাচ্ছিলেন ছাতনীর এ মর্মান্তদ কাহিনী। আবুল কালাম বললেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামের দু'মাস পর্যন্ত আমরা এদিক সেদিক

পালিয়ে ভালই ছিলাম।”

“হিন্দুদের আমরা পাহারা দিয়ে রাখতাম, কিন্তু এর মধ্যেও আমাদের অনেকবার লাঠি শোটা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হতো, কখন হয়তো নরপিশাচ অবাঙ্গালী জল্লাদের দল গ্রামে ঢুকে পড়ে। তাদের তিনবার যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে আসতে হয়। বিংশ শতকে হালাকুর বংশধররা তিনদিন পর সশস্ত্রে ছাতনী গ্রামকে আক্রমণ করতে আসে। গ্রামের মানুষ একত্রে খোদার নাম নিয়ে লাঠি শোটা নিয়ে দলে দলে তাদের তাড়া করে। হানাদার বাহিনী বিভ্রান্ত হয়েছে ঘটনা দেখে। তারা পিছু হঠেছে। কিন্তু অবাঙ্গালী পাকিস্তানী অসামরিক নাগরিকদের দ্বিতীয় পিতা, ধর্মের কুলাঙ্গার জল্লাদ হাফেজ আব্দুর রহমান এ পরাজয়কে অপমান মনে করলো।

তাই প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা প্রবল হলো তার। খুনের নেশাখোর এই জল্লাদ তাই পথ খুঁজতে চেষ্টা করেছে সর্বক্ষণ। আবার হেঁটেছে সেই পথে। বনকেলো ঘুরিয়ার মসজিদ থেকে টেনে বের করলো ১০৫ বছর বয়স্ক আওয়ামী লীগ সমর্থক বৃদ্ধ সৈয়দ আলী মুন্সীকে। ঘটনা ঘটলো ১৫ই জ্যৈষ্ঠে। সৈয়দ আলী মুন্সীর লাশ দেখলো ছাতনীর মানুষ। ওরা কাঁদলো। এর পরের ঘটনা সুপরিকল্পিত। ছাতনীর বর্তমানে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ৮২ বছরের নলীনিকান্ত বললেন ওরা রাতে এসে ছাতনী দিঘীর পাড়ে জমা হয়। রাত তখন প্রায় দুটো।

সকাল পাঁচটার দিকে গাঁ ঘিরে নেয়। ঘরে ঘরে ঢুকে সবাইকে বের করে হাত পিছনে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধের একমাত্র ছেলেকেও ওরা হত্যা করেছে। শিশুকেও হত্যা করতে ছাড়েনি। বৃদ্ধ বলছিলেন, ডাক্তার মনিরুদ্দিনের তিনটি বিবাহিত যুবক ভাইকেও ওরা হত্যা করে গেল। রুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ নলীনি কান্ত বললেন, পিশাচরা মেয়েদের উপর অত্যাচার করলো। লাখ লাখ অভিযোগ বর্বরদের এরূপ কাজের। এই গ্রামের আরেকজন যুবক আবুল কাশেম। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে বেঁচেছে সে। বলল ঃ যখন আমি বুকে হেঁটে জমির আইলের পাশ দিয়ে হানাদারদের চোখের বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন কয়েকজন যুবতীকে বিবস্ত্র অবস্হায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি।

আবার দেখলাম একটি বৃদ্ধ এবং ক'জন লোক পিছনে হাত বাঁধা মরে পড়ে আছে। ওরা সংখ্যায় ছিলো কমপক্ষে ২৫০ জনের মতো। ৫০ জনের মতো পাক বাহিনীর সৈন্য। অবশিষ্টরা ছোরা হাতে অবাঙ্গালী পিশাচ তারা ছাতনীর সমস্ত কিছু লুট করেছে, ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করে পুরুষদের হত্যা করেছে।

আবুল কালাম আমাকে বললেন, গ্রামের যে এলাকায় বেশী লোক হত্যা, নারী নির্যাতন হয়েছে সেদিকেরই এক ধানের জমিতে পানির মধ্যে নিজেকে আড়াল রেখে সবকিছু দেখেছেন তিনি। সৈন্যরা এসেছিল রাইফেল হাতে নিজের পোশাকে। অবাঙ্গালীরা সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরণে, ছোরা হাতে কালো মুখোশ ছিল হাফেজ জল্লাদের। তার অল্প কিছু দূরেই এক মহিলার কোলের শিশুকে ফেলে হানাদার বাহিনীর সৈন্য জমির ওপরে মহিলাকে অত্যাচার করলো। মহিলার শাশুড়ি শিশুটিকে

কোলে নিয়ে সরে গেল।

একটু পর গুলির আঘাতে শিশুটি নিস্তব্দ হয়ে গেল। গুলির শব্দ, শুধু শব্দ। সকাল পাঁচটা থেকে ন'টা। অত্যাচার হত্যার পাশবিকতার তান্ডবলীলা চললো। হাহাকার, আর্তচিৎকার। গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল আরো অন্য গ্রামের আত্মরক্ষা প্রয়াসী বহু পরিবার। সব একাকার হলো, ছাতনীর মাঠ, খালের পানির সঙ্গে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৪১ জন। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, মধ্য বয়সী। শুধু পুরুষদের বেছে বেছে হাত পিছনে বেঁধে গুলী করেছে বর্বররা। এভাবেই শতাব্দীর অভিশাপ মুসলিম কলঙ্ক পাকিস্তানী বর্বর শাসক নাটোরের ছাতনীকে লক্ষ মাইলাই-এ পরিণত করে গেছে।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
হাজার প্রাণের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী।	পূর্বদেশ	৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হাজার প্রাণের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী

॥এম এ খায়ের মিয়া ॥

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৫১৩-৫১৪)

লাকসাম ॥ কুমিল্লা

লাকসাম জংশনে দাঁড়িয়ে দক্ষিণে পশ্চিম দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলে দেয়াল ঘেরা সুবিশাল এলাকা জুড়ে কালো রং মাখা যে দ্বিতল প্রাসাদটি দেখা যাবে সেটি একটি সিগারেট ফ্যাক্টরী। কিন্তু তার নাম যা-ই থাকুক না কেন লাকসামবাসীরা এটাকে হত্যাপুরী বলেই জানে। বিগত নয়টি মাসে এই ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন কোণায় বিভিন্ন কক্ষে ও কোঠায় বিভিন্ন সেলে এবং ছাদে যে অত্যাচার, নারী ধর্ষণ এবং নির্বিচারে গণহত্যা চলেছিল তার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

দিনে রাতে যখন তখন লাকসাম থানার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে হানা দিয়ে গ্রাম বাংলার নিরীহ নারী-পুরুষদের ধরে এনে এবং লাকসাম জংশনে অপেক্ষমান ট্রেন থেকে যুবক-যুবতী ও যাত্রীদের ছিনিয়ে এনে এই হত্যাপুরীতে বর্বর খান সেনারা বিনষ্ট করেছে আনিত মা, বোনের ইজ্জত, বধ করেছে হাজার হাজার প্রাণ।

ট্রেন থেকে মহিলা যাত্রী আর গ্রাম থেকে পল্লীবালা ও কুলবধুদেরকে ছিনিয়ে এনে ওদের উলঙ্গ করে কারখানার ছাদের উপরে উঠিয়ে দু'হাত উপরে তুলে সারাদিন ভর রেলিংবিহীন ছাদের উপরে হাঁটতে বাধ্য করা হতো। কারখানার অনতিদূরে যাত্রীবাহী ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের ঐ ছাদের উপর দৃষ্টিপাত করতে নির্দেশ দেয়া হতো। এমনি ভাবে সারাদিনভর ধৃত মা-বোনদের বেইজ্জতি করে রাতে কারখানার বিভিন্ন কোঠায় নিয়ে মেজর গার্দিজি ও তার দোসররা মা-বোনদের উপর চালাতো পাশবিক অত্যাচার। নিজেরা তো মদ পান করতো, নারীদেরও মদ পানে বাধ্য করা হতো। চাবুকে আর চাবুকে এবং পাশবিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে রাত্রির গভীরতা ভেঙ্গে প্রায়ই ভেসে আসত মা বোনদের বুক ফাটা করুণ

আর্তনাদ। কিন্তু মদ্যপায়ী নর-পশুদের অট্টহাসিতে সবকিছু চাপা পড়ে যেত। অনেক অনেক মা-বোনকে বলাৎকার স্থলেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আর যারা নামে মাত্র বেঁচে থাকত তাদের সংজ্ঞাহীন দেহ রাতের আঁধারে সে কারখানার বিভিন্ন কোণায় পুঁতে ফেলা হতো।

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারি সে কারখানায় প্রহরারত মিত্র বাহিনীর অনুমতি নিয়ে লাকসামের এম,সি, এ জনাব আব্দুল আউয়াল ও থানার সেকেন্ড অফিসার এবং জন কয়েক ভূক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী সহকারে কারখানাটি দেখতে গিয়েছিলাম। পশ্চিম কারখানাটিতে ঢুকতেই ভেসে এল পঁচা গন্ধ। হয়েতো রক্ত পঁচা গন্ধই হবে। এ কারখানার যেখানেই যে কক্ষে ঘুরেছি সর্বত্রই অনুভব করতে পেরেছি রক্তের চাপ সে রক্তে দুর্গন্ধের আভাস। ভিতরে ঢুকতেই সামনেই দেখতে পেলাম দু'টি জীবন্ত পেয়ারা গাছ এবং সদ্য মৃত একটি কাঁঠাল গাছ।

গাছ তিনটির প্রত্যেকের ডালে দেখলাম এখনো ঝুলে রয়েছে হত্যার প্রতীক কয়েকটি রশি। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানালেন এ গাছ তিনটিতে যে সমস্ত রশি এখনো ঝুলে রয়েছে সে সমস্ত রশিতে অসংখ্য নারী পুরুষকে ঝুলিয়ে দেখে চাবুকের প্রহারে নিস্তেজ করা হতো। তারপর সে সমস্ত সংজ্ঞাহীন দেহ গুড় মেখে একটি চিলে কোঠায় ফেলে রাখা হতো। বলা বাহুল্য, সেই চিলে কোঠায় পুর্বাহ্নেই লুট করা খেজুরের গুড় বা মিষ্টি দ্রব্য ছিটিয়ে অজস্র পিপড়া জড়ো করে রাখা হতো। তারপর সেই পিপড়ার ভিড়ে সংজ্ঞাহীন দেহকে ফেলে রাখা হতো।

সারা রাত বিষাক্ত পিঁপড়ার তীব্র দংশনে অনেককেই সেই চিলে কোঠায় নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এমনি ভাবে প্রাথমিক নির্যাতন শেষে অনেককে চোখ বেঁধে লাইনে দাঁড় করানো হতো তারপর গর্জে উঠতো হিংস্র হায়েনাদের অস্ত্র নিমিষে ভুলুণ্ঠিত হতো অগণিত প্রাণ। আর একটু এগিয়ে গেলাম, দেখলাম একটি পুকুর। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে দু'টি আম গাছ এ গাছেও দেখলাম কয়েকটি রশি ঝুলছে আর গাছের নীচে দেখলাম আগাছায় ভরা এক ফালি জমি।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানালেন ঐ সব পেয়ারা-কাঁঠাল গাছের নীচে, এই আম গাছের নীচে, আর ঐ আগাছা ভরা জমিটুকু খুঁড়লেই বের হয়ে পড়বে অসংখ্য ভাই-বোনের অজস্র নর-কঙ্কাল। আর এক প্রত্যক্ষদর্শী পুকুরের পূর্ব পাড়ের একটি ভরাট গর্তের চিহ্ন দেখিয়ে জানালেন যে, একটি জীবন্ত লোককে হাত-পা বেঁধে এই গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিতে তিনি দেখেছেন। তাছাড়া এম,সি,এ আউয়াল সাহেবও এ খবরটি বহু লোকের মুখে শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। তারপর ঢুকলাম কারখানার ভিতরে।

সঙ্গী সেকেন্ড অফিসার সাহেব পূর্বেই শুনেছিলেন যে ইলেট্রিক হিট দিয়ে নাকি এখানে লোক মারা হতো। তাঁর নেতৃত্বে আমরা সে রুমটি খুঁজে পেলাম। দেখলাম একটা সুইচ বোর্ড আর অসংখ্য বৈদ্যুতিক তার। সে ঘরটির পাশেই দেখলাম বেশ কিছু সামরিক ও বেসামরিক লোকের পোশাক। এখানে বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক লোকদের উলঙ্গ করে ইলেট্রিক হিট দিয়ে মারা হতো।

সারাটা কারখানা ঘুরে দেখলাম।

সর্বত্রই দেখা যায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্হায় পড়ে রয়েছে অনেক কাগজ পত্র খান সেনাদের ব্যক্তিগত চিঠি ও পারিবারিক ফটো। লাকসাম রেলওয়ে হাসপাতালের মালী মনিন্দ্র চন্দ্র, উপেন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীরাম চন্দ্র মালীকে কিত কয়েক মাস ধরে এ কারখানায় খানসেনাদের কাজ করতে হয়েছে বলে অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে তারা আজও বেঁচে আছেন। তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি এবং আরো জানা যাবে।

মনিন্দ্র চন্দ্র আমাকে জানিয়েছেন যে, এখানে অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ দেখে সে ভীত হয়ে অনেক বারই পালাতে চেয়েছিল কিন্তু সুযোগ মেলেনি। মনিন্দ্র চন্দ্র আরো জানিয়েছে যে, প্রায় রাতেই দলে দলে লোকদের চোখ বেঁধে জংশনের দক্ষিণের বড় হাই লাইটটির পূর্ব দিকে বেলতলায় নিয়ে যেয়ে ব্রাশ মেরে হত্যা করা হতো। যাদের হাতে দিনের বেলা গর্ত করা হতো রাত্রির বেলায় তাদেরকেই সেই গর্তে মাটি চাপা দেওয়া হতো।

মনীন্দ্র চন্দ্রের ও তার সঙ্গীদের নির্দেশিত গর্ত গুলি খুড়লে আজও অসংখ্য প্রমাণ মিলবে বলে তারা জোর দাবী জানান। লাকসামের প্রখ্যাত ডাক্তার জনাব মকবুল আহমদ, মিল মালিক জনাব আব্দুর রহিম ও আব্দুল মমিন এক সাক্ষাৎকারে জানালেন যে, পাক সেনাদের কুখ্যাত মেজর মুজাফফর হাসান গার্দিজি, ক্যাপ্টেন ওবায়দুর রহমান, সুবেদার মুস্তফা খান ও রেলওয়ে পুলিশ বাকাওয়ালীর নেতৃত্বে এবং স্হানীয় কতিপয় দালালদের যোগসাজশে লাকসামে সহস্রাধিক লোকের প্রাণ নাশ ঘটে।

লাকসাম থানার প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ কর্মী ২৪ নং আর্দ্রা ইউনিয়নের চেয়াম্যানম্যান জনাব আলী আশরাফকে এবং লাকসামের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবদুল খালেক ও খসরুকে এই হত্যাপুরীতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
"অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছে"।	দৈনিক বাংলা	১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

"ওরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছে।"
॥মোঃ কামরুজ্জামান প্রদত্ত ॥

(দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৫২৩-৫২৪)

ঢাকা ঘোড়দৌড় ময়দানের দক্ষিণ প্রান্তে কালী বাড়ীর ধ্বংস্তুপে দাঁড়িয়ে সেদিন আমাকে শুনতে হয়েছিল তাদের কথা।--লালমোহন মালী--"হামি তখন পালাইয়া গেছি। অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছে। নন্দনের গায়ে পাঁচটি গুলি লেগেছে। রাম প্রসাদ- হামার পোলাভি মারা গেছে। এখন শুধু তিনটি মাইয়া আছে, সাদিভি হয়নি।"

সোভা রাণী মজুমদার-“ছাব-হামারভি ছেলে মারা গেছে।”

লক্ষী রাণী ঘোষ-“আমার স্বামী, আর দুটি মেয়ে মারা গেছে।”

সোনিয়া-“হামার ছামী, এক পোলা, দুই মাইয়া মারা গেছে। এক পোলা কোলে আছে।”

পুরান দাস-“হামার ছেলে মারা গেছে।”

লিলিয়া-“হামার ছামীভি মারা গেছে দুইটা মাইয়াভি মারা গেছে।”

বেচন-“হামার ভাগনা সুরুজ ভল্লী মারা গেছে। ও যে দিন মারা গেছে ছেদিন তার মাইয়া পার্বতীর জনম হইছে।”

বৃদ্ধা-“নন্দুর পোলা মারা গেছে।”

সকলের কণ্ঠে -“ছামীভি মারা গেছে ছাব।” আরো অনেক, অনেকের কণ্ঠে শুনছিলাম আমি সেদিন কালীবাড়ীর ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে-লিলিয়া, সোনিয়া, লক্ষী রাণী, পুরানদাস, আর শোভা রাণীর মত আপন জনদের হারিয়ে যাওয়ার বেদনা মিশ্রিত কথা।

কিন্তু আমি অপারগ। তাদের সকলের নাম আর কথা সেদিন লিখে রাখতে পরিনি। সবার তো একই কথা-কারো ছেলে, কারো স্বামী, কারো বা মেয়ে, আবার অনেকেই স্বামী, পুত্র, সবাইকে হারিযেছে। তারা তাদের আপন জনকে হারিয়েছে নরপিশাচ পাক জল্লাদদের হাতে। ২৫শে মার্চের কালো রাতে হানাদার বাহিনী ধ্বংস অভিযান ঢাকা শহরে সর্বত্র শুরু করে। তাদের তান্ডবলীলা থেকে প্রাচীন মন্দিরও রেহাই পায়নি। রমনার কালীবাড়ীর মন্দিরটি হানাদাররা ২৭শে মার্চের রাতে ট্যাঙ্কের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়।

মন্দির সহ পুরা কালীবাড়ী আজ রমনার মাঠ থেকে নিশ্চিত হয়ে গেছে। এর সাথে কালীবাড়ীতে আশ্রিত মোট ৫০ জনের প্রাণ নাশ করেছে জল্লাদ সেনারা। আমি সেদিন রমনার কোরবানির হাটে ছবি আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাটের ছবি আর আনতে পারিনি, এনেছি তাদের ছবি যারা হারিয়েছে তাদের আপন জনকে। তারা আজ সবাই মুক্ত আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছে-তাই সেদিন আমার সাথে তাদেরই একজন লালমোহন মালীকে কথা বলতে দেখে মনে করেছিলাম-- আমি হয়তো রিলিফ সম্পর্কে তাদের নাম ঠিকানা লিখছি। তাই অনেক নারী পুরুষ আমাকে ঘিরে বলেছিল ছাব হামার নাম লিখেন, হামার স্বামী, হামার ছেলে------ইত্যাদি ইত্যাদি। রমনা কালীবাড়ীতে মোট ৭০০ নারী পুরুষের বাসস্হান ছিল। তাদের মধ্যে স্বামীজী-প্রেমানন্দ গিরি সহ মোট ৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। স্বামীজীর বয়স প্রায় ৭০ বছর হয়েছিল। তাকে রমনার মাঠে অন্যান্যদের সাথে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে ২৮শে মার্চে। তার স্ত্রী এবং তিন বছরের শিশু সন্তান ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল।

পিতার মৃত্যুর দিন-পার্বতীর জন্মদিন। কালীবাড়ীতেই আশ্রিত ছিল সুরুজভল্লী। সুরুজভল্লী সেদিন ২৭শে মার্চের রাতে অনেকের সাথে সারিতে দাঁড়িয়েও মনে করেছিল তার স্ত্রীর প্রসব বেদনার কথা-। নবজাত পার্বতীর পিতা

আর নেই আছে রমনার কালীবাড়ীতে পিতার জামাট বাঁধা রক্ত।

ঝরছে অশ্রু অবিরল

কালীবাড়ীর এক বৃদ্ধা নাম প্রিয়বালা ঘোষ। বয়স ৬০ বছরের মত। দুই গন্ড বেয়ে ঝরছিল শুধু অশ্রুর ফোঁটা। আমার কাছে আসতে পারেনি ভিড় ঠেলে। তাই অনেক পরে সবার শেষে আমি তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আপনি এমন করে কাঁদছেন কেন ?" উত্তরে হতবাক। কিছুই প্রথমে বলতে পারেনি। তখন চোখের পানি যেন বাঁধ ভাংগা স্রোতের মত বইছিল। বৃদ্ধার পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি ফুটফুট রক্ত গোলাপের মত শিশুকে কোলে নিয়ে তার পুত্রবধু লক্ষ্মীরাণী ঘোষ।

কেউ কিছু বলছেনা। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে ৫ বছরের শিশু মন্টুচন্দ্র ঘোষ আমাকে উত্তর দিল-"আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে সেজন্য ঠাকুর মা কানছে।" আঁচলে চোখ মুছে বৃদ্ধা প্রীয়াবালা তখন ছেলে বউ আর পাঁচটি শিশু সন্তানকে দেখিয়ে আমাকে বলল, সবাইকে ভাসিয়ে আমার মানিক (ছেলে সন্তোষ ঘোষ) গুলি খেয়ে মারা গেছে । দু'টি নাতনী মঞ্জু, সঞ্জু ও মারা গেছে। বৃদ্ধা এর বেশী আমাকে আর কিছুই বলতে পারেনি। শিশুর মত কেঁদে উঠেছিল সেদিন রমনার মাঠে দাঁড়িয়ে । পুত্রহারা জননীর কান্নায় আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি।—

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বগুড়ায় পাক বাহিনীর হত্যাকান্ডের ওপর দুটি প্রতিবেদন।	সংবাদ	২ ও ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

প্রতিদিন বধ্যভূমি থেকে ভেসে আসতো মানুষের মরণ চীৎকার- সাধুবাবা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে তা-ই শুনতেন

(দলিলপত্রঃ অষ্টম খন্ড পৃ ঃ ৫২৭-৫৩১)

------ আজ থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগের কথা। আমাদের গুরু এসে আস্তানা পেতেছিল বগুড়া জেলার বাগবান কাবরার একটি বটগাছের ছায়ায়। বগুড়া শহর বলতে তখন কিছুই গড়ে উঠেনি। একটা টিনের ঘরে থানা এবং ফুলবাড়ীর রমজান মন্ডলের একটি কাঠের কারখানা বোধহয় ছিল। আজকের সাত-মাথা তখন ছিল গাছপালা আর জঙ্গলে ভরা। আমাদের গুরু আনন্দ গোস্বামী এবং ভেরগু গোস্তামী এই পৃথিবী ছেড়ে অনেক পূর্বেই বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু সেদিন এক সঙ্গে চলে আমার তিনভাই। হাত বেঁধে বগুড়ার সেউজগাড়ীর আনন্দ আশ্রমে সকাল বেলা বসে বসে এই সাধুবাবা সব ঘটনা বলছিলেন। হানাদার পাক বাহিনী বগুড়া দখল করার পরও আশ্রমে চারজন সাধু ও তিনজন মাতা ছিলেন। হানাদার বাহিনী তিনজন সাধুকে বগুড়া রেলষ্টেশনের পশ্চিম দিকে ডিগ্রী কলেজ

সড়কের পার্শ্বে গুলি করে হত্যা করে। এদের ভিতর ছিলেন সুন্দর সাধু, মঙ্গল সাধু এবং স্হানীয় বাদুরতলার একজন বৃদ্ধ মুনেন্দ্রনাথ সরকার। তিনজনই ছিলেন বগুড়ার প্রাক্তন অধিবাসী। 'এই তিন সাধু' -বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন সাধুবাবা। বগুড়ার অতীত ইতিহাসকে বুকে নিয়ে এই সাধু বাবা আজও বেঁচে আছেন। বগুড়ার এমন লোক কমই আছেন যারা এই সাধুবাবাকে চেনেন না। পাক দস্যুদের জঘন্য নৃশংসতার পরও আজ সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে আছেন এই সাধুবাবা। যুগোল কিশোর গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বাঁচলেন কেমন করে ? হেসে তিনি বললেন, "ওরা আমাকে কেন যে হত্যা করেনি তা আমি বলতে পারব না। আমার তিন ভাই তখন খেতে বসেছিল। হঠাৎ সেই মুহুর্তেই বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো কয়েকজন অবাঙ্গালী। ওরা আমার ভাইদের খেতে দেয়নি। এসেই ভাইদের হাত বেঁধে ফেললো। ওদের নিয়ে যাওয়ার সময় আমি বললাম, আমাকে মার, ওদের নিয়ে যেয়োনা। বৃদ্ধ বলেই বোধহয় আমাকে ওদের সঙ্গে নেয়নি। কিন্তু আমার ভাইয়েরা আর ফিরে আসেনি। একদিন এক ধাঙ্গড় এসে আমাকে জানালো, "পাক সেনারা রাস্তার ধারের গর্তে আমার ভাইদের পুতে রেখেছে।" সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,-' 'আপনারা সবাই আগে পালালেন না কেন ?" সাধুবাবা প্রত্যুত্তরে বললেন, "সে অনেক কথা বাবু। প্রায় সকলেই তখন শহর ছেড়ে চলে যান। ভক্তরা এসে আমাদের অনেক অনুরোধ করেছে। কিন্তু সংঘের সাধুর মাতারা নিষেধ করেছিল। আমরা কারো অন্যায় করিনি। ওরা নিষ্ঠুর ওরা কাল, ওরা অনেক অন্যায় করেছে"- কথা বলতে বলতে মিষ্টভাষী সাধুবাবার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠছিল। সাধুবাবা বললেন, 'ওরা আমাকেও ছাড়েনি।' মাঝে মাঝেই পাক সেনারা আশ্রমে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করতো। আমার সামনে বন্দুক ধরে বলতো, 'টাকা কাঁহা- টাকা দোঁ- ওরা আমার পাঁচশত টাকা আগেই নিয়ে গেছে, কিন্তু তারপরেও আসতো টাকার খোঁজে। এই দেখুন আমার পিঠে রড দিয়ে অনেক মেরেছে। সবসময় ওরা আমাকে ছোরার ভয়ে কাবু রেখেছে। এক দিন ওরা আমাকে মন্দিরের সামনে দাঁড় করিয়ে বললো, "কুয়া কাহা হায় ?" আমি ভেবেছিলাম ওরা এবার আমাকে মেরে ফেলবে। ওরা আমাকে বললো, "বুড্ডা তুম কালেমা পড়।" এরপর হঠাৎ জানিনা ওদের কি মনে হওয়াতে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি বেঁচে আছি, কিন্তু ওরা আমাকে যেমন অত্যাচার করেছে, তাতে বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য। জানতে চাইলাম, নয়টি মাস আপনার ও মাতাদের খাবার সংগ্রহ করলেন কোত্থেকে? তিনি বললেন "অনেক কষ্ট করেছি। ভিক্ষেও করেছি। পাশের গ্রামে গিয়েছি। একটু আধটু যা পেতাম তাই খেয়ে বাঁচতাম। আমাদের দশ মণ চাল, ৮টা গরু, প্রায় হাজার টাকার বাসনপত্রাদি সব লুট করে নিয়ে গেছে ওরা। চোখের সামনে দেখতাম, কিন্তু কিছুই বলতে পারিনি। মাঝে মাঝে ভক্তরা গোপনে কিছু সাহায্য দিয়ে যেত। তাই দিয়ে চালিয়ে নিয়েছি।"

আশ্রমের পূর্বদিকের বাগানে (গুরুর প্রথম আস্তানা) দেখিয়ে সাধুবাবা বললেন -ঐ যে ওখানে একটা বদ্ধ কূপ আছে। প্রায় প্রতি দিনই করুণ কান্নার

আওয়াজ আমি শুনেছি। একদিন এক ছোট শিশু, "বাবা মা বাঁচাও-বাঁচাও করে চীৎকার করছিল। ঐ ছেলেটাকে জবাই করে কুপে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমি প্রায় প্রতিদিনই এরকম চিৎকার শুনেছি। সাধুবাবার অনুরোধে আমি বদ্ধকুপে হিংস্রতার অনেক চিত্র দেখেছি। আজো এই বাগানের একটি ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মানুষের রক্ত লেগে আছে। কুপে নরকঙ্কাল আর মাথার খুলিগুলো এখনো দেখা যায়। কত নিরপরাধ, নিস্পাপ মানুষ এখানে জল্লাদদের হাতে বলি হয়েছে কে তার হিসাব দিতে পারে ?

বগুড়া শহরের অতি পুরাতন এবং সবার পরিচিত সাধুর আশ্রম আজ আবার ভক্ত আর গুণগ্রাহীদের আগমনে ভরে উঠেছে। কিন্তু আশ্রমের সেই পরিচিত মুখগুলো আর নেই। জিজ্ঞেস করলাম দেশ সম্বন্ধে। আপনি কি ভাবছেন ? উত্তরে তিনি শুধু বললেন, 'ওরা খুবই বেআইনী কাজ করেছে। ওরা গণভোট মানে না। শেখ মুজিবকে ক্ষমতা না দিয়ে তারা খুবই অন্যায় করেছি। ওরা অত্যাচারী। অত্যাচারীকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে।'

আশ্রমের মন্দিরে গুরুদের আস্তানা দেখিয়ে সাধুবাবা বললেন, 'আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইয়েরা এমনিভাবেই থাকত। কিন্তু দস্যুরা তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। মাথায় তার ছোট ঝুটি বাঁধা। সামান্য সাদা কাপড়ের একটি গামছা তার পরণে। তিনি বললেন, পরের অন্যায় করা আমাদের নীতি নয়। তবুও ওরা আমাদের মেরেছে। বৃদ্ধ সাধু যুগোল কিশোর গোস্বামীই শুধু তার ভাইকে হারান নাই, বগুড়াবাসীও হারিয়েছে তাদের পরিচিত শ্বেতবস্ত্রধারী তিনটি ভাইকে। তারা আর আসবে না।

বগুড়া রেলষ্টেশনের চারপাশেই ছিল জল্লাদদের কসাইখানা

"তখন জুন মাসের বোধ হয় প্রথম সপ্তাহ। রাত্রিবেলা শুয়ে আছি। হঠাৎ ইন্টার ক্লাশ ওয়েটিং রুম থেকে ভেসে আসলো মানুষের করুণ আর্তনাদ। 'আমাকে বাঁচাও' করে কে যেন চিৎকার করছিল। একটু পরেই থেমে গেল। বুঝলাম, সে আর নেই।" কথাগুলো বলতে বলতে শিউরে উঠেছিলেন বগুড়া রেলওয়ের এক জন পদস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী। জানতে চাইলেম, "আপনি দস্যুদের আর কি নৃশংসতা দেখেছেন।" উত্তরে তিনি জানালেন, "কি দেখি নাই বলুন। ওরা সব করেছে। বাঙ্গালীরা সবাই ছিল ওদের শত্রু। কেননা, যে বাঙ্গালীই রেলষ্টেশনের আশেপাশে আসতো তাকেই তারা হত্যা করেছে। একদিন একজন নিরীহ বাঙ্গালীকে দিয়ে কয়েকজন মিলিটারী তাদের মালপত্র টেনে উঠলো। তারপর কাজ শেষ হলে শুরু হলো তার উপর অমানুষিক অত্যাচার। একজন মিলিটারী লোকটাকে ওয়াগানের পিছনে নিয়ে দু'পা সমান করে পায়ের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে বসিয়ে রাখলো। তারপর একজন উঠলো তার পিঠের উপর।জোর করে ওরা জীবন্ত মানুষটার হাড়গুলো এমনি করে ভেঙ্গে দিল। মানুষটার অনুরোধ আর মিনতি ওরা শুনে নাই। এরপর লোকটাকে আর তার ভাইদের মত হত্যা করা হলো। পাক

দস্যুরা ষ্টেশনের আশেপাশে অহরহই মানুষদের এমনি নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করে হত্যা করতো।”

জিজ্ঞেস করলাম, “আপনাদের ওরা কিছু বলে নাই ?” উত্তরে তিনি বললেন, “বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় বাঙ্গালী কর্মচারীদের ওরা ক্ষমা করে নাই। যারা সরতে পারে নাই তাদের মৃত্যু ছিল ওদের হাতে।” প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন, “একদিন মেজর জাকী সামরিক হেড কোয়ার্টারে আমাকে ডাকলো। তারপর পাশের রুম থেকে রক্তমাখা কাপড় পরিহিত একজন বাঙ্গালীকে ডেকে আনা হলো। তার হাত বাঁধা ছিল এবং মুখ ছিল রুমাল দিয়ে বাঁধা। আমাকে মেজর বললো, ‘এ-দেখো’। এরপর কড়া মেজাজে হুকুম হলো-‘আভি তোম যাও।’ আমি মেজর জাকীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি বটে, কিন্তু ঐ রক্তমাখা ভাইটি বেঁচে আছে কিনা জানি না। শেষের দিকে (বগুড়া ছাড়ার পূর্বে) ওরা রেলওয়ের বাঙ্গালী কর্মচারীদের হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। রেলষ্টেশনের আশেপাশে নিরীহ বাঙ্গালীদের হত্যা করেও ওদের রক্ত পানের তৃষ্ণা তখনও মেটেনি। বগুড়া ছাড়ার পূর্বে ওদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ায় আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু রেলষ্টেশনের বধ্যভূমিতে হারিয়ে যাওয়া ভাইরা আর আসবে না। রেলষ্টেশনের সুইপার দশীন (৭০) জমাদার সতর্কতার ইঙ্গিত দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এই বৃদ্ধের ৭টি মাস কেটে গেছে ষ্টেশনের আশেপাশের মৃত বাঙ্গালীদের কবর দিতেই।

দশীন জমাদার

বগুড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের একজন সুইপার। বয়স প্রায় ৭০ বছরের বেশী। এই বৃদ্ধ তার সাতটি মাস কাটিয়ে দিয়েছে বর্বর পাক দস্যুদের হত্যা করা লাশ সরিয়ে। দস্যুদের হত্যাযজ্ঞের সে একজন নীরব সাক্ষী। ‘আমি পূর্বে আরো মোটাসোটা ছিলাম স্যার। আমি লাল টক্‌টকে ছিলাম। কিন্তু বগুড়া ষ্টেশনের আশেপাশের বাঙ্গালী ভাইদের রক্ত দেখে দেখে আমি খুব রোগা হয়ে গেছি। আমার শরীরে আগের মত মাংস নেই। আপনিই বলুন, একজন মানুষ শত শত রক্তমাখা লাশ সরালে আর কি করে বাঁচার আশা রাখে! জীবন নিয়ে খেলা হয়েছে সাহেব। আপনারা কিছুই জানেন না। আমি কেমন করে বেঁচে আছি জানি না-ওরা কত জবাই করেছে, কিন্তু আমি কিছু বলতে পারিনি। মুক্তি আর ইন্ডিয়ার সৈন্য আমাদের রক্ষা করল হুজুর----।” বগুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে প্রায় ৩০০ গজ দক্ষিণে একটি বদ্ধ কূপ দেখতে গিয়ে সুইপার দাশীন কথাগুলো বলছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বগুড়া রেলওয়ের এস ডি ও সাহেব পরিবারসহ এই প্রথম আসলেন তাঁর বাংলোতে। পাকবাহিনীর আমলে তার বাংলোটা সম্পূর্ণভাবে সামরিক দস্যুদের হাতে ছিল। তারা এই দু’তলা বাড়ীটি ব্যবহার করতো কসাইখানা হিসেবে। নিরীহ বাঙ্গালীদের পাকদস্যু আর তার সহযোগীরা ধরে আনতো, তারপর এই বাড়ীতে জবাই করা হতো, বাড়ীর সংলগ্ন একটা বৃহৎ কূপে হত্যা করার পর মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হতো। বাড়ীটার আউট কিচেনে সবচেয়ে বেশী হত্যা করা হতো বলে মনে হয়। কারণ এখান থেকে কূপটি মাত্র ২০ গজ

দূরে। বাড়ীটার চারিদিকে দীর্ঘ নয় মাসে ঘাস আর জঙ্গলে প্রায় ভর্তি হয়েছিল। পাকবাহিনী সেগুলো পরিস্কার করতো না। কারণ জঙ্গলের মাঝে এইরকম একটি বাড়ীতে তাদের বাঙ্গালী নিধনের নেশা খুবই বেড়ে যেত। শুধু তাই নয়, বর্বর পাকসেনারা এই বাড়ীতে মদ আর জুয়ার আড্ডাও বসাতো। দিনে রাতে তারা ওখানে আসর জমাতো নির্বিঘ্নে । ওদের কেউ বাঁধা দিতে পারে নাই। রক্তের নেশায় বর্বররা হন্যে হয়ে বাঙ্গালীদের খুঁজে আনতো। দাশীন জমাদারকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কতজন বাঙ্গালীর মৃতদেহ এই কূপে ফেলেছো।" –"কি আর বলবো হুজুর ! বিশ্বাস করবেন না ! আমার হাতেই কমপক্ষে চার-পাঁচ শত লাশ এই কুয়ায় ফেলেছি। জল্লাদরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো হুজুর, আমি কি করি। আমি লাশগুলো পুঁতে রাখতে চাইতাম। কিন্তু ওরা দেয় নাই। ওরা আমাকে বলতো, 'তু' শালা হিন্দু হায়। এইসে দরদ্ কিউ লাগতা!" জানতে চাইলেম 'তোমার সামনেই কি ওরা হত্যা করতো।" বৃদ্ধ বলে চলছিল, "কি বলেন সাহেব! আমাকে ওরা ভয় পেতনা। প্রথমে বাঙ্গালীকে ধরে আনতো, তারপর হাত বেঁধে মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দেয়। এরপর হয় পেটের ভিতর চাকু মারে, না হয় জবাই করে। কোনটার আবার পিছন দিকে থেকে ঘাড়ে ছুরি বসিয়ে জবাই করতো। ওদের দয়া নাই। কান্নাকাটি অনুরোধ কিছুই শুনেনি। কত বাঙ্গালী যে কাঁদতো হুজুর, কি করবো। মিলিটারীরা খুশিমত মানুষকে গুলী করতো। তারপর আমাকে বলতো 'ইছি কো হঠাদো'। আমি বাধ্য হয়ে কাজ করেছি হুজুর। কিন্তু ওরা আমাকেও ছাড়ে নাই। রেল ষ্টেশনের বাঙ্গালীদের আমি আগেই বলতাম তোমরা সরে যাও। আমি ওদের এইদিকে আসতে দেইনি। গোপনে গোপনে আমি অনেক বাঙ্গালী সাহেবকে সাবধান করেছি। কিন্তু মিলিটারীরা এটা জানতে পেরে আমাকে সন্দেহ করে ঘাড়ে রাইফেল দিয়ে মারে। শুধু লাশ সরাবার জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা হুজুর বড় বড় সাহেবকেও জবাই করেছে-গুলী করেছে।"পাশে পার্ক-রোডের একটি ড্রেন দেখিয়ে বলল, "এখানে তিনটা, ওখানে ১টা, এই রকম অনেক সাহেবের লাশ এই ড্রেনেই আছে হুজুর। ওরা ভালভাবে পুঁতে রাখতেও আমাকে দেয়নি। আমাকে সন্দেহ করে খুব মারতো, তার উপর আমার চাকুরী নষ্ট করে দিল সাহেব। কয়েক মাস ধরে না খেয়ে আছি।" ঝাড়ু দাশীন পাক বর্বরদের বুলেটের সামনে না খেয়েই দিন কাটিয়েছে। চাকুরীতে পুনর্বহালের কথা সেদিন সে মুখে আনতে পারে নাই। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যারা এমনিভাবে শত শত মানুষকে হত্যা করতে পারে তাদের এক মুঠো ভাতের অভাবে এক গরীবের জন্য চিন্তা করার সময় কোথায় ? বগুড়া রেল এস-ডি-ও বাংলোর পূর্বদিকের মাঠটা এখন কবরস্হানে পরিণত হয়েছে। বগুড়া শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত এই বাংলাতো কোন বাঙ্গালী আসতে পারেনি। বগুড়া শহর শত্রুমুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বাংলোর প্রতিটি ঘরের মেঝে আর দেয়ালে মানুষের রক্তে ভেজা বহু কাপড়-জামা ইত্যাদি রক্তাক্ত অবস্হায় পড়েছিল। বাংলোর উপর তলার হাউজে বর্বরতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। এই হাউজটি ছিল সম্পূর্ণ মানুষের

রক্তে ভরা। রক্তগুলো জমা হয়ে ক্রমশঃ জমাট বেঁধে যায়। কোদাল দিয়ে মাটি কাটার মত জমাট বাধাঁ রক্ত কেটে এই হাউজ পরিস্কার করা হয়েছে। জবাই করা মানুষের রক্তে স্রোত দেখার জন্যই বোধ হয় হাউজে রক্ত জমা করতো। রক্ত দেখেই হয়তো রক্তপানের তৃষ্ণা জল্লাদদের বাড়তো বেশী। বগুড়া রেলষ্টেশন আর ষ্টেশন সংলগ্ন, রেললাইনের আশেপাশে কত নিরীহ ফেব্রুয়ারি কে যে পাকসেনা আর তার সহযোগীরা হত্যা করেছে তার হিসেব নেই। কত নিরীহ মানুষ যে এই দস্যুদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন আর একান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যুকে মেনে নিয়েছেন কেউ বলতে পারে না। বগুড়ায় পাক দস্যুরা বাঙ্গালীদের ধরে বলতো,'ইছিকো খরচা খাতা মে (মৃত্যু খাতা) উঠা দেও।'------বোধকরি রেলষ্টেশনের ও তার আশেপাশের নিষ্ঠুর বর্বরতা আর হত্যাযজ্ঞের দ্বারাই তাদের খরচের খাতা পূর্ণ হয়ে গেছে।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
খুলনার নরমেধযজ্ঞ।	দৈনিক বাংলা	১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

দলিলপত্র, ৮ম খন্ড পৃ ঃ ৫৩২

খুলনায় পাকবাহিনীর নরমেধযজ্ঞ

॥ নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত ॥

খুলনা ঃ খুলনা শহরের হেলি পোর্টে ও ফরেস্ট ঘাটে বাঙ্গালীদের যে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হতো, তা দেখে খুলনার তৎকালীন জেলা জজ হার্টফেল করে মারা যান। বর্তমানে হেলিপোর্ট ফরেষ্ট ঘাটের কথা বলা যাক। হেলিপোর্ট জজকোর্টের সামনে এবং সার্কিট হাউস সংলগ্ন। যেসব বাঙ্গালীদের উপরে তাদের অত্যাধিক রাগ ছিল জল্লাদরা তাদের প্রকাশ্য দিবালোকে হেলিপোর্টের প্রবেশ পথে ছাগল ঝোলা করে পা উপরে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতো। আর ঐ অবস্থায় চলতো অত্যাচার- চড় ঘুষি ও চাবুকের আঘাত। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ অবস্হার উপর বেয়োনেট দিয়ে খোঁচানো হতো। যতক্ষণ না সে মারা যায় ততক্ষণ চলতো এই নির্যাতন। যার কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হতো ঐভাবে অত্যাচার করার পর অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে নামানো হতো, জ্ঞান ফিরলে আবার ঝোলানো হতো পূর্ববৎ।

একদিন আমার নিজের দেখা একটি মৃত্যুর কথা উল্লেখ করছি। সকাল ১০টা হবে। হেলিপোর্টে লুঙ্গি ও গেঞ্জী পরা দীর্ঘ সবলদেহী একজন বাঙ্গালীর পায়ে, হাঁটুতে ও অন্যান্য গিরায় কাঠের রোলার দিয়ে দু'জন সেনা পিটাচ্ছে আর দু'জন সেনা তা উপভোগ করছে। যার উপর অত্যাচার চলছে তিনি বার বার বাধা দিচ্ছেন আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তারপর তার দু'পায়ে দড়ি বেঁধে পা উপরে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলানো হলো।

পরনে থাকলো জাঙ্গিয়া ও গায়ে গেঞ্জী। পরে খালি গা করে গেঞ্জীটিও অপসারণ করা হলো। আর চললো চাবুকের বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির সাথে সাথে তার দেহটি মুচড়ে উঠতে লাগলো। ঐ ঝুলন্ত অবস্হাতেই তিনি হাত দিয়ে বাধা দিচ্ছিলেন। কিন্তু পরে আর তার হাতে সে জোর রইলনা। কিন্তু চাবুকের বাড়ি চললো অব্যাহত ভাবে। আর এই ভাবেই সমাপ্তি হলো একটি বাঙ্গালী জীবন। পরে তার সেই ঠান্ডা শীতল দেহটাকে নামিয়ে অবজ্ঞায় তারা দূরে ফেলে দিল- আবার অপর একজনকে। আমি সরে পড়লাম।

রাতের বেলায় জজকোর্টের পিছনে ফরেষ্ট ঘাটে বাঙ্গালীদের এনে জবাই করে হত্যা করা হতো এবং দেহগুলোর পেট চিরে নদীতে ফেলা হতো। ঘাটটি আবার জজসাহেবের বাসার ঠিক পেছনেই। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে সেইসব মৃত্যুপথযাত্রী বাঙ্গালীদের করুণ আর্তনাদ জজ সাহেবের কানে পোঁছতো। দিনে হেলিপোর্টে ও রাতে ফরেষ্ট ঘাটের এইসব হত্যাযজ্ঞ সহ্য করতে না পেরে জজ সাহেব তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকে অনুরোধ করেছিলেন যে বিচারালয়ের সামনে যেন এ ধরণের কাজ না করা হয়। তার উত্তরে তিনি পেয়েছিলেন মৃত্যুর শাসানি। কিন্তু তাদের সে সাধ মেটেনি। তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে একরাতে মারা গেলেন।

আর একটি বধ্যভূমি ছিল গল্লামারী। খুলনা শহরের কেন্দ্রস্হল থেকে মাত্র দেড়মাইল। হেলিপোর্ট ও ফরেষ্ট ঘাট, কাস্টমস ঘাট প্রভৃতি জায়গায় প্রথমে বাঙ্গালীদের হত্যার জন্য বেছে নিলেও পরে বর্বর পাক বাহিনী গল্লামারীকেই তাদের নৃশংসতার উপযুক্ত স্হান বলে বেছে নিয়েছিল।

সারাদিন ধরে শহরে ও গ্রাম থেকে বাঙ্গালীদের ধরে এনে জেলখানা হেলিপোর্ট ও ইউ, এফ, ডি ক্লাবে জমায়েত করা হত। তারপর মধ্য রাত হলে সেই সব হতভাগ্য নিরীহ নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের পেছনে হাত বেঁধে বেতার কেন্দ্রের সামনে দাঁড় করিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দ্ধারা তারা 'ব্রাস' মারতো, রক্তাপ্লুত দেহে লুটিয়ে পড়তো হতভাগ্যরা। হত্যার আগে ট্রাক ভারে যখন তাদের নিয়ে যাওয়া হতো তখন সেই সব নিরুপায় মানুষের আর্তনাদ রাস্তার আশে পাশের সবাই শুনতো। কিন্তু তাদের তো বাড়ীর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই-কারফিউ রয়েছে।

সেই আর্তনাদ সহ্য করতে না পেরে শেরে বাংলা রোডের এক ব্যক্তি জানালা খুলে মুখ বাড়িয়েছিল মাত্র । ব্যাস, অমনি তাকে লক্ষ্য করে হানাদার বাহিনী গুলী ছুড়লো আর বুলেটে বিদ্ধ হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো। হানাদার বাহিনী প্রতিরাতে কম করেও শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করতো। দিনের বেলায় তাদের লাশ জোয়ারের পানিতে ভেসে আসতো। কিন্তু কারও সাহস হতোনা তাদের দাফন করার।

অনেকে তাদের আপনজনের লাশকে সনাক্ত করলেও সেখান থেকে তাকে উঠিয়ে নিতে পারেনি। কেননা বর্বরেরা জানতে পারলে তাকেও হত্যা করবে। কিছুদিন জল্লাদরা ঠিক করলো গুলী করে আর হত্যা নয়। অন্য পন্থা। এবার

থেকে শুরু হলো জবাই, কিন্তু সংখ্যায় কমলোনা-সেই শতাধিক প্রতি রাতে। এরপরের ঘটনা চরম নিষ্ঠুরতার। রাত্রের বদলে হত্যার জন্য দিনের বেলাকে বেছে নিল।

সকলের চোখের সামনে দিনে পিঠ মোড়া দেওয়া ট্রাক ভর্তি বাঙ্গালী নিয়ে যাওয়া হতো আর ঘন্টা খানেক পর শুন্য ট্রাক ফিরে আসতো-গল্লামারীতে পড়ে রইতো কিছুক্ষণ আগের যাওয়া সেইসব মানুষের শীতল দেহগুলি। খুলনা শহর মুক্ত হওয়ার পর গল্লামারী খাল থেকে দুই ট্রাক মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছিল।

ছবি তুলবার জন্য গল্লামারীর অভ্যন্তরের ধানক্ষেতে ঢুকে দেখলাম এক নৃশংস দৃশ্য। একাধিক লাশ পড়ে আছে, সেদিকে একটি কুকুর খাচ্ছে আর দূরে অপর একটি লাশের পাশে আর একটি কুকুর বসে হাঁপাচ্ছে। মনে হয় মানুষ খেয়ে তার উদর অতিমাত্রায় পরিপূর্ণ।

ভাবতেও অবাক লাগে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে খ্যাত মানুষকে কুকুরে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চট্টগ্রামে বধ্যভুমির সন্ধান।	পূর্বদেশ	১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

(দলিলপত্র ৮ম খন্ড পৃ ঃ ৫৩৪)

চট্টগ্রামের ২০টি বধ্যভূমিতে বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞ চলেছে।

॥পূর্বদেশ প্রতিনিধি॥

চট্টগ্রাম, ১২ই ফেব্রুয়ারী।- চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলী এলাকা সমেত জেলার আরো ৯টি থানাতে হানাদার খান সেনারা সর্বমোট ২০টি বধ্যভূমিতে বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠান চালিয়েছে। শহর ও শহরতলী এলাকার ১০টি বধ্যভূমির মধ্যে আটটিতে গড়ে পাঁচ হাজার করে বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে।

এ ছাড়া পোর্ট এলাকা এবং নেভী ব্যারাক এলাকাতে সুদীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী মানুষকে হত্যা করে কি হারে কর্ণফুলি নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে, তার কোন হদিসও খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলী এলাকার ১০টি এবং গ্রাম অঞ্চলের গোটা পাঁচেক বধ্যভূমি ইতিমধ্যে আমি ঘুরে দেখেছি।

এ সব বধ্যভূমি থেকে বাঙ্গালী হত্যার সঠিক সংখ্যা হয়তো পাওয়া যাবেনা, কিন্তু এখনো সরকার যদি ব্যাপক অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এগিয়ে আসেন তবে হত্যাযজ্ঞের ব্যাপকতা সহ একটা আনুমানিক সংখ্যাও নির্ণয় করতে পারবেন বলে বিশ্বাস। কোন কোন মহল চট্টগ্রামে নিহত লোকের সংখ্যা ১ লাখ হবে বলে অনুমান করছেন।

কিন্তু আমার মনে হয়, বিভিন্ন থানাসহ এ সংখ্যা অন্ততঃ তিন লাখে দাঁড়াবে। শহর ও শহরতলীর আমবাগান, ওয়ারলেস কলোনী, শেরশাহ কলোনী

ও ফয়েজ লেকে সহ গোটা পাহাড়তলী এলাকাতে এখনো ২০ থেকে ২৫ হাজার বাঙ্গালীর মাথার খুলি পাওয়া যাবে। এছাড়াও রয়েছে চাঁদগাও, লালখান বাজার, হালিশহর, কালুঘাট ও পোর্ট কলোনী ইত্যাদি বধ্যভূমি। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ও সার্কিট হাউসেও হাজার হাজার লোককে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে মিরেশ্বরাই ও সীতাকুন্ডের পাহাড়, রাউজান, পটিয়া, সাতকানিয়া এবং বাঁশ খালীর বনাঞ্চলেও হাজার হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগে সমস্ত এলাকায় রিপোর্ট সংগ্রহ অনেকটা কঠিন কাজ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সারা চট্রগ্রাম জেলাতে তিন লাখ বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে।

বিভিন্ন বধ্যভুমিতে আজো বহু নরকঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থার পাওয়া যাচ্ছে। শহরের ওয়ারলেস কলোনী, ঝাউতলা ও নাছিরাবাদের পাহাড়ী এলাকা গুলোতে লুকায়িত বহু নরকংকালের অস্তিত্ব আজো পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ঝাউতলা এলাকার বিভিন্ন সেফটি ট্যাঙ্ক, পাহাড়ী ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে অনেকগুলো কংকাল দেখতে পেয়েছি।

সীতাকুন্ডের শিবনাথ পাহাড়ে কয়েক হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে। মিরেশ্বরাইয়ের জোরারগঞ্জ এবং ওয়ারলেস এলাকাতে মানুষ জবেহ করার স্হায়ীকেন্দ্র স্হাপন করা হয়েছিলো। রাস্তার ট্রাক, বাস এবং ট্রেন থেকে হাজার হাজার লোককে ধনে এনে আটক করে রাখা হতো এবং প্রতিদিন ৫০ জন অথবা ১০০ জন করে হত্যা করা হতো।

এ সমস্ত এলাকাতে অসংখ্য কবর আজো দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের পরিহিত কাপড়-চোপড়, জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদিও এখানে সেখানে পড়ে আছে। স্হানীয় জনসাধারণের ধারণা মতে শুধু মিরেশ্বরাই ও সীতাকুন্ডের বধ্যভূমি গুলোতে ১৫ থেকে ২৫ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে।

এ ছাড়া রাউজান, পটিয়া ও বাঁশখালী ইত্যাদি থানাতেও প্রায় অনুরুপ হারে গণহত্যা চালানো হয়েছে।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
রংপুরের দু'টি গণসমাধি	পূর্বদেশ	৩০ এপ্রিল, ১৯৭২

দলিলপত্র, ৮ম খন্ড পৃ ঃ ৫৭৮

রংপুরের দু'টি গণসমাধির সন্ধান লাভ

রংপুর, ২৬শে এপ্রিল (বাসস)।-এখানে দু'টি গণসমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি রংপুর ক্যান্টনমেন্টের কাছে, আর একটি শহর থেকে চারমাইল দূরে সাহেবগঞ্জ গ্রামে। একটি বিশেষ গণহত্যা অনুসন্ধানকারী দল এ গণসমাধিগুলোর সন্ধান দেন।

ক্যান্টনমেন্টের কাছের গণসমাধিটিতে প্রায় দু'শ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। ডাঃ জিকরুল হক এম সি এ কেও এখানে হত্যা করা হয়েছে। সৈয়দপুরের কʼজন

মাড়োয়ারীকেও এখানে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট সেখানে থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

সাহেবগঞ্জ গণসমাধি হত্যাকান্ডের আর একটি লীলাক্ষেত্র। এখানে ১৯ জন বাঙ্গালী সামরিক অফিসার ও সৈনিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একজন অফিসারের পকেট থেকে একটি ফটো ও চিঠি পাওয়া গেছে। অনুমান করা হচ্ছে সে অফিসারটি একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর লিখা পত্রে তাঁকে চাকুরী ছেড়ে পালিয়ে যাবার অনুরোধ ছিল।

হত্যাকান্ডের শিকার সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের হাত বাঁধা ও চোখ তুলে ফেলা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
একাত্তরে রংপুরের আলমনগার	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

দলিলপত্র ৮ম খন্ড পৃ ঃ ৬০৯
১৯৭১ ঃ আলমনগার, রংপুর

তিনটি গুলী, তিনটে শব্দ, তিনটে দাগ বাসু মিঞার। একটি চোখে, একটি মুখে, একটি বুকে। বাসু মিঞার আর এক নাম মোহাম্মদ ইসমাইল মিঞা। তিনি রংপুর শহরের আলমনগার নিবাসী একজন জনগণমান্য দেশবরেণ্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন।

তার অপরাধ তিনি ধনী এবং আওয়ামী লীগার। তাকে যেদিন মারা হয় আমি সেদিন রংপুরে। একাত্তরের এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে স্বপরিবারে নিজস্ব মোটরে করে শহর থেকে পালালেন দূর মফস্বল-"পদ্মাগঞ্জে"। বাসু মিঞা পালানোর কয়েক দিন আগেই তার বাড়ীর পাশের পাড়ার (মোড়ল) আজিজ মিঞাকে খান সেনারা রংপুর প্লাটফর্ম থেকে অবাঙ্গালীদের ইশারায় ধরে নিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত সে আজিজ মিঞা আর ঘরে ফিরে আসেননি। আমি তখন স্বয়ং রংপুর প্লাটফরমে দাঁড়ানো।

বাসু মিঞা পালালেন জানাজানি হয়ে গেল অবাঙ্গালীদের মধ্যে। শুরু হল তার তল্লাশী। এদিকে শহরে ধরপাকড় করে পথে-ঘাটে সমানে গুলী করে মারছে খান সেনারা বুনো শুয়োরের মত।

একদিন শহরের গণ্যমান্য সর্বপরিচিত এগারজন বাঙ্গালীকে হাত পা বেঁধে মাহিগঞ্জ শ্মশানে রাত বারটায় গুলী করে মারে। তার মধ্যে একজন ভদ্রলোক "ডাঃ মন্টু"। তিনি প্রথম গুলীর আওয়াজে মুহুর্তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান ঘাতকের অগোচরে। এগারজনের উপর প্রায় ৩০/৪০ টি বুলেট চালিয়ে চলে যায়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ডাক্তার মন্টু মরেননি। শেষ রাতের দিকে তিনি আহত অবস্থায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে শ্মশান ও বাঁধন মুক্ত হয়ে ভারতের কোন এক

হাসপাতালে যেয়ে ভর্তি হন। মৃত দশজনের মধ্যে জরজেট মিএগার জন্য আজও রংপুরের লোক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লেঃ কর্নেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	'বাংলাদেশ গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা।	১৯৭২

লেঃ কর্নেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর
॥ শামসুল হক আলীনুর ॥

দলিলপত্র, ৮ম খন্ড পৃ ঃ ৬১৫-৬১৭

"আমার হাতে একটা পিস্তল তুলে দিয়ে তিনি বললেন, কর্নেল শাহনুরের বদলা হয়তো আমার ওপর থেকেই ওরা নেবে।তোমাকে আত্মরক্ষার জন্যে পিস্তল দিয়ে গেলাম। ওরা তোমার ওপরও আক্রমণ চালাতে পারে।

কথাগুলো বলেই তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সশস্ত্র পাক সেনারা তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে গেল। তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি।"

পাক-হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত ৪০ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের পত্নী মিসেস জেবুন্নেসা জাহাঙ্গীর বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

"বাংলার মাটি আর বাংলার মানুষের প্রতি ভালবাসাই ছিল তার সবচেয়ে বড় অপরাধ। তা না হলে কেন এমন হবে ? আমার স্বামী কোন অন্যায় করেননি। তবু কেন ওরা আমার স্বামীকে নির্মমভাবে হত্যা করলো? তিনি বাঙ্গালী-এটাই কি তার সবচেয়ে বড় অপরাধ?" একটু থেমে কথা বলছিলেন মিসেস জেবুন্নেসা জাহাঙ্গীর।

তিনি বলছিলেন একাত্তরের উনিশে মার্চের একটি ঘটনা। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে উচ্চ পদস্থ আর্মি অফিসারদের জরুরী কনফারেন্স। আলোচনার বিষয়-বাংলাদেশের যুব সমাজকে সমূলে উৎখাত করতে হবে। উক্ত কনফারেন্সে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি, লেঃ কর্নেল ইয়াকুব মালিক, মেজর আগা বোখারী, মেজর সুলতান (বেলুচ রেজিমেন্টের লোক) সহ অনেক উচ্চপদস্থ পাক আর্মি উপস্থিত ছিলো। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো-বাংলার সংগ্রামী যুব সমাজকে এলোপাথাড়ি ভাবে হত্যা করা হবে। কিন্তু প্রস্তাবের বিরোধীতা করলেন লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীর। না, তা হতে পারে না, অসম্ভব। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি সেদিন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

আর এরপর থেকেই কোন কনফারেন্সে জনাব জাহাঙ্গীরকে ডাকা হতো না। তিনি যেতে চাইলেও তাকে ঢুকতে দেয়া হতো না।

"এর ক'দিন পর সাহেবজাদা ইয়াকুব আমার স্বামীকে ডেকে পাঠান এবং ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যেতে বারণ করেন" বললেন মিসেস জাহাঙ্গীর।

তারপর এলো পঁচিশে মার্চ। সেদিন রাত সাতটার দিকে ব্রিগেডিয়ার শফি লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরকে ডেকে পাঠান ক্লাবে। ক্লাব থেকে ফিরে এসে তিনি আমাকে জানান আজ রাতের বেলায় ওরা হয়তো বাঙ্গালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওদের কথাবার্তায় তাই মনে হয়েছে। কথা শেষ না হতেই ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাতি নিভে গেল। রাতে আমরা আর ঘুমাইনি। শুধু মেশিন গান, কামান আর ট্যাঙ্কের শব্দে বার বার শিউরে উঠলাম। মাঝে মাঝে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মানুষের অসহায় চিৎকারও শুনতে লাগলাম। ক্যান্টনমেন্টের বাইরে আগুন দেখা গেল। আমার স্বামী আমাদের সান্তনা দিতে লাগলেন।

ভোরবেলা দেখলাম আমাদের বাসার সম্মুখে আরটিলারী গান বসিয়ে ওরা কয়েকজন বসে আছে। যেন আমরা বাইরে বেরুতে না পারি।

লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীর বুঝতে পারলেন তিনি বন্দী। আর তাই তিনি ফোন করে তার ইউনিটের বাঙ্গালী সৈনিকদের সুযোগ বুঝে পালিয়ে গিয়ে বাংলার মুক্তিসংগ্রামে শরীক হতে বললেন। দূরালাপনীতে তিনি তার ইউনিটের বাঙ্গালী সৈনিকদের বললেন মরতে যদি হয় তাহলে বীরের মতোই মরো। আমিও তোমাদের কাতারে এসে শামিল হচ্ছি। কথা শেষ করে ব্রিগেডে যাবার উদ্দেশ্যে বাইরে এসে দাঁড়াতেই পশ্চিমা হানাদার বাহিনী তাকে বাধা দেয় এবং বলে-"আপনার বাইরে যাওয়া চলবে না।"

২৯শে মার্চ রাতে ফোনে তিনি খবর পেলেন চট্টগ্রামের কুমিরায় যুদ্ধ করতে গিয়ে বাঙ্গালী সৈনিকদের হাতে লেঃ কর্নেল শাহনুর নিহত হয়েছেন।

৩০শে মার্চ খুব সকালে একদল পাঞ্জাবী দানব বাসা থেকে তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে গেল, যাবার আগে আত্মরক্ষার জন্য তিনি আমাকে একটা পিস্তল দিয়ে গেলেন। এরপর আমি তার আর কোন খোঁজ পাইনি।

স্বামী নেই, ঘরে খাবার নেই। দুধের শিশু কাঁদছে, দুধ নেই। এক ফোটা পানিও নেই। ঘরের বাইরে গোলাগুলী চলছে। বাইরে বেরুবার পথ বন্ধ। এক ফোটা পানির জন্যে ছটফট করছে আমার সন্তানরা। তবু দানবরা পানি দেয়নি। খাবার দেয়নি। কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মিসেস জাহাঙ্গীর। আর ঠিক সেই সময় মিসেস জাহাঙ্গীরের ছোট ছেলে আরিফ বললো-"পানির জন্যে আমার আল্লাহ্‌র কাছে কত কেঁদেছি। তারপর থেকেই আল্লাহ্‌ বৃষ্টি দিয়েছেন। আর আমরা সেই বৃষ্টির পানি পান করেছি। পাত্রে জমিয়ে রেখেছি।"
বৃষ্টি না হলে ছেলেমেয়েদের বাঁচানো যেতনা, অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন মিসেস জাহাঙ্গীর।

এমনিভাবে ক'দিন অনাহারে কাটার পর নরপিশাচরা তাদেরকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার একটি স্কুলে আটক করে রাখে। সেই স্কুলে বাঙ্গালী আর্মি অফিসার ও সৈনিকদের অনেক পরিবারকে আটকে রাখা হয়েছিল।

তারপর এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে মিসেস জাহাঙ্গীর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে তিন শিশু সন্তান মারুফ (১৩), আরিফ (১০) ও দু'বছরের মিমির হাত ধরে বেরিয়ে এলেন।

তিনটি শিশু সন্তান সহ মিসেস জাহাঙ্গীর প্রাণে বাঁচলেন, কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না তার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে।

মিসেস জেবুন্নেসা জাহাঙ্গীর আমাকে জানান যে, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট অবস্হান রত অধিকাংশ বাঙ্গালী অফিসার ও সৈনিকদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে তার স্বামী লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীর সহ লেফটেন্যান্ট ফারুক, ক্যাপটেন হুদা, ক্যাপটেন বদরুল আলম, মেজর ইসলাম, মেজর খালেক, মেজর মুহিদুল জামালের নাম তার স্মরণ আছে বলে তিনি আমাকে বলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা লাভের পর কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে অসংখ্য বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। সে সব বধ্যভূমি থেকে লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীর সহ অগণিত বাঙ্গলী আর্মি অফিসার ও সৈনিকদের নরকংকাল উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরের দেহাবশেষ সমাধিস্থ করেন।

পত্র পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প ও চুকনগরে গণহত্যা
শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার ইতিহাসের স্বরূপ অনুসন্ধান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার সেদিন মুহূর্তেই চুকনগর হয়ে ওঠে লাশের জনপদ, বধ্যগ্রাম

ফজলুল বারী

চুকনগর ক্যাম্প দিয়ে শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার ইতিহাসের স্বরূপ অনুসন্ধানের নতুন অধ্যায়। চুকনগরের লোকজন পাকিস্তানি শাসকদের তৈরি হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের কথা শুনে হাসেন। ওই রিপোর্টে যে জায়গাটি ছিল সেটি এখন সবুজ ফসলের মাঠ। সেই মাঠের দিকেই আঙ্গুল উচিয়ে গ্রামের এক বয়স্ক চাষী বলেন, আপনারা শহরের মানুষ যেটা বধ্যভূমি বলেন, এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি। এখানেই মাঠের মাটির নিচে শায়িত হাজার হাজার বাঙালি সন্তান।

১৯৭১ সাল ২০ মে । দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের কয়েক জেলার প্রায় ১০ হাজার মানুষ হানাদার বাহিনীর তাড়া খেয়ে এসে সমবেত হয়েছে চুকনগর বাজারে। পিছনে তাড়া করেছে সম্মুখ যমদূত, হায়েনা বাহিনী, তাদের সহযোগী রাজাকার আলবদর দল। পিছনে শুধু মৃত্যু, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের প্রতাপ। প্রাণভয়ে, সম্ভ্রমহানির ভয়ে এই মানুষেরা চুকনগর এসে উঠেছিলেন এখান থেকে কেশবপুরের গ্রামের ভিতর দিয়ে ভারতে পাড়ি জমানোর উদ্দেশ্যে। এলাকাটি খুলনা শহর থেকে প্রায় ৩২ কিঃমিঃ পশ্চিমে, খুলনা-সাতক্ষীরা সড়কের পাশে। ১৮মে থেকে

লোকজন আসতে শুরু করে। ২০ মে সকাল নাগাদ তাদের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। বাজারের পাশে, এখানে সেখানে নিদ্রাহীন ক্লান্ত মানুষগুলো বিশ্রাম নিচ্ছিল। কেউবা ব্যস্ত ছিল রান্না-খাওয়ার আয়োজন প্রস্তুতি নিয়ে।রাজাকাররা তাদের বাপ পাকিস্তানি বাহিনীকে খবর দেয়। তিন গাড়ি বোঝাই হায়েনা বাহিনী পৌঁছে যায় চুকনগরে। নিরস্ত্র মানুষগুলোর ওপর বেপরোয়া গুলি করতে করতে হায়েনা বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। যাকে যেখানে সামনে পেয়েছে তারা গুলি করেছে। বিলের মাঝে ঘেরাও অবস্থায় গুলি করে হত্যা চলে। গ্রামে ঢুকে হত্যা চলে, নদীর তীর ধরে চলে গণহত্যার বিভীষিকা। সকাল ১০ টা-সাড়ে ১০টা থেকে ৪/৫ ঘন্টা চলেছে এই গণহত্যা। মুহুর্তে চুকনগর হয়ে যায় লাশের জনপদ। বধ্যগ্রাম। লাশের ওপর লাশ, মায়ের কোলে শিশুর লাশ, স্বামীকে বাঁচাতে স্ত্রী জড়িয়ে ধরেছিল। বাবা মেয়েকে বাঁচাতে জড়িয়ে ধরেছিল। মুহুর্তে সবাই লাশ হয়ে যায়। ভদ্রা নদীর পানিতে বয় রক্তের নহর, ভদ্রা নদী হয়ে যায় লাশের নদী। কয়েক ঘন্টা এমন গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানিদের গুলির মজুদ ফুরিয়ে গেলে তারা চলে যায়। দূরে থেকে যারা দেখেছে এই ভয়াবহ গণহত্যার বিভীষিকা, পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে গেছে দেখে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। তাঁদের বেশ কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ইনস্টিটিউটের অনুসন্ধানকর্মীদের কাছে শুক্রবার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁদের গণহত্যা দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন- তখন লাশ, রক্ত ছাড়া আর কিছু কোথাও ছিল না পুরো চুকনগর এলাকায়। আহতদের গোঙানির শব্দ, আহাজারি ছাড়া কিছুই শোনা যায়নি। গুলিতে যাঁরা মরেনি তাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তারপরও যারা মরেনি তাদের আহাজারির শব্দে পালিয়ে গেছে এলকার সব পশুপাখি। কয়েকজন বললেন, ৪২শ' পর্যন্ত লাশ গুনেছেন। গুনতে গুনতে পরিশ্রান্ত হয়ে লাশ গোনা বাদ দিয়েছেন। ভদ্রা নদী দিয়ে যেমন কচুরিপানার বহর যায় তেমনি ভেসে গেছে লাশের বহর। নদী দিয়ে যে কত লাশ ভেসে গেছে তা গোনাই সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ৩০ বছর পরও এই মানুষগুলো শিউরে উঠেছেন। বর্ণনা যাঁরা শুনেছেন শিউরে উঠেছেন তাঁরাও। বর্ণনা যাঁরা শুনেছেন শিউরে উঠেছেন তারাও। বর্ণনা দিতে গিয়ে একজনের চোখ দিয়ে জলধারা নেমেছে।। যাঁরা শুনেছেন তাঁরাও স্বজন হত্যার বেদনায় চোখের জল লুকাতে পারেন নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে এর মাঝে মারা গেছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন গণহত্যার লাশ গোনার অলিখিত ইতিহাস বলার জন্য যেন বেঁচে আছেন। একজন বলেছেন, এখনও অনেক রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। চোখ বন্ধ করলেই লাশ আর লাশ দেখি। আবার লাশের স্তূপ দেখি। একাত্তরে চুকনগর বাজারে বাদাম বিক্রির পেশা ছিল ইয়াকুব আলী সরদারের। গোলাগুলি থেমে যাবার পর তিনিও লাশের স্তূপ দেখতে গ্রামে ঢুকেছিলেন। ইয়াকুব আলীর সঙ্গে শুক্রবার কথা বলার সময় হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করে বললে

তিনি হাসেন। বলেন, ২৬ হাজার মানুষ মেরেছে তারা হিসাব করে; আমাদের এখানেই তো মেরেছে ১০ হাজারের বেশী।

মোঃ সামসুল হক
সহকারী হিসাব রক্ষক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
(দলিলপত্র, অষ্টম খন্ড পৃঃ ৩৫৫)

১০ই নভেম্বর। সেদিনটি ছিল ২০শে রমজান। পাহাড়তলীতে বাঙ্গালী মা বোনদের উপর বিহারী ও পাকসেনারা যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালাইয়াছিলো দুনিয়ার স্বাধীনতার ইতিহাসে তা বিরল।

১০ই নভেম্বর খুব সকাল বেলা পাহাড়তলীর পাঞ্জাবী লাইন, ওয়ারলেস্ কলোনী, বাহাদুর শাহ কলোনীর শিশু, যুবক, যুবতী, নারী, পুরুষ, বৃদ্ধকে কলোনীর বাসা হইতে জোর পূর্বক ধরিয়া আনে এবং কাহাকে কাহাকে মিলিটারী অফিসার সাহেব ডাকে বলিয়া ধোঁকা দিয়া ওয়ারলেস কলোনীর নিকটস্থ পাহাড়ে দল বাঁধিয়া নিয়া যায়। সেখানে জল্লা-াদেরা ধারাল অস্ত্র ও স্বয়ংক্রীয় অস্ত্র দিয়া দয়াময়াহীন অবস্থায় হত্যাযজ্ঞ চালায়। সকাল হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকে।

আমরা কয়েকজন আবছার উদ্দিন, আবদুস ছোবহান ও মোঃ ছাবেদ মিয়া হত্যাযজ্ঞ পাহাড়ের জঙ্গল হইতে দেখিতে পাই। সাথে সাথে ডবলমুরিং থানায় সহিত যোগাযোগ করি। কিন্ত তাহারা ছলচাতুরী করিয়া আমাদিগকে বিদায় করে।

পরে দুপুরে মুসলীম লীগ, জামাতে ইসলামী ও পি, ডি, পির দালালদিগকেও এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথা বলিয়াছি। সেইদিন নরঘাতকরা এক এক বারে আনুমানিক দুইশত লোককে হত্যা করিয়া তাহাদের শরীরের কাপড় গুলি একত্রিত করিয়া পেট্রোল দিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

১০ই নভেম্বর তিনটার সময় একজন সামরিক অফিসার সহ অনেকে ওয়ারলেস কলোনী দেখিতে আসে। সাথে আমরা প্রায় তিনশত লোক তাহাদের সাথে উক্ত জায়গায় গিয়া পৌঁছাই। হাজার হাজার নারী পুরুষের লাশ পড়িয়া আছে। কোথাও কোথাও মৃতদেহ গুলি একত্রিত করিয়া পেট্রোল দিয়া জ্বালাইয়াছে।

এই হত্যাযজ্ঞ দেখিয়া পাঞ্জাবী সামরিক অফিসার ও তাদের দালালরাও ঠিক থাকিতে পারেনাই। নর পশুরা আত্মীয় স্বজনকে লাশ দিতে অস্বীকার করে। পাহাড়ের

উপরে নির্লজ্জ অবস্থায় অনেক যুবতী ও নারী দেহ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এমনিভাবে মা বোন দিগকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সামসুল হক
৭/৪/৭৩

(চ) গণহত্যা সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিকগণের প্রতিবেদন ঃ

২৪শে মার্চ তারিখে বিদেশী সাংবাদিকগণকে ঢাকা হইতে অপসারণ করা হয়। ২৫/২৬ শে মার্চ গণহত্যার প্রারম্ভ অন্যান্য সাংবাদিকদেরও অপসারণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে কলিকাতার নিকটে ও ভারতের সীমান্তে স্থাপিত শরণার্থী কেন্দ্রগুলিতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ হইতে বিভিন্ন সময়ে পার্লামেন্ট, কংগ্রেস ও সিনেট সদস্যগণ আসিয়া শরণার্থীগণের অবস্থা চাক্ষুস দেখেন। তাহাছাড়া, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত অনেক বিদেশী এবং আগত সাংবাদিকগণ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত গণহত্যা সম্পর্কে তাহাদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। নিবে তাহার কয়েকটি মাত্র বর্ণনা করা হইল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ববংগে গণহত্যা সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলীয় সদস্য স্তুস্য মিঃ ব্রুস ডগলাস ম্যান-এর বক্তব্য।	আনন্দবাজার	২৪ এপ্রিল, ১৯৭১

দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড পৃঃ ১১৬

ভিয়েৎনামে 'মাইলাই' একটি ব্যতিক্রম, আর গোটা পূর্ববঙ্গই মাইলাই

-ডগলাস ম্যান
(স্টাফ রিপোর্ট)

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল-ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিকদলের সদস্য মিঃ ব্রুস ডগালাসম্যান আজ এখানে বলেন যে, ভিয়েৎনামে মার্কিন ফৌজ সাধারণ মানুষের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, ইয়াহিয়াশাহীর বর্বরতা তাকেও হার মানিয়েছে। তিনি বলেন, ভিয়েৎনামে মাইলাই একটি ব্যতিক্রম, আর গোটা পূর্ববঙ্গই মাইলাই।

আজ সকালে কলকাতা প্রেস ক্লাবে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের এক বৈঠকে তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গে নরহত্যা অভিযান বন্ধ করার জন্য, পাকিস্তান সরকারেকে যুক্তির পথে চলতে বাধ্য করার জন্য সারা বিশ্বকে উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে।

ভারতবর্ষ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে বলে পাকিস্তান যে অভিযোগ করেছে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে মিঃ ম্যান বলেন,

এই ব্যাপারে ভারতবর্ষ যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছে। যথেচ্ছা নরহত্যাকে তিনি কোন মতেই একটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মনে করতে পারেন না।

কলকাতার পাক ডেপুটি হাই কমিশন যেভাবে আনুগত্য পরিবর্তন করেছে, ইংল্যান্ডে সেই রকম কিছু হলে আপনি কি করতে বলতেন?-এই প্রশ্নের জবাবে মিঃ ম্যান বলেন, তিনি একজন আইনজীবী। আইনের কথাই তিনি ভাবতেন। কেউ বাড়ী জবর দখল করেছে মনে হলে ইংল্যান্ডেও আইনের আশ্রয় নেওয়াই একমাত্র পথ।

তিনি জানান, বৃটিশ পার্লামেন্টের ২২০জন সদস্য পূর্ববঙ্গে যুদ্ধবিরতির দাবী জানিয়ে পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে তিনিই প্রথম স্বাক্ষরকারী। ইংল্যান্ডে বাংলা দেশের জন্য যে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়েছে, মিঃ ডগলাস ম্যান তার চেয়ারম্যান।

তাঁর ধারণা, ইংল্যান্ডের সরকারের মনোভাব পাল্টে গেছে। ওখানকার সংবাদপত্রগুলি সুস্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তানী বর্বরতার নিন্দা করেছে। হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এই হত্যা বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ এবং অনান্য সরকারকে অর্থনৈতিক ব্যবস্হা প্রয়োগ করতে হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ ঘটনাবলীর উপর বি বি সি-গৃহীত জন স্টোনহাউসের সাক্ষাৎকার।	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৭ এপ্রিল, ১৯৭১

দলিলপত্র ত্রয়োদশ খন্ড পৃঃ ১২১

JOHN STONEHOUSE'S INTERVIEW WITH BBC ON APRIL 27,1971

On his return to London, John Stonehouse was interviewed on the Today Programme of B.B.C. on April 27, Stonehouse said that "terrible" things had happened in East Bengal, things which have not been seen since the last war. Describing it further Stonehouse said that what had happened in East Bengal "makes Vietnam look like a tea-party." He talked in particular of the incident at Dacca University on March 25, When staff and Students were "rounded up and shot in cold-blood." He expressed great regreat that a "98 per cent" vote for a democratically held election had not only been refused its just deserts but had been subjected to a policy of repression by the military junta. "We must be concerned about this; we can't wash our hands off this," said John Stonehouse.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশর নির্যাতনের ওপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদেনর	এ্যাকশন বাংলাদেশ; উদ্ধৃতি ঃ দি গার্ডিয়ান।	২৭ মে, ১৯৭১

পূনঃপ্রচার।		

দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড পৃঃ ১২৫

REPRINTED FROM THE GUARDIAN, MAY 27, 1971 BY ACTION BANGLADESH, 34, STRATFORD VILLAS, LONDON, N.W-1.

East Bengal atrocities

Sir,-We are not reporters with little time to spare looking for the best stories. We have each lived in West Bengal for most of 20 years and we have talked at random with hundreds of refugees in the course of our relief work among them. The total picture of what has been happening in East Bengal is clear to us without any shadow of doubt.

There are scores of survivors of firing-squard line-ups. Hundreds of witnesses to the machine-gunning of political leaders, professor., doctors, teacher and students.

Villages have been surrounded, at any time of day or night, and the frightened villagers have fled where they could, or been slaughtered where they have been found, or enticed out to the fields and mown down in heaps. Women have been raped, girls carried of to barracks, unarmed peasants battered or bayoneted by the thousands.

The pattern, after seven weeks, is still the same. Even the least credible stories, of babies thrown up to be caught on bayonets, of women stripped and bayoneted vertically, or of children sticed up like meat, are credible not only because they are told by so many people, but because they are told by people without sufficient sophistication to make up such stories for political motives.

We saw the amputation of a mother's arm and a child's foot. These were too far from the border, and gangrene developed from their bullet-wounds. Many saw their daughters raped, and the heads of their children smashed in. Some watched their husbands, sons, and grandsons tied up at the writs and shot in more selective male elimination.

No sedative will calm a girl now in Bongaon Hospital-she is in a permanent delirium crying “ They will kill us all, they will kill us

all......” Next to her is a girl still trembling from day-long raping and a vaginal bayonet would.

About 400 were killed at Jhaudanga while on their way to India, surrounded and massacred. Why ? Lest they take tales to India? Or because choosing a certain democratic system under Sheikh Mujib means forfeiting the right to live in any country ?

Most vicious of all perhaps was the attempted annihilation of the East Bengal regiment. Few of the 1st Battalion escaped through a curtain of bullets fired by those who the previous day were their mates in the mess. It was symbolic of the betrayal of the whole of the eastern province.

The insensate furry follows the contempt of years: explotation had been chronic-rice had become double the price it sold for in the western province. Mujib’s men were ready to reestablish justice democratically and peacefully, and gained an overwhelming mandate from the people in the December elections 167 out of 169 seats. But Yahya Khan’s military junta and Mr. Bhutto could not stomach the humiliation implied.

Is this to be regarded as India’s problem ? It should be no more hers than anyother country’s. What is the West doing ? The big event is over, the heavy print of Pakistan receds, the tragedy is stale, who will fund the relief operations ? Who will campain for this ?

Are the political complexities so much a gag ? Has no government or people the voice that can sound out with the authentic ring of passion in support of the victims ? Is there no consensus out of which can be heard a creative answer ?

(Rev.) John Hastings,
(Rev.) John Clapham,
Sudder Street Methodist Church, Calcutta.

ROLF RANGE, NORWEGIAN CHURCH RELIEF.

(দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড, পৃঃ ১৮১-১৮২)

We were a group of Norwegians visiting Cooch Behar in the northern part of India to get an impression of the refugee situation.

One TV reporter, two cameramen and I, previously a journalist, at present Information Officer in Norwegian Church Relief. Our first impression: too much propaganda. We did not see many refugees, and as a journalist, I did not have confidence in the newspapers available. To me it appeared as pure propaganda all these stories about burning villages, massacres and raping.

When we told about our opinion they replied: Wait, you will see things yourself at the boundary !

An early morning in May we approached the border to East Pakistan. The sun had just risen, the dew drops were glittering and the landscape was idyllic. Vast green rice fields and small cluttering of palms. After a half hour of waiting we saw people coming up the road.

They were refugees-an endless stream of people. We counted five hundred ox-carts and on both sides of the vehicles walked people. Seven or eight men abreast. Young and old. They started to walk faster, raised their hands and started to yell. They appeared to be very eager to tell us of their plight.

The people up in front started running towards us, yelling and pointing in the direction from where they had come. None of us spoke Bengali, but it was not difficult to understand.

The village which they had been forced to leave was burning. An old white haired man lifted his hands towards heaven and cried out his grief. With gestures he told us that all his eight children had been killed. A finger across the throat told the story. The fefugees were so eager to tell their story that they in fact did not discover we did not know the language.

A man caught my arm with a strong grip. He carried a little girl on his arm. He pointed at the girl and I grasped that he wanted to tell me something about the mother of the little girl, his daughter. Something horrible had happened to her –some place inside East Pakistan. Twice he tried to tell me his story. Each time he swallowed and started to open his mouth. And each time he burst into helpless crying. He held my arm and cried out his sorrow.

A women looked at me without saying a word. Tears trickled down her cheeks. The children got frightened seeing their parents crying so openly and started to shriek out, Several of the grown-ups put up their hands to hide their faces and passed us without saying anything. We were now in the middle of the refugee stream, a tremendous river of people.

On both sides people were passing us with faces wet with tears, on the oxcarts people lay outstretched, some wounded. A man went by hitting and hitting the oxcart with his bare fist. Others looked ahead with frozen faces, stiffened by sorrow.

I threw a look at the cameraman, and discovered he had trouble in filming. He kept drying his eyes all the time to get rid of the tears. He fought with himself to look into the camera, but his crying intensified. At last he helplessly threw out his hands. He could not take it. The TV reporter from Norwegian Broadcasting Corporation had been talking all the time. I heard him saying : "Something terrible has happened. These people are coming from a burning village. There has been shootig and many people have been killed. They tell us that ....I cannot tell you more. We will make the pictures speak."

And then I discovered he was unable to speak. He also was crying. Then I couldn't take any more. Tears came bursting, and we all left the road and went aside, letting the refugees pass.

Four tough men not being tough at all ....

Romano Cagnoni, Photographer

(দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড, পৃঃ ১৮৮)

I was in Biafra for six months. I hoped I would never see a tragedy on that scale again. The situation in Bengal in its beginning is worse than Biafra at the end of the war.

Dr. Meyer Caritas

So many marasmic children are seen suck the breast and looking like wizened old men, that the mothers get used to the idea

of having a very thin child and do not become unduly alarmed at the sight. In fact, they would rather leave the child alone than coax him to take any extra rice or dahl if the child refuses to take anything at all-even fluids.

Malnutrition claims a considerable umber of lives a day in each camp. To counter-act this menace, Operation Lifeline has been inaugurated under the Red Cross Umbrella and supported by the Government of India. Each participating voluntary agency retains its own autonomy and identity.

What are the reasons for this acute incidence of marasmus and kwashiorkor ? Change of dietary constituents is not the only factor, as the refugees have been living under more severe conditions before coming to salt Lake camp. In peace time, fish comprised a large part of their diet and now it is unavailable, except for a small quantity which the refugees sell themselves in the local shops they have constructed along the roads into the camps.

Protein deficiency becomes inevitable. Other factors are dysentery, worm infestations, measles, and chest and skin infections which interfere with the child's appetite and cause loss of weight. Once the child has reached the crucial point of being 60% below his normal standrard of weight, there is very little hope of recovery by maternal care alone.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সিনেটর কেনেডী।	সিনেটর কার্যবিবরণী।	১লা এপ্রিল, ১৯৭১

COMMENTS BY SENATOR KENNEDY ON SITUATION IN EAST PAKISTAN

(দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড, পৃঃ ২৮১)

Mr. KENNEDY. Mr. President, reports from East Pakistan tell of a heavy toll being paid by the civilian population as a result of the current conflict. It is a story of indiscriminate killing, the execution of dissident political leaders and students, and thousands of civilians suffering and dying every hour of the day. It is a story of dislocation and loss of home. It is a story of little food and water. And coming in the aftermath of tragedy by natural disaster, the

current violence and near total disruption of government services in East Pakistan is compounding an already difficult situation. It threatens near famine for millions-and the spread of epidemics and disease.

I do not speak today to blame or condemn, or to offer any magic solution for meeting the political and humanatarian problems in East Pakistan. But as chariman of the Judiciary Subcommittee on Refugees, I do wish to express a deep personal concern over the plight of the people in East Pakistan, which seems to be just another link in a chain of warravaged polutions stretching around the world in recent years.

Inevitably, the situation of civilians in East Pakistan is taking second place to the political issues at stake-and to the interests of those who have much to lose, or to gain, by the outcome of the battle. But the people of Dacca, of Chittagong, and of the villages and towns throughout the area also have interests. For many, apparently it is mere survival. The situation in East Pakistan should be particularly distressing to Americans:; for it is our military hardware-our guns and tanks and aircraft-which is contributing much to the suffering. And this is being done, apparently in violation of negotiated agreements on the use of American military aid to the central Pakistan Government.

Mr. President, I fully appreciate the immense difficulties in the East Pakistan issue. It is a complex matter for diplomats and humanatarians alike. But should not our Government condemn the killing ? Should we not be more concerned about the fate of millions of civilias who are caught in the crunch of this conflict ? Should we not offer our good services to stop the violence-or at least encourage and support others in such an effort ?

It is to be hoped that our Government will give some evidence to reflect a growing concern among many American over recent developments in East Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ থেকে ডঃ জন ই,রোড কর্তৃক সিনেটের উইলিয়াম বি, স্যাক্সবীকে লিখিত চিঠি।	সিনেটের কার্যবিবরণী।	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

S 5810 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE April 29, 1971
RECENT EVENTS IN EAST PAKISTAN

দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ডঃ পৃঃ ২৯৩-২৯৫

Mr. SAXBE. Mr. President, I recently received a letter from a physician who worked in East Pakistan under USAID. He gives a good account of the recent events in East Pakistan. As you know, I objected last year to the sale of $ 15,000,000 worth of military equipment to Pakistan because I feared the tragic consequences of this action, I have just co-sponsored Senate Concurrent Resolution 21 which urges the suspension of our military assistance to Pakistan until the conflict is resolved.

I ask unanimous consent to have printed in the RECORD the letter from Dr. John E. Rohde because I feel that Senators should the benefit of his insight.

HUDSON, OHIO, April 17, 1971.

Hon. WILLIAM B. SAXBE.
New Senate Office Building,
Washington, D.C.

DEAR SENATOR SAXBE : Two days ago my wife and I were are evacuated from Dacca, East Pakistan where I have been posted for the past three years as a physician under USAID. I am certain that you are aware of the political events preceding the army crackdown on March 25th. As a result of complete censorship and the expulsion of journalists, banning of the major political party in Pakistan, and repressed information about the military campaign against the civilians of East Pakistan, it must have been difficult to obtain a clear picture of events since that date. From the outset of the army action, the American Consul General and his staff in Dacca, have continued to send detailed factual accounts enumerating first hand reports of the situation. These reports have been carefully collected and verified before transmission to the State Department. Publicly the State Department claims they do not have enough facts; but I have seen the factual reports sent daily from Dacca. The American Consul In Karachi stated to me that they only recently began to receive the accounts about the situation in

East Pakistan, when the Consulate in Dacca has been transmitting information from the very start of the action.

Although Consul Blood's reports contain a more detailed account of the current situation. I wish to bring to your attention the observations. I have made in the past weeks in Dacca. My wife and I watched from our roof the night of March 15th as tanks rolled out of the Cantonment illuminated by the flares and the red glow of fires as the city was shelled by artillery, and mortars were fired into crowded shums and bazars. After two days of loud explosions and the continual chatter of machine guns, we took advantage of a Break in the curfew to drive through the city. Driving past streams of refugees, we saw burned out shacks of families living by the railroad tracks coming from Gulshan to Mohakhali crossing. A Bengali friend living close by had watched the army set fire to the bovica, and as the families ran out, he saw them shot down "like dogs" He accepted our offer to take him and his family of twelve into our home. In the old city we walked thorugh the remains of Nayer Bazaar, where Moslem and Hindu wood cutters had worked, now only a tengle of iron, and sheet and smouldering ruins. The Hindu shopkeepers and craftsmen still alive in the bombed ruins of Shankari Bazar, begged me to help them only hours after the army had moved in with the intention to kill all inhabitants. One man had been shot in the abdomen and killed only one half-hour before we arrived. Others were lying in the streets rotting. The day before we were evacuated. I saw Moslem names in Urdu, on the remains of houses in Shankari Bazaar, previously a totally Hindu area. On the 29th we stood at Ramna Kali Bari, an ancient Hindu village of about two hundred fifty people in the Center of Dacca Ramna Race Course, and witnessed the stacks of machine-gunned, burning remains of men, women and children butchered in the early morning hours of March 29th I photographed the scene hours later.

Sadarghat, Shakaripatti, Rayer Bazaar, Nayer Bazaar, Pailpara and Thatari Bazaar are a few of the places where the homes of the thousands are razed to the grounds.

At the university area on the 29th, we walked through Jagannath Hall and Iqbal Hall, two of the student dormitories at

Dacca University shelled by army tanks. All inmates were slaughtered. We saw the breach in the wall where the tank broke through, the tank tracks and the mass grave in front of the hall. A man who was forced to drag the bodies outside, counted one hundred three of the Hindu students buried there. Outside were the massive holes in the walls of the dormitory, while inside were the smoking remains of the rooms and the heavily blood-stained floors. We also saw evidence of tank attack at Iqbal Hall where bodies were still unburied.

The two ensuring weeks have documented the planned killing of much of the intellectual community, including the majority of professors of Dacca University. These include : Professor G.L. Dev, Head of the Philosophy Department; Professor Moniruzzaman, Head of the Department of Statistics; Professor Jotirmoy Guhathakurta, Head of the English Department; Dr. Naqvi and Dr. Ali, Head of the Department of History; Professor Innasali, Head of the Physics Department and Professor Dr. M.N. Huda, Head of the Economics Department, former Governor and Finance Minister were shot in their quarters, injured and left for dead. Many families of these professors were shot as well. Full documentation of the people is difficuli due to the army's thorough search leaving Dacca. Complete censorship was facilitated when three prominent mass circulation dailies were burned: The People, The Ittefaq and the Sangbad.

Military action continued after the attack of the first two days. We listened as the early morning of April first was wracked for two hours by artillery pounding Jinjira, a town across the Buriganga from Dacca, that had swollen in size with an estimated one hundred thousands civilians fleeing terrorized Dacca. Radio Pakistan continued to broadcast that life in Dacca had returned to normal but we witnessed a nearly a deserted city.

In Gulshan, one of the suburban area of Dacca, where we lived, we witnessed the disarming of the East Pakistan Rifles, stationed in the Children's Park across the street, the army looting the food supplies from the market nearby, and finaly the execution of several EPR as they were forced by Punjabi soldiers on to a truck to be "taken away". The mass execution of several thousands of

Bengali Policemen and East Pakistan Rifles is already documented. We also witnessed from a neighbour's house, army personnel fire three shots across Gulshan Lake at several little boys who were swimming. Nearly every night there was sporadic gun-fire near our home adding to the fear of twenty-six refugees staying with us. During the day Pakistan planes flew overhead to their bombing missions.

It would be possible for me to choronicle many specific atrocities, but we have left close friends behind whose lives might be more endangered. It is clear that the law of the juggle prevails in East Pakistan where the mass killing of unarmed civilians, the systematic elimination of the intelligentisia, and the annihilation of the Hindu population is in progress.

The reports of Consul Blood, available to you as a Congressmen, contains a more detailed and complete account of the situation. In additon, he has submitted concrete-proposals for constructive moves our government can make. While in no way suggesting that we interfere with Pakistan's internal affairs he asserts, and we support him, that the United States must not continue to condone the military action with official silence. We also urge you to read the Dhaka official community's open cable to the State Department. It is for unlimited distribution and states the facts about the situation in East Pakistan.

By not making a statement, the State Department appears to support the clearly immoral action of the West Pakistan army, navy, and air force against the Bengal people.

We were evacuated by Pakistan's Commercial airlines. We were loaded on planes that had just disembarked full loads of Pakistani troops and military supplies. American AID dollars are providing support of military action. In Teheran, due to local support of Pakistan, I was unable to wire you the information I am writing.

Fully recognizing the inability of our government to oppose actively or intervene in this desperate oppression of the Bengalies. I urge you to seek and support a condemnation by Congress and the

President of the United States of the in-human treatment being accorded the seventy-five million people of East Pakistan.

No political consideration can outweigh the importance of a humanitarian stand, reiterating the American belief in the value of individual lives and a democratic process of government. The action of President Yahya banning the democratically elected majority party, who had ninety-eight percent of East Pakistan Wings electorate backing them, ought to arose a country which prides itself on the democratic process.

We urge you to speak out actively against the tragic massacre of civilians in East Pakistan.

Sincerely yours,

JON E. ROHDE, M.D.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিনিধি পরিষদে ই, গালাঘের এর বক্তৃতা ও উদ্ধৃতি।	কংগ্রেসে কার্যবিবরণী।	১৩ মে, ১৯৭১

E. 4354 CONGRESSIONAL, RECORD-Extensions of Remarks May 13, 1971

VULTURES TOO FULL TO FLY
IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
May 12, 1971.

দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড, পৃঃ ৩০৫-৩০৬

Mr. Gallagher ....to be called............
....

The phrase in the news dispatch about "vultures too full to fly" may be regarded as vulgar by many people unfamiliar with the history and the potential for tragedy in his region. However, it does graphically reflect the position of many who are intimately familiar with past events and with informed future predictions.

[From the Washington Evening Star, May 12, 1971]
VULTURES TOO FULL TO FLY-EAST PAKISTANI CALAMITY DEFIES BELIFE

(By Mort Resenblum)

DACCA, EAST PAKISTAN.-Vultures too full to fly perch along the Ganges River in grim contenment. They have fed on perhaps more than a half million bodies since March.

Civil war flamed through Pakistan's eastern wing on March 25, pushing the bankrupt nation to the edge of ruin. The killing and devastation defy belief.

From a well at Natore, fetid geses bubble up around bones and rotting flesh.

A tiny child gazes at a break in the lavender carpet of water hyacinths in a nearby pond where his parents bodies were dumped.

TOLL COULD BE MILLION

No one knows how many Bengali families the army machine gunned of how many migrant settlers Bengali successionists slashed to death. But estimates of the total dead start at six figures and range to over a million.

In the port city of Chittagong, a bloodsplattered dool lies in a heap of clothing and excrement in a jute mill recreatiion club where Bengalis butchered 180 women and children.

Along the road to the mill, entire blocks of Bengali homes and shops were blasted and burned to the ground by the revenging Pakistani army.

Reporters were banned from East Pakistan from March 26, when 40 newsmen were bundled out and stripped of their notes and film, until the government escorted in a party of six on a conducted tour may 6-11.

From visible evidence and eye-witnesses questioned out of official earshot the following account emmerged :

Throughout March, Sheikh Mujibur Raman's Bengali dominated Awami League harassed the military government with a non-cooperation campaign demanding autonomy and more benefits from West Pakistan.

Bengalis killed some West Pakistanis in flurries of chauvinism.

Mujib's party had won a majority in the National Assembly elections and he was Pakistan's major political figure. But

negotiations in Dacca with President Agha Mohammed Yahaya Khan broke deau and Yahya flow back to West Pakistan March 25. That night the army roared out of its barracks, and East Pakistan was aflame.

PROFESORS EXECUTED

Soldiers assaulted two dormitories at Dacca University where radical Bangali students made their headquarters. They used recoilless rifles, then automatic weapons and bayonets.

They broke into selected professors' and students' quarters. They executed some 14 faculty members, at least one by mistake. Altogether, more than 200 students were killed.

Army units shelled and set fire to two newspaper offices, then set upon the Bengali population in general. More than a dozen markets were set affire, and at least 25 blocks were devastated in Dacca.

Hindu Bengali jewellery shops in the Shakari path quarter were blown apart. Two Hindu villages inside the Dacca race course were attacked with almost holy war fury by the Moslem troops.

Accounts, projected from body counts at mass graves indicate above 10,000 persons were shot to death or burned to death the first few nights in Dacca.

Official spokemen contended that the army went into action to stop a rebellion planned for 3 O'clock the next morning. They insisted that the army killed no one but those who fired at the soldiers.

But other officers said the rebellion plot was only an assumption.

Eye-witnesses said at least hundreds of the victims were women and thousands were unarmed civilians gunned down indiscriminatley.

"I took firm action to prevent heavey casualties later," said the martial law governor, Lt. Gen. Tikka Khan.

Dacca was brought under army control quickly, but word of the army action flashed through the province of 58,000 square miles and 75 million inhabitants, one of the world's most densely populated areas.

Thousands of Bengalis in the army, police, militia and border forces revolted. Under the banner of Bangladesh, the independent Bengali state, the deserters and armed volunteers fought back, seizing wide areas of the provinces before the 11,000 West Pakistani regulars could occupy them.

Bengali civilians and "liberation troops" began a mass slaughter of Mohajirs-Indian migrants from the 1947 partition-and West Pakistanis.

They raced through market places and settlements, stabbing, shooting and burning, sometimes stopping to rape and loot.

The army shelled towns and fired at anything that moved. The army action was far more brutal than anything seen in the Nigerian civil war.

Europeans likened the damage to that of the hardest hit the eaters of World War-II.

১২।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে ভয়ঙ্কর খেলা।	নিউ ইয়র্ক টাইমস।	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, SUNDAY, APRIL 4, 1971

PAKISTAN: 'ALL PART OF A GAME'-A GRIM AND DEADLY ONE

দলিলপত্রঃ চতুর্দশ খন্ড, পৃঃ ২৩-২৪

New Delhi- " All it's necessary, absolutely necessary," a West Pakistani stewardess lectured some expelled foreign newsmen about the Pakistani Army's offensive to crush the independence movement in East Pakistan. "If this happened in your country, you'd do the same thing. It's all part of the game."

A game ? To foreign newsmen in Dacca, it looked like a surprise attack with tanks, artillery and heavy machine guns against a virtually unarmed population-a population using tactics of nonviolence, mostly strikes and other forms of noncooperation, to claim the political majority it had won in last December's elections. And by this weekend enough credible reports of indiscriminate killings had filtered out to leave little doubt, even in the minds of

many dispassionate Indian officials and Western diplomats, that the Army of West Pakistan was under few restraints in putting down East Pakistani thoughts of autonomy.

The attack began on the night of March 25, after 10 days of political negotiations in which the army and the rest of the West Pakistani power establishment had lulled the East Pakistani nationalist into thinking their demands for greater self-rule would be granted.

It is clear now that the West Pakistanis never meant the talks to succeed, that they dragged them out only to buy time to get enough troop reinforcements over from West Pakistan to launch the attack. But while the talks went on, nearly every observer, from newsmen to diplomats, resisted the ugly though that this might be true. The signs were all three-troops coming in by air and sea, the dismisal of a martial-law administrator who was too lenient and the uncharacteristic silence of the army while the East Pakistanis boycotted the military regime and followed instead the directives of their leader, Sheikh Mujibur Rahman.

The newsmen reported these signs but when talk of "some progress" came out of the negotiations, they grasped upon that, because it was what should happen. They were wrong. Instead, the military mind prevailed.

But in turning to force, the West Pakistani leaders apparently misjudged both its limitations and the depth of feeling of 75 million East Pakistanis.

"They thought that a few bullets would scare the people off," said Ranjit Gupta, the police commissioner in Calcutta, just across the border in India. "It is silly-it shows you how little the West Pakistanis know about East Pakistanies."

Instead of the first shooting spree terrorizing the population into submission, it now seems apparent that while the army may be able initially to establish a hold on the cities and major towns, it will face widespread guerrilla activity in the primitive reverine countryside. This could so undermine the supplylines and mobility

at the West Pakistani troops that the independence movement would succeed.

In India, many sympathizers with the East Pakistani cause were quick to compare West Pakistani's military actions in East Pakistan with those of Hitler. "Pak Army's Inhuman Torture," was the headline in one Calcutta Newspaper. "Butchery ," said another adding; "The vandalism unleashed by the occupying Pakistani army in Bangladesh (Bengal Nation) is darker than even the darkest chapter of Nazi terror." The Indian Parliament has called it "a massacre of defenseless people which amounts to genocide."

Governments Silent

Most of the other governments of the world have rremained silent. "Why doesn't your country condemn this outrage ?" One Official in Calcutta asked an American. "This is no tidal wave, this is no act of nature-it is people slaughtering people."

The Bengalis, as the people of East Pakistan are called, have stepped across a crucial line- a line that separated grumbling about their exploration to fighting against the exploiters. The line may have been crossed on March 25, the night of the attack. Or perhaps it was crossed earlier, on March 1, when President Yahya Khan, Army Commander-in-Chief, postponed a session of the National Assembly that was to have convened two days later to begin drafting a Constitution returning the nation to civilian rule. That Assembly, elected in December, was dominated by Sheikh Mujib's Awami League party, which wanted a large measure of provincial autonomy-leaving the Central Government with power only over defense and foreign trade and foreign aid.

These terms were anathema to the West Pakistani power establishment –the army, the big-business interests and the politicians. In the political negotiations over the crisis, they started off by making conciliatory sounds and then brought in the monkey wrench, Zulfikar Ali Bhutto, the dominant political leader of West Pakistan. When he objected that the Awami League wanted too much autonomy-" bordering on sovereignty"- the talks began to stall. Then, suddenly, came the army attack.

The morning after the attack, Mr. Bhutto and his aides, under heavy military protection, were flown back to friendly terriroty in West Pakistan, where the political leader promptly announced. “Pakistan has been saved by the grace of the Almighty.”

But it will take more than religious orotory to save Pakistan as a united Moslem country. Religion was the social glue that was supposed to have held the two wings together, but it was never enough.

It may take a long time, but none of the witnesses to the recent-surge of Bengali nationalism and to the barbarism of the army attack doubts that it will happen. In the meantime, as Sheikh Mujib was fond of chanting with the adoring crowds that thronged to his now razed house : “Sangram, Sangram. Cholbey, Cholbey.” “The fight will go on. The fight will go on.”

-Sydney H. Schanberg.

১৩।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
পাকিস্তানীরা ফেব্রুয়ারি দের নিশ্চিহ্ন করেছে।	বল্টিমোর সান	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

THE SUN, BALTIMORE, SUNDAY, APRIL 4, 1971
PAKISTAN IS EXTERMINATING THE BENGALIS
By John E. Woodruff
Í
<u>দলিলপত্র চতুর্দশ খন্ড, পৃঃ ২৫-২৬</u>

Less than four months ago, the West Pakistan Army said it could not send soldiers and helicopters to East Bengal to save survivors of the cyclone that took hundreds of thousands of lives in the mouth of the Ganges. If troops and helicopters were moved from West Pakistan, India might attack, the Army said. By the time the Army Statement was issued, India was increasing its offers of relief aid for the cyclone victims.

Today, that same West Pakistan Army shows every sign of being prepared to send its last soldier to more populous East Bengal, if necessary, in an all-out effort to shoot to death the results of last December’s elections.

No room remains for doubt as to the Punjabi-dominated Army’s determination to go the whole distance.

For the only justification that could ever emerge for the grisly scenes of a week ago Thursday and Friday would be a total victory of bullets over the nonviolent attempts of the Bengalis to put in power the men they had elected in polling sanctioned by the Army.

Newsmen Toured Carnage

Correspondents interned last week at the plush Dacca International Hotel could see only fragments of what was talking place outside-a few soldiers shooting into civillian buildings, a machine-gun opening up on a dozen emptyhanded youths, the Army setting fire to civilian business places.

But two European newsmen evaded the Army and stayed behind a few extra days and they managed to tour some of the carnage before they were found out and expelled.

Their reports have confirmed the worst fears of those who were only able to surmise the meaning of cannon reports and prolonged bursts of machine-gun and automatic-rifle fire coming from the new campus of Dacca University, where two burning buildings lighted the sky for hours with their flames.

Slum Residents Killed

Hundreds of studetns were burned up in their beds and hundreds more were buried in a mass grave, according to reports filed by the two newsmen who said they toured the scene.

They also confirmed previous reliable diplomatic reports that large stretches of bamboo slums were surrounded and set a fire, their residents shot when they tried to flee.

The only bond between West Pakistan and East Bengal-other than the West Pakistan Army itself-is the Muslim faith, for which the divided country was created as a haven agaist Hindu-Muslim religious murders when India was partitioned.

Even today, the Army exercises its authority in the name of “the Islamic state of Pakistan.” Yet burning a human being, alive or dead is unequivocally forbidden by the Mohammedan faith. It is also a favourite crime charged to Hindus by West Pakistani Muslims.

Such attacks upon fellow Muslims in the name of an Islamic state can be vindicated, even in the eyes of other Mohammedan countries from which West Pakistan is apparently already seeking

aid, only by a total military victory. And any military victory will require growing, not diminishing, bloodshed as the Bengalis-unified to a man for the first time in decades-struggle to resist.

Clues as to how cooly the West Pakistanis had calculated their plan to shoot and burn the Bengalis into submission are provided by the personal actions of some West Pakistani politicians at the Hotel Intercontinental on the night the holocaust started.

৭৫।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
একটি জাতিকে হত্যা করা হচ্ছে।	নিউজউইক	২ আগস্ট, ১৯৭১

দলিলপত্র ঃ চতুর্দশ খন্ড, পৃঃ ১৬৬

NEWSWEEK, AUGUST 2, 1971

BENGAL: THE MURDER OF A PEOPLE

It seemed a routine enough request. Assembling the young men of the village of Haluaghat in East Pakistan, a Pakistan Army major informed them that his wounded soldiers urgently needed blood. Would they be donors? The young men lay down on makeshift cots, needles were inserted inthier veins-and then slowly the blood was drained from their bodies until they died.

Govinda Chandra Mandal forgets who told him first, but when he heard that an amenesty had been pledged to all refugees, he immediately set off on the long walk home. With his two teenage daughters by his side, Chandra Mandal trudged though monsoon-drenched swamp lands and past burned-out villages. When he neared his scrap of land, soldiers stopped him. As he watched in helpless anguish, his daughters were raped-again and again.

He was about 2 years old, and mother was still in her teens. They sat on ground made muddy by the steady drizzle of the summer rains. The baby's stomach was grotes quenly distended, his feet swollen, his arm no thicker than a man's finger. His mother tried to coax him to eat some rice and dried fish. Finally, the baby mouthed the food feebly, wheezed and died.

Plans for Slaughter

Within hours of Yahya's decree, Mujib proclaimed a general strike in East Pakistan. To this day, Pakistani officials maintain that

Yahya personally appealed to Mujib for a compromise that would heal the nation's wounds. But most observers believe that Yahya had other plans all the while. Weeks before the Yahya-Mujib meeting actually took place, the President and his right-hand man, Lt. Gen. Tikka Khan, were already mapping out plans for Mujib's arrest, the dissolution of the Awami League and the slaughter of nationalists.

Known as "the bomber of Baluchistan" for his indiscriminate use of air and artillery strikes in crushing a local tribal revolt ain 1965, Tikka Khan, apparently persuaded Yahya to buy time for the army to build up its strength in Bengal. Accordingly, Yahya made his bid for discussions with Mujib. And while the two leaders talked- and Bengalis as well as the world at large looked for a compromise that might save Pakistan -the army pulled off a logistics coup. Flying the long over-water route around southern India with Boeing 707s commandered from Pakistan International Airlines, the army doubled its troops strength in Bengal to 60,000 men. When Tikka gave the word that all was ready, Yahya flew out of Dacca. And that very night, the bomber of Baluchistan unleased his troops.

Under instructioins to strike brutally on the theory that a savages surprise attack would snuff out resistance quickly, the army obeyed its orders with a vengeance. Tanks crashed through the streets of East Pakistan's capital of Dacca, blasting indiscriminately at men and buildings. With cold ferocity, Punjabi soldiers machine- gunned clusters of citizens, while others set fire to slum 'busthes' throughout the city. Soon, the city was littered with bodies and the campus of Dacca University-a hot-bed of secessionism-was a bloody a shambles.

Throughout that blood-drenched night and in the days and weeks that followed, the carnage continued. And the massacres were not limited to Dacca but were carried on throughout the country-side as well. After a desperate visit to his native village on the Indian border, a sobbing Bengali journalist told how the land had been devastated : "I passed through a dozen villages which had been burned and deserted, with bodies every where being eaten by crows. The smell ! The horror ! I kept praying it would not be like

that at my village. But it was. The village was just a mass of charred rubble and corpses. My wife and child were missing. There was just one old lady alive and she could no longer talk. She just sat on the ground, shaking and moaning.

With the passing of time, the magnitude of the slaughter has diminished, but there has been no lessening in the brutality of the Pakistani army. Last week, Newsweek's Loren Jenkins, who was in Dacca the night that Gen. Tikka Khan's troops launched their campaign of murder, cabled the following report on conditions in East Pakistan now:

Four months after the first flush of bloodletting, East Pakistan still lives in fear. But instead of being the cowering, grovelling fear that the army sought to instill, it is a sullen fear tinged with quiet defiance and hate. It is a fear based on the apppreciation of a very harsh reality, not a fear that marks people of broken spirit. Walking along a Dacca street recently, I met a journalist I had known before. Our eyes met and he nodded, but he appeared embarrassed. Glancing nervously all around, he muttered, "My God, my God, civilized man cannot describe the horror that has been done." An hour later another friend explained : "We have been ordered not to talk to foreign journalists. We are scared. We live in terror of the mid-night knock on the door. So many people have been killed. So many more have disappeared. And more vanish every night."

One who vanished in the night was Mujib, who is now reportedly held in prison in the western garrison town of Mianwali. A hero before, Mujib has now become a martyr. For all his conspicious faults, he has become the symbol of Bengali patriotism. Yet Yahya, almost boastfully, told a recent visitor, "My generals are pushing for a military trial for Mujib and for his execution. I have agreed and the trial will be held soon." No policy could be more short-sighted or more likely to harden Bengali resistance. As one western diplomat told me, "Yahya is simply out of his mind. He still does not even understand what his army had done. He thinks they can kill of a couple of hundred thousand people, try Mujib for treason, force a return to order and all will be forgotten. This is utter nonsense. These people will not forget."

Guerrilla Resistance

Indeed, the minds of Bengalis are emblazoned with the memories of these months of terror. Despite the terror, signs of resistance to the army creep up everywhere. In Dacca, street urchins hawking the local papers slip mimeographed communiques from the Government-in-exile into the newspapers. On ferry boats in the countryside, where all passangers are under the watchful eyes of the army, strangers slide up and whisper of massacres or point out areas in the dense Madhupur Jungle where the "Mukti Bahini" or Liberation Army, is hiding. All over the country, the reistance is rapidly taking on the earmarks of a classic guerrilla war. And East Pakistan is ideal guerrilla terrain reminiscent of South Vietnam's Mekong Delta- a labyrinth of sunken paddies, jute fields and banana groves.

That the Mukti Bahini are capitalizing on their few assets is brought home daily. They have cut the key railroad to Dacca from the port of Chittagong and have also severed the paralled road. More than 60 percent of the interior food supplies move over those routes and there is virtually no prospect of restoring them until peace is also restored. The rebel's recent coup in blowing up three power stations in Dacca has under-scored the point that no city or village is safe from their campaign to bring the economy to a halt. Most important, however, is the fact that the rebels now seem to be winning what every guerrilla needs-the support of the populace. Two months ago, villagers in Noakhali province pleaded with the Mukti Bahini not blow up a bridge because it would bring army retaliation. Last week, those same villagers sought the guerrillas and asked them to destory the bridge.

To be sure, the guerrillas are no match for the federal army. While they have rallied some 20,000 Bengali fighters to their cause (and expect another 10,000 recruits to join them next month after clandestine training in India), the inadequately armed rebels still face 60,000 will-equipped professional soldiers. And despite its covert aid, India has cautiously hesitated to recognise the Bangladesh government-in-exile. One reason for this restrint is the genuine and costly problem the New Delhi governemnt faces in

caring for the 6 million Bengali refugees now in India. NEWSWEEK'S Tony Clifton who has reported the anguish of the refugees since the beginning of Pakistan's civil war, filed this report last week from Calcutta :

....

"But in the end, the greatest threat to Pakistan is the flaring hattred that Yahya's army has spawned. "Pakistan died in March" says a Karachi editor. "The only way this land can be held together is by the bayonet and the torch. But that is not unity, that is slavery. There can never be one nation in the furture, only two enemies."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৫। গণহত্যা	সানডে টাইমস	১৩ জুন, ১৯৭১

দলিলপত্রঃ চতুর্দশ খন্ড, পৃঃ ৩৬৫

THE SUNDAY TIMES, JUNE 13, 1971

GENOCIDE

By Anthony Mascarenhas

[A Sunday Times reporter comes out of Pakistan with the horrifying story of why five million have fled.]

West Pakistan's Army has been systematically massacring thousands of civilians in East Pakistan since the end of March. This is the horrifying reality behind the news blackout imposed by President Yahya Khan's government since the end of March. This is the reason why more than five million refugees have streamed out of East Pakistan into India, risking cholera and famine.

The curtain of silence is broken today for the first time by Anthony Mascarenhas, the Sunday Times correspondent in Pakistan. He has seen what the Pakistan army has been doing. He has left Paksitan to tell the world.

The army has not merely been killing supporters of the idea of Bangladesh, an independent East Bengal. It has deliberately been massacring others. Hindus and Bengali Muslims. Hindus have been shot and beaten to death with elubs simply because they are Hindus. Villages have been burned.

Sporadic and unconfirmed reports of atrocities by the Pakistan army have been reaching the outside world for some time, notably from refugees, missionaries and diplomats. The report by Anthony Mascarenhas is a detailed eye-witness account of unique precision and authority. He supplies themissing centre-piece of the tragedy of Bengal: why the refugees have fled.

There is a remarkable story behind Anthony Macarenhas's report.

When, at the end of March. the Pakistan army flew two divisions into East Pakistan to "sort out" the Bengali rebels, it moved in secret. But about two weeks later the Pakistan government invited eight Pakistani journalists to fly to East Bengal. The idea-as government officials left the journalists in no doubt-was to give the people of West Pakistan a reassuring picture of the "return to normalcy" in the eastern half of the country. Seven of the journalists have done as they were intended. But one was Mascarenhas, who is assistant editor of the Morning News in Karachi, and was also the Sunday Times Pakistan correspondent.

On Tuesday, May 18, he arrived, unexpectedly, in The Sunday Times office in London. There was, he told us, a story he wanted to write: the true story of what had happened in East Bengal to drive five million people to flight.

He made it plain that he understood that if he wrote his story there could be no going back to Karachi for him. He said he had made up his mind to leave Pakistan: to give up his house, most of his possessions and his job as one of the most respected journalists in the coutry. There was only one condition we must not publish his story until he had gone back into Pakistan and brought out his wife and five children.

The Sunday Times agreed, and Mascarenhas went back to Karachi. After a wait of ten days an overseas cable arrived at the private address of a Sunday Times executive.

" Export formalities completed," it read, " Shipment begins Monday."

Mascarenhas had succeeded in getting permission for his wife and family to leave the country. He himself had been forbidden to leave. He found a way of leaving anyway.

On the last leg of his journey inside Pakistan, he found himself sitting in a plane across the aisle from a senior Ministry of Information official whom he knew well. A phone call from the airport could have led to his arrest.

There was no phone call, however, and last Tuesday he arrived back in London.

Mascarenhas writes about what he saw in East Pakistan with special authority and objectivity. As a Goan Chiristian by descent, he is neither a Hindu nor a Muslim. Having lived most of his life in what is now Pakistan, having held a Pakistani passport since the State was created in 1947, and having enjoyed the confidence of many of the leaders of Pakistan since that time, he wrote his report with real personal regret.

"We were told by the Ministry of Information officials to show in a patriotic way the great job the army was doing," he told us.

There was no question of his reporting what he saw for his own paper. He was allowed to file a story, which was published in The Sunday Times on May 2, wihich reported only the events of March, 25/26, when the Bengali troops mutinied and atrocities were committed against non-Bengalis.

Even references to the danger of famine were deleted by the censor. That increased his crisis of conscience.

After some days' hesitation, he decided, in his own words, that "either I would write the full story of what I had seen, or I would have to stop writting : I would never again be able to write with any integrity." And so he got on a plane and came to London.

We have been able to check his story in great detail with other refugees in a position to have had a wide knowledge of events in East Bengal as a whole, and with objective diplomatic sources.

GENOCIDE : FULL REPORT

Abdul Bari had run out of luck. Like thousands of other people in East Bengal, he had made the miatake-the fatal mistake-of running within sight of a Pakistan army patrol.

He was 24 years old, a slight man surrounded by soldiers. He was trembling, because he was about to be shot.

"Normally we would have killed him as he ran," I was informed chattily by Major Rathore, the G-2 Ops. of the 9th Division, as we stood on the outskirts of a tiny village near Mudafarganj, about 20 miles south of Comilla. "But we are checking him out for your sake. You are new here and I see you have a squeamish stomach."

"Why kill him ?" I asked with mounting concern.

"Because he might be a Hindu or he might be a rebel, perhaps a student or an Awami Leaguer. They know we are sorting them out and they betray themselsves by running."

"But why are you killing them ? And why pick on the Hindus ?" I persisted.

"Must I remind you." Rathore said severely, "how they have tried to destory Pakistan ? Now under the cover of the fighting we have an excellent opportunity of finishing them off."

"Of course," he added hastily, "We are only killing the Hindu men. We are soldiers, not cowards like the revels. They kill our women and children."

I was getting my first glimpse of the stain of blood which has spread over the otherwise verdant land of East Bengal. First it was the massacre of the non-Bengalis in a savage outburst of Bengali hatred. Now it was massacre, deliveratεly carried out by the West Pakistan army.

The pogrom's victims are not only the Hindus of East Bengal-who constitute about 10 per cent of the 75 million population-but also many thousands of Bengali Muslims. These include university and college students, teachers, Awami League and Left Wing political cadres and every one the army can catch of the 176,000 Bengali military men and police who mutined on March 26 in a spectacular, though untimely and ill-started bid to create in an independent Republic of Bangaldesh.

What I saw and heard with unbelieving eyes and ears during my 10 days in East Bengal in late April made it terribly clear that the killings are not the isolated acts of military commanders in the field.

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Reacting to the almost successful breakaway of the province, which has more than half the contry's population, General Yahya Khan's military government is pushing through its own "final soluation" of the East Bengal problem.

"We are determined to cleanse East Pakistan once and for all of the threat of secession, even if it means killing off two million people and rulling the province as a colony for 30 years," I was repeatedly told by senior military and civil officers in Dacca and Comilla.

The West Pakistan army in East Bengal is doing exactly that with a terrifying thoroughness.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

For six days as I travelled with the officers of the 9th Division headquarters at Comilla I witnessed at close quarters the extent of the killing. I saw Hindus, hunted from village to village and door to door, shot off hand after a cursory "short-arm inspection" showed they were uncircumcised. I have heard the screams of men bludgeoned to death in the compound of Circuit House (civil administrative headquarters) in Comilla, I have seen truckloads of other humand targets and those who had the humanity to try to help them hauled off "off disposal" under the cover of darkness and curfuew. I have witnessed the brutality of "kill and burn missions" as they army units, after clearing out the rebels, pursued the pogrom in the towns and the villages.

I have seen whole villages devastated by "punitive action."

And in the officers, mess at night I have listened incredulously as otherwise brave and honourable men proudly chewed over the day's kill.

"How many did you get ?"

The answers are seared in my memory.

All this is being done, as any West Pakistani officer will tell you, for the "preservation of the unity, the integrity and the ideology

of Pakistan.” It is, of course, too late for that. The very military action that is designed to hold togather the two wings of the country, separated by a thousand miles of India, has confirmed the ideological and emotional break. East Bengal can only be kept in Pakistan by the heary had of the army. And the army is dominated by the Punjabis, who traditionally despise and dislike the Bengalis.

The break is so complete today that few Bengalis will willingly be seen in the company of a West Pakistani. I have a distressing experience of this kind during my visit to Dacca when I went to visit and old friend. “I’m sorry’ he told me as he turned away, “things have changed. The Pakistan that you and I knew has ceased to exist. Let us put it behind us.”

Hours later a Punjabi army officer, talking about the massacre of the non-Bengalis before the army moved in, told me : “They have treated us more brutally than the sikhs did in the partition riots in 1947. How can we ever forgive or forget this?”

The bone-crushing military operation has two distinctive features. One is what the authorities like to call “cleansing process.” : a euphemism for massacre. The other is the “rehabilitation effort.” This is a way of describing the moves to turn East Bengal into a docile colony of West Pakistan. These commonly used expressions and the repeated official references to “miscreants” and “infiltrators” are part of the charade which is being enacted for the benefit of the world. Strip away the propaganda, and the rality is colonisation-and killing.

The justificaton for the annihilation of the Hindus was parapharased by Lt.-Gen. Tikka Khan, the military governor of East Pakistan, in a radio broadcast I heard on April 18. He said : “The Muslims of East Pakistan, who had played a leading part in the creation of Pakistan, are determined to keep it alive. However, the voice of the vast majority had been suppressed through coereion, threats to life and property by a vocal, violent and agressive minority, which forced the Awami League to adopt the destructive coruse.”

Others, speaking privately, were more blund in seeking justification.

"The Hindus had completely undermined the Muslim masses with their money," Col. Naim, of 9th Division headquarters, told me in the officers mess at Comilla. They bled the province white. Money, food and produce flowed across the borders to India. In some cases they made up more than half the teaching staff in the colleges and schools and sent their own children to be educated in Calcutta. It had reached the point where Bengali culture was in fact Hindu culutre and East Pakistan was virtually under the control of the Marwari businessmen in Calcutta. We have to sort them out to restore the land of the people and the people to their faith."

Or take Major Bashir. He came up from the ranks. He is SSO of the 9th Division at Comilla and he boasts of a personal bodycount of 28. He had his own reasons for what has happened. This is a war between the pure and the impure, he informed me over a cup of green tea. "The people here may have Muslim names and call themselves Muslims. But they are Hindus at heart. You won't believe that the Maulvi (mulla) of the Cantonment mosque here issued a fatwa (edict) duirng Friday prayers that the people would attain jannat (paradise) if they killed West Pakistanis. We sorted the bastard out and we are now sorting out the others. Those who are left will be real Muslims. We will even teach them Urdu."

Everywhere I found officers and men fashioning imaginative garments of justification from the fabric of their own prejudices. Scapegoats had to be found to legitimises, even for their own consciences, the dreadful 'solution' to what in essence was a political problem : the Bengalis won the election and wanted to rule. The Punjabis whose ambitions and interests have dominated government policies since the founding of Pakistan in 1947, would brook no erosion of their power. The army backed them up.

Officials privately justify what has been done as a retaliation for the massacre of non-Bengalis before the army moved in. But events suggest that the pogrom was not the result of a spontaneous or undisciplined reaction. It was planned.

It seems clear that the "sorting out" began to be planned about the time that Lt.-Gen. Thika Khan took over the governorship of East Bengal, from the gentle, self-effacing Admiral Ahsan, and the

military command there, from the scholarly Lt.-Gen. Sahibzada Khan. That was at the begining of March, when Sheikh Mujibur Rahman's civil disobedence movement was gathering momentum after the postponement of the assembly meeting from which the Bengalis hoped for so much. President Yahya Khan, it is said acquiesced in the tied of resentment caused in the top echlons of the military establishment by the increasing humilation of the West Pakistani troops stationed in East Bengal. The Punjabi Eastern Command at Dacca continues to dominate the polices of the Central Government. (It is perhaps worth pointing out that the Khans are not related : Khan is a common surname in Pakistan.)

When the army units fanned out in Dacca on the evening of March 25, in pre-emptive strikes agaisnt the mutiny planned for the small hours of the next morning, many of them carried lists of people to be liquidated. These included the Hindus and large numbers of Muslims; students, Awami Leaguers, professors, journalists and those who had been prominent in Sheikh Mujib's movement. The charge, now publicly made, that the army was subjected to mortar attack from the Jagannath Hall, where the Hindu University students lieved, hardly justifies the obliteration of two Hindu colonies, built around the temples on Ramna racecourse, and a third in Shankharipatti, in the heart of the old city. Nor does it explain why the sixeable Hindu populations of Dacca and the neighboruing industrial town of Narayanganj should have vanished so completely during the round-the-clock curfew on March 26 and 27. There is similarly no trace of scores of Muslims who were rounded up during the curfew hours. These people were eliminated in a planned operation : and improvised response to Hindu aggression would have had vastly different results.

A pencil flick, a man 'disposed'

Touring Dacca on April 15 I found the heads of four students lying rotting on the roof of the Iqbal Hall hostel. The caretaker said they had been killed on the night of March, 25.I also found heavey traces of blood on the two staircases and in four of the rooms. Behind Iqbal Hall a large residential building seemed to have been singled out for special attention by the army. The walls were pitted

with bullet holes and a foul smell still lingered on the staircase, although it had been heavily powdered with DDT. Neighbours said the bodies of 23 women and children had been carted away only hours before. They had been decomposing on the roof since March 25. It was only after much questioning that I was able to ascertain that the victims belonged to the near-by Hindu shanties. They had sought shelter in the building as the army closed in.

This is Genocide conducted with amazing casualness. Sitting in the office of Major Agha, Martial Law Administrator of Comilla City, on the morning of the April 19, I saw the offhand manner in which sentences were meted out. A Bihari sub-inspector of police had walked in with a list of prisoners being held in the police lock-up. Agha looked it over. Then, with a flick of his pencil, he casually ticked off four names on the list.

"Bring these four to me this evening for disposal," he said. He look at the list again. The pencil flicked once more. "....and bring this thief along with them."

The death sentence had been pronounced over a glass of coconut milk. I was informed that two of the prisoners were Hindus, the third a 'student,' and the fourth an Awami league organiser. The 'thief', it transpired, was a lad named Sebastain who had been caught moving the household effects of a Hindu friend to his own house.

Later that evening I saw these men, their hands and legs tied loosely with a singel rope, being led down the road to the Circuit House compound. A little after curfew, which was at 6 o'clock, a flock of squawking mynah birds were disturbed in thier play by the thwacking sound of wooden clubs meeting bone and flesh.

Captain Azmat of the Baluch Regiment had two claims to fame accoridng to the mess banter. One was his job as ADC to Major-Gen. Shaukat Raza, commanding officer of the 9th Division. The other was thrust on him by his colleagues' ragging.

Azmat, it transpired, was the only officer in the group who had not made a "kill." Major Bashir needled him mercilessly.

"Come on Azmat," Bashir told him one night, "we are going to make a man of you. Tomorrow we will see how you can make them run. It's so easy."

To underscore the point Bashir went into one of his long spiels. Apart from his duties as SSO, Bashir was also "education officer" at Headquarters. He was the only Punjabi officer I found who could speak Bengali fluently. By general agreement Bashir was also a selftaught bore who gloried in the sound of his own voice.

A dhari walla (bearded man), we were told, had come to see Bashir that morning to inquire about his brother, a prominent Awami League organiser of Comilla who had been netted by the army some days earlier. Dhor gaya, Bashir said he told him : "he has run away." The old man couldn't comprehend how his brother could have escaped on a broken leg. Neither could I. So Major Bashir, with a broad wink, enlightened me.

The record would show Dhor gaya : "shot while escaping."

I Never did find out whether Captain Azmat got his kill. The rebel Bengali forces who had dug in at Feni, seventy miles north of Chittagong on the highway to Comilla, had tied down the 9th Division by destroying all the bridges and culverts in the area. General Raza was getting hell from Eastern Command at Dacca which was anxious to have the south-eastern border sealed against escaping rebels. It was also desperately urgent to open this only land route to the north to much-needed supplies that had been piling up in the port at Chittagong.

So General Razza was understandably waspish. He flew over the area almost daily. He also spent hours haranguing the bridge that was bogged down at Feni. Captain Azmat, as usual, was the General's shadow. I did not see him again. But if experience is any pointer, Azmat, probably had to sweat out his "kill"-and the ragging-for another three weeks. It was only on May 8 that the 9th Division was able to clear Feni and the surrounding area. By then the Bengali rebels, forced out by relentless bombing and artillery barrages, had escaped with their weapons across the neighbouring broder into India.

The escpae of such large numbers of armed, hard-core regulars among the Bengali rebels was a matter of grave concern to Lt.Gen. Aslam Baig, G-1at 9th Divison headquarters. "The Indians," he explained will obviously not allow them to settle there. It would be too dangerous. So they will be allowed in on sufferance as long as they keep making sorties across the border. Unless we can kill them off, we are going of have serious trouble for a long time.

Lt.-Col. Baig was a popular artillery officer who had done a stint in China after the India-Pakistan war when units of the Pakistan army were converting to Chinese equipment. He was said to be a proud family man. He also loved flowers. He told me with unconcealed pride that during a previous posting at Comilla he had brought from China the giant scarlet waterlilies that adorn the pond opposite headquarters. Major Bashir adorded him. Extolling one officer's decisiveness, Bashir told me that once they had caught a rebel officer; there was a big fuss about what should be done with him. "While the others were telephoning all over for instrucitons," he said, "he solved the problem. Dhor gaya. Only the man's foot was left sticking out of the ditch.

It is hard to imagine so much brutality in the midst of so much beauty. Comilla was blooming when I went there towards the end of April. The rich green carpet of rice paddies spreading to the horizon on both sides of the road was borken here and there by bright splashes of red. That was the *Gol Mohor*, aptly dubbed the "Flame of the Forest," coming to full bloom. Mango and coconut trees in the villages dotting the countryside were heavy with fruit. Even the terrier-sized goats skipping across the road gave evidence of the abundance of nature in Bengal. "The only way you can tell the male from the female," they told me, "is that all the she-goats are pregnant."

Fire and murder their vengeance

In one of the most crowded areas of the entire world-Comilla district has a population density of 1,900 to the square mile-only man was nowhere to be seen.

"Where are the Bengalis ?" I had asked my escorts in the strangely empty streets of Dacca a few days earlier. "They have gone

to the villages, was the stock reply. Now, in the countryside, there still no Bengalis. Comilla town, like Dacca, was heavily shuttered. And in ten miles on the road to Laksham, past silent villages, the peasants I saw could have been counted on the fingers of both hands.

There were, of course, soldiers-hundreds of unsmilling men in khaki each with an automatic rifle. According to orders, the rifles never left their hands. The roads are constantly patrolled by tough, trigger-happy men. Wherever the army is, you won't find Bengalis.

Martial law orders, constantly repeated on the radio and in the Press, proclaim the death penalty for anyone caught in the act of sabotage. If a road is obstrcuted or a bridge damaged or destroyed, all hourses within 100 yards of the spot are liable to be demolished and their inhabitants rounded up.

The practice is even more terrible than anything the words could suggest. "Punitive action" is something that the Bengalis have come to dread.

We saw what this meant when we were approaching Hajiganj, which straddles the road to Chandpur, on the morning of April,17. A few miles before Hajiganj, a 15-foot bridge had been damaged the previous night by rebels who were still active in the area. According to Major Rathore (G-2 Ops.) an army unit had immediately been sent out to take punitive aciton. Long spirals of smoke could be seen on all sides up to a distance of a quarter of a mile from the damaged bridge. And as we carefull drove over a bed of wooden boards, with which it had been hastily reparired, we could see house in the village on the right beginning to catch fire.

At the back of the village some *jawans* were spreading the flames with dried coconut fronds. They make excellent kindling and are normally used for cooking. We could also see a body sprawled bweteen the coconut trees at the entrance to the village. On the other side of the road another village in the rice paddies showed evidence of the fire that had gutted more than a dozen bamboo and mat huts. Hundreds of villagers had escaped before the army came. Others, like the man among the coconut trees, were slow to get away.

As we drove on, Major Rathore said. “They broguht it on themselves.” I said it was surely too terrible a vengeance on innocent people for the acts of a handful of rebels. He did not answer.

A few hours later when we were again passing through Hajiganj on the way back from Chandpur, I had my first exposure to the savagery of a “kill and burn mission.”

We were still caught up in the aftermath of a tropitcal storm which had hit the area that afternoon. A heavy overcast made ghostly shadows on the mosque towering above the town. Light dirzzle was beginning to wet the uniforms of Captain Azhar and the four *jawans* riding in the exposed escort jeep behind us.

We turned a corner and found a convoy of trucks parked outside the moaque. I counted seven, all filled with jawans in battledress. At the head of the column was a jeep. Across the road two men, supervised by a third, were trying to a batter down the door of one of more than a hundred shuttered shops lining the road. The studded teak wood door was beginning to give under the combined assault of two axes as Major Rathore brought the Toyota to a halt.

“What the hell are you doing ?”

The tallest of the trio, who was supervising the break in, turned and peered at us. “Mota,” (Fatty) he shouted, “what the hell do you think we are doing ?”

Recognishing the voice, Rathore grew a water-melon smile. It was, he informed me, his old friend “Ifty-Major Iftikhar of the 12th Frontier Force Refiles.

Rathore : “I thought someone was looting”

Iftikhar : “Looting ? No. We are on kill and burn.”

Waving his hand to take in the shops, he said he was going to destory the lot.

Rathore : “How may did you get?”

Iftikhar : smiled bashfully.

Rathore : “Come on. How many did you get ?”

Iftikhar : “Only twelve. And by God we were lucky to get them.

We would have lost those, too, if I hand't sent my men from the back."

Prodded by Major Rathore, Iftikhar then went on to describe vividly how after much searching in Hajiganj he had discovered twelve Hindus hiding in a house on the outskirts of the town. These had been "disposed of." Now Major Iftikhar was on the second part of his mission : burn.

In front of the shop a small display cabinet was crammed with patent medicines, cough syrups, some bottles of mango squash, imitation jewellery, reels of coloured thread and packets of knicker elastic. Iftikhar kicked it over, smashing the light woodwork into kindling. Next he reached out for some jute shopping bags on one shelf. He took some plastice toys from another. A bundle of handkerchiefs and a small bolt of red cloth joined the pile on the floor. Iftikhar heaped them all together and borrowed a box from one of the jawans sitting in our Toyota. The jawan had ideas of his own. Jumping from the vehicle he ran to the shop and tried to pull down one of the umbrellas hanging from the low ceiling of shop. Iftikhar ordered him out.

Looting he was sharply remined, was against orders.

Iftikhar soon had a fire going. He threw burning jute bags into one corner of the shop; the bolt of cloth into another. The shop began to blaze. Within minutes we could hear the crackle of flames behind shuttered doors as the fire spread to the shop on the left, then on to the next one.

At this point Rathore was beginning to get anxious about the gathering darkness. So we drove on.

When I chanced to meet Major Iftikhar the next day he ruefully told me, 'I burnt only sixty houses. If it han't rained I would have got the whole bloody lot.'

Approaching a village a few miles form Mudafarganj we were forced to a halt by what appeared to be a man crouching agaisnt a mud wall. One of the *jawans* warned it might be *fauji* sniper. But after careful scouting it turned out to be a lovely young Hindu girl. She sat there with the placidity of her people, waiting for God knows who. One of the jawans had been ten years with the East Pakistan

Rifles and could speak bazaar Bengali. He was told to order her into the village. She mumbled something in reply, but stayed where she was, but was ordered a second time. She was still sitting there as we drove away. “She has,” I was informed, “nowhere to go-no family, no home.”

Major Iftikhar was one of several officers assigned to kill and burn missions. They moved in after the rebels had been clearned by the army with the freedom to comb out and destory Hindus and “miscreants” (the official jargon for rebels) and to burn down everything in the areas from which the army had been fired at.

This landky Punjabi officer liked to talk about his job. Ridding with Iftikhar to the Circuit House in Comilla on anoher occasion he told me about his latest exploit.

“We got an old one,” he said. “The bastard had grown a beard and was posing as a devout Muslim. Even called himself Abdul Manan. But we give him a medial inspection and the game was up”.

Iftikhar continued : “I wanted to finish him there and then, but my men told me such a bastard deserved there shots. So I gave him one in the balls, then one in the stomach, then I finished him off with a shot in the head.”

When I left Major Iftikhar he was headed north to Brahmanbaria. His mission : another kill and burn.

Overwhelmed with terror, the Bengalis have one of two reactions. Those who can run away just seem to vanish. Whole towns have been abandoned as the army approached. Those who can’t run about a cringing servility which only adds humiliation to their plight.

Chandpur was an example of the first.

In the past this key river port on the Meghna was noted for its thriving business houses and gay life. At night thousands of small country boats anchored on the river’s edge made it a fairyland of lights. On April 18 Chandpur was deserted. No people, no boats. Barely one percent of the population had remained. The rest, particularly the Hindus who constituted nearly half the population, had fled.

Weirdly they had left behind thousands of Pakistani flags fluttering from every house, shop and rooftop. The effect was like a national day celebration without the crowds. It only served to emphasis the haunted look.

The flags were by way of insurance.

Somehow the word had got around that the army considered any structure without a Pakistani flag to be hostile and consquently to be destroyed. It did not matter how the Pakistani flags were made, so long as they were adorned with crescent and star. So they came in all sizes shapes and colours. Some flaunted blue fields, instead of the regulation green. Obviously they had been hastily put together with the same material that had been used for the blue Bangladesh flag. Indeed blue Pakistani flags were more common then the green. The scene in Chandpur was repeated in Hajiganj, Mudafaraganj, Kasba, Barhamnbaria; all ghost towns gay, with flags.

A 'parade' and knwoing wink

Lahsham was an example of the other reaction : cringing.

When I drove into the town the morning after it had been cleared of the rebels, all I could see was the army and literally thousands of Pakistani flags. The Major in charge there had camped in the police station, and it was there that Major Rathore took us my colleague a Pakistani TV Cameraman, to make a propaganda film about the, "return to normalcy" in Laksham-one of the endless series broadcast daily showing welcome parades and "peace meetings."

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

On April 20 Lt.-Col. Baig, the flower-loving G-1 of the 9th Division thought that the comp-out would take two months, to the middle in June. But this planning seems to have misfired. The rebel forces, using guerilla tactics, have not been subdued as easily as the army expected. Isolated and apparently unco-ordinated, the rebels have nontheless bogged down the Pakistan Army in many places by the systematic destruction of roads and the railways, without which

the army cannot move. The 9th Division for one was hopelessly behind schedule. Now the monsoon threatens to shut down the military operation with three months of cloudbursts.

For the rainly season, the Pakistan Government obtained form China in the second week of May nine shallow-darught river gunboats. More are to come. These 80 ton gunboats with massive firepower will take over some of the responsibolites hitherto allotted to the air force and artillery, which will not be as effective when it rains. They will be supported by several hundred country-craft which have been requinstioned and converted for military use by the addition of outboard motors. The army intends to take to the water in pursuit of the rebels.

Colonisation of East Bengal

There is also the clear prospect of famine, because of the breakdown of the distribution system. Seventeen of the 23 districts of East Pakistan are normally short of food and have to be supplied by massive imports of rice and wheat. This will not be possible this year because of the civil war. Six major bridges and thousands of smaller ones have been destroyed, making the roads impassible in many places. The railway system has been similarly disrupted, though the government claims it is "almost normal."

The road and rail tracks between the port of Chittagong and the north have been completely disrupted by the rebels who held Feni, a key road and rail junction, until May 7. Food stocks cannot move because of this devastation. In normal times only 15 percent of food movement from Chittagong to up country areas were made by boat. The remaining 85 percent was moved by road and rail. Even a 100 percent increase in the effectiveness of river movement will leave 70 per cent of the food stocks in the warehouses of Chittagong.

Two other factors must be added. One is large-scale hoarding of grain by people who have begun to anticipate the famine. This makes a tight position infinitely more difficult. This other is the government of Pakistan's refusal to acknowledge the danger of famine publicly. Lt.-Gen. Tikka Khan, the military governor of East Bengal, acknowledged in a radio broastcast on April 18 that he was

gravely concerned about food supplies. Since then the entire government machinery has been used to suppress the fact of the food shortage. The reason is that a famine like the cyclone before it, could result in a massive outpouring of foreign aid-and with it the prospet of external inspection of distribution methods. That would make it impossible to conceal from the world the scale of the pogrom. So the hungry will be left to die until the clean-up is complete.

Discussing the problem in his plush air-conditioned office in Karachi recently the chairman of the Agricultural Development Bank, Mr. Qarni, said bluntly : "The famine is the result of their acts of sabotage. So let them die. Perhaps then the Bengali will come to their senses."

....

....

All this would seem to indicate that Pakistan's military Government is moving paradoxically, in opposite directions, to compound the gravest crisis in the country's 24 years history.

This is a widely held view. It sounds logical. But is it true ?

My own view is that it is not. It has been my unhappy previlege to have had the opportunity to observe at first hand both what Pakistan's leaders say in the West, and what they are doing in the East.

I think that in reality there is no contradiction in the Government's East Bengal policy. East Bengal is being colonised.

This is not an arbitrary opinion of mine. The facts speak for themselves.

The first consideration of the army has been and still is the obliteration of every trace of separatism in East Bengal. This proposition is upheld by the continuing slaughter and by everything else that the government has done in both East and West Pakistan since March 25. The decision was coldly taken by the military leaders, and they are going through with it-all too coldly.

No meaningful or viable political solution is possible in East Bengal while the pogrom continues.

The crucial question is : will killing stop ?

I was given the army's answer by Major-General Shaukat Raza, commanding officer of the 9th Division, during our first meeting at Comilla on April 16.

"You must be absolutely sure," he said, "that we have not undertaken such a drastic and expensive operation-expensive both in men and money for nothing. We've undertaken a job. We are going to finish it, not had it over half done to the politicians so that they can mess it up again. The amry can't keep coming back like this every three or four years. It has a more important task. I assure you that when we have got through with what we are doing there will never be need again for such an operation."

Major-General Shaukat Raza one of three divisional commanders in the filed. He is in a key position. He is not given to talking through his hat.

Significantly, General Shaukat Raza's ideas were echoed by every military officer I talked to during my 10 days in East Bengal. And President Yahya Khan knows that the men who lead the troop on the ground are the *de facto* arbiters of Pakistan's destiny.

The single-mindedness of the army is underscored by the military operation itself. By any standard, it is a a major venture. It is not something that can be swithched on and off without the most grave consequences.

Army committed to remain

The army has already taken a terrible toll in dead and injured. It was privately said in Dacca that more officers have been killed then men and that the casualty list in East Bengal already exceeds the losses in the India-Pakistan war of September,1965. The army will certainly not write off these "sacrifices" for illusory political considerations that have proved to be so worthless in the past.

Military-and it is soldiers who will be taking the decision-to call a halt to the operation at this stage would be indefensible. It would only mean more trouble with the Bengali rebels. Implacable hatered has been displayed on both sides.

There can be no truce or negotiated settlement; only toal victory or total defeat. Time is on the side of the Pakistan Army, not of the isolated, unco-ordinated and ill-equipped rebel groups. Other circumstances, such as an expanded conflict which takes in other powers, could of course alter the picture. But as it stands today the Pakistan Army has no reason to doubt that it will eventually achieve its objective. That is why the casualties are solidly accepted.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

In one sentence, the government is too far committed militarily to abandon the East Bengal operation, which it would have to do if it sincerely wanted a political solution. President Yahya Khan is riding on the back of a tiger. But he took a calculated decision to climb up there.

So the army is not going to pull out. The Government's policy for East Bengal was spelled out to me in the Eastern Command headquarters at Dacca. It has three elements :-

1) The Bengalis have proved themselves "unreliable" and must be ruled by West Pakistanis ;
2) The Bengalis will have to be re-educated along proper Islamic lines. The "Islamisation of the masses"- this is the official jargon-is intended to eleminate secessionist tendencies and provide a strong religious bond with West Pakistan :
3) When the Hindus have been eliminated by death and flight, their property will be used as a golden carrot to win over the under-privileged Muslim middleclass. This will provide the base for erecting administrative and political structures in the future.

This policy is being purued with the utmost blatancy.

Because of the mutiny, it has been officially decreed that there will not for the present be any further recruitment of Bengalis in the defence forces. Senior Air Force and Navy officers, who were not in anyway involved, have been moved "as a precaution" to non-sensitive positions. Bengali fighter pilots, among them some of the aces of the Air Force, had the humiliation of being grounded and moved to non-flying duties. Even PIA air crews operating between the two wings of the country have been strained clean for Bangalis.

The East Pakistan Rifles, once almost exclusively a Bengali paramilitary force, has ceased to exist since the mutiny. A new force the Civil Defence Force, has been raised by recruiting Biharis and volunteers from West Pakistan. Biharis, instead of Bengalis are also being used as the basic material for the police. They are supervised by officers sent out from West Pakistan and by secondment from the army. The new Superintendent of Police at Chandpur at the end of April was a Military Police major.

Hundreds of West Pakistani government civil servents, doctors, and technicians for the radio, TV, telegraph and telephone services have already been sent out to East Pakistan. More are being encouraged to go with the promise of one and two-step promotions. But the transfer, when made, is obligatory. President Yahya, recently issued an order making it possible to transfer civil servants to any part of Pakistan against their will.

The universities 'sorted out'

I was told that all the Commissioners of East Bengal and the district Deputy Commissioner will in future be either Biharis or civil officers from West Pakistan. The Deputy Commissioners of districts were said to be too closely involved with the Awami League secessionist movement. In some cases, such as that of the Deputy Commissioner of Comilla, they were caught and shot. That particular officer had incurred the warth of army on March 20 when he refused to requisition petrol and food supplies "without a letter from Sheikh Mujibur Rahman."

The Government has, also come down hard on the universities and colleges of East Bengal. They were considered the hot beds of conspiracy and they are being 'sorted out'. Many professors have fled. Some have been short. They will be replaced by fresh recruitment from West Pakistan.

Bengali officers are also being weeded out of sensitive positions in the Civil and Foreign Services. All are currently being subjected to the most exhaustive screening.

This colonisation process quite obviously does not work even half as efficiently as the administration wishes. I was given vivid

evidence of this by Major Agah, martial law administrator of Comilla. He had been having a problem getting the local Bengali executive engineers to go out and repair the bridges and roads that had been destroyed or damaged by the rebels. This task kept getting snarled in red tape, and the bridges remained unrepaired. Agha, of course, knew the reason. “You can’t expect them to work,” he told me, “When you have been killing them and destroying their coutnry. That at least is their point of view, and we are paying for it”.

Captain Durrani of the Baluch Regiment, who was in charge of the company guarding the Comilla airport, had his own methods of dealing with the problem. “I have told them,” he said with reference to the Bengalis maintaining the control tower, “that I will shoot anyone who even looks like he is doing something suspicious.” Durrani had made good his word. A Bengali who had approached the airport a few nights earlier was shot. “Could have been a rebel,” I was told. Durani had another claim to fame. He had personally accounted for “more than 60 men” while clearing the villages surrounding the airport.

The harsh reality of colonisation in the East is being concealed by shameless window dressing. For several weeks President Yahya Khan and Lt.-Gen. Tikka Khan have been trying to get political support in East Pakistan for what they are doing. The results have not excactly been satisfying.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

The army can of course hold the country together by force. But the meaning of what it has done in East Bengal is that the dream of the men who hoped in 1947 that they were founding a Muslim nation in two equal parts has now faded. There is now little chance for a long time to come that Punjabis in the West and Bengalis in the East will feel themselves equal fellow-citizens of one nation. For the Bengalis, the future is now bleak : the unhappy submission of a colony to its conquerors.

১৯৭১ সনে মুক্তি যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিকল্পিত ভাবে যে বীভৎস গণহত্যা অত্যাচার নিপীড়ন চালাইয়াছিল তাহা ৮ শত বৎসর পূর্বের চেঙ্গীজ খান বা হালাকু খান এর গণহত্যার সহিত তুলনীয় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ৬ বৎসর জার্মানী ও পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গণহত্যা বাংলাদেশে ৯ মাসে অনুষ্ঠিত গণহত্যার কাছে ম্লান হইয়া যাইবে।

উপরে বর্ণীত ঘটনাবলী প্রকৃত ঘটনাবলীর অতি সামান্য অংশ মাত্র। উপরে মাত্র কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্ত সমগ্র বাংলাদেশে এইরূপ হাজার হাজার ঘটনা ঘটিয়াছে। অজস্র বধ্যভূমি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে রহিয়াছে। সেখানে হাজার হাজার কঙ্কাল রহিয়াছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল্য এই সকল হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ নিজেরা কঙ্কাল হইয়া প্রদান করিয়াছে। আমরা আমাদের বর্তমান শান্তিময় পরিবেশের আরও শান্ত আলোচনায় তাত্বিক ভাবে তাহাদের আত্মত্যাগের ঘটনাকে সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'ঐতিহাসিক' এর আওতায় আসে কিনা তাহা লইয়া বিনম্র তর্কে অবতীর্ন হইতে পারি কিন্ত বাংলাদেশের সর্বত্র যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ ব্যক্তি লাশ হইয়া বধ্যভূমিগুলিতে নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছিল তাহারা তাহাদের নিজেদের অধিকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে অবশ্যই স্থান করিয়া লইয়াছে এবং সে কারণে তাহাদের বধ্যভূমিগুলিও অবশ্যই ঐতিহাসিক স্থান।

একজন ঐতিহাসিক বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীত ঘটনাকে বিচার করেন কিন্ত ১৯৭১ সনের ঘটনা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতঃ ২৪ অনুচ্ছেদের আওতায় 'ঐতিহাসিক' কিনা তাহাই বিচার করিতে হইবে।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে উপরে বর্ণিত লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবীর প্রতি সমগ্র বিশ্বের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় করিয়াছিল যাহার ফলশ্রুতিতে বিজয় দিবস ত্বরান্বিত হইয়াছিল। কাজেই উক্ত নীরব লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানকে উপেক্ষা করিয়া বিজয় দিবস কল্পনাও করা যায় না। তাহাদের লক্ষ লক্ষ কঙ্কালের উপর বিজয় দিবসে সংঘটিত আত্মসমর্পন অনুষ্ঠান মঞ্চায়িত হইয়াছিল।

ছ) যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের সহিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকা ও যুদ্ধের বেশ কিছু মিল রহিয়াছে। অবশ্য অমিলও রহিয়াছে। ১৫শে শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইহার বিভিন্ন অংশ ইংল্যান্ডসহ ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্র দখল করে। অতঃপর, ইউরোপীয় দেশগুলি হইতে প্রচুর অভিবাসী তথায় আগমন করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ১৩(তের) টি কলোনী রাষ্ট্র স্থাপন করে। রাজকীয় নৌ ও সেনা বাহিনী কলোনীভুক্ত প্রদেশগুলিকে বহিঃআক্রমন হইতে রক্ষা করিত। প্রদেশগুলির কর্তৃত্ব রাজার আওতাধীন ছিল। কলোনীগুলি মনে করিত যে ইংল্যান্ডের রাজা তাহাদেরও রাজা কিন্তু তাহাদের নির্বাচিত সংসদ স্থানীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে ক্ষমতাবান। তাহারা মনে করিত যে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট কলোনীর নিজস্ব কোন ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করিতে বা কর আরোপ করিতে পারে না। ইহাই ছিল কলোনীগুলির সহিত ইংল্যান্ডের বিরোধের মূল কারণ।

বাংলাদেশের অধিবাসী ফেব্রুয়ারি র ঐতিহ্য দুই হাজার বৎসরেরও পুরাতন। তাহাদের ভোটাধিকারের শক্তি অবিভক্ত ভারতে সকল মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হইত। প্রকৃতপক্ষে, তাহাদের ভোটের জোরেই পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার অধিবাসী যদিও সমগ্র দেশের ৫৬% অংশ ছিল কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সিভিল ও মিলিটারী বুরোক্রেসী এই প্রদেশকে কলোনীর ন্যায় ব্যবহার করিত।

পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা নিজেদের স্বায়ত্বশাসনে বিশ্বাস করিত। এই দাবী হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত তাহাদের বিরোধের সূত্রপাত।

ফ্রান্সের সহিত ইংল্যান্ডের সপ্তবর্ষ যুদ্ধের সমাপ্তি অন্তে ১৭৬৩ অব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কলোনীগুলির উপর ট্যাক্স ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিলে কলোনীগুলিতে প্রচন্ড অসন্তোষের সৃষ্টি করে। আইনগুলি তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলিয়া তাহারা অভিযোগ উত্থাপন করে।

এই সকল নানান কারণে ১৭৭৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলোনী গুলির প্রতিনিধি সমবায়ে প্রথম Continental Congress এর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কোনরকম স্বাধীনতার দাবী তখনও উত্থাপন করা হয় নাই বরঞ্চ বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং কংগ্রেস তাহাদের দাবী সম্বন্ধে রাজার নিকট

আবেদন করতঃ একটি Declaration of Rights প্রেরণ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অনুসারে জেনারেল গেজ্ ১৭৭৫ সনের ১৯শে এপ্রিল কনকর্ডে অবস্থিত গোলাবারুদের ডিপো দখল করিতে গিয়া প্রথম রক্তপাতের সুত্রপাত হয়।

৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন সম্বলিত সংবিধান প্রণয়ন করিবার দাবী পাকিস্তানের সামরিক জান্তা গণহত্যার মাধ্যমে উৎপাটিত করিতে চাহিলে স্বাধীনতার দাবীতে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবসর প্রাপ্ত কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে মুক্তিফৌজের প্রধান সেনাপতি (General Officer Commanding in Chief) নিয়োগ দেওয়া হয়।

১৭৭৫ সনের ১৫ই জুন তারিখে কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস ফিলাডেলফিয়া শহরে মিলিত হইয়া Continental Army গঠন করে। অবসর প্রাপ্ত কর্নেল জর্জ ওয়াশিংটনকে উক্ত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি (Commander in Chief) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে সমঝোতার পরিবর্তে রাজা George III ১৭৭৫ সনের ২৩শে আগস্ট এক Proclamation দ্বারা কলোনীগুলিকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষনা করিলে তাহারাও ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হইতে থাকে।

বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানগণের ভোটের শক্তি সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হইত। বাঙালি মুসলমানগণই প্রকৃতিপক্ষে পাকিস্তান অর্জন করিয়াছিল। অথচ পাকিস্তানে তাহারাই প্রচন্ড বঞ্চনার স্বীকার হয়। এই পরিস্থিতিতে স্বায়ত্বশাসন দাবী করিলে গণহত্যা আরম্ভ হয় এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ করে।

১৭৭৬ সনের ১৫ই মে কংগ্রেস ইংল্যান্ড কর্তৃক স্থাপিত সরকারের পরিবর্তে একটি নূতন সরকার গঠনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। প্রায় বৎসরাধীকাল যুদ্ধ চলিবার পর কংগ্রেস ১৭৭৬ সনের ৪ঠা জুলাই আইন আকারে স্বাধীনতা ঘোষনার বিলটি পাস করে। এই সঙ্গে শেষ হয় ১৩টি কলোনীতে ব্রিটিশ অধিপত্য। ইহার পর ফ্রান্সের সহায়তায় (পাঁচ) বৎসর ব্যাপি স্বাধীনতা যুদ্ধ চলে।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভেই স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদান করা হয় এবং দুই সপ্তাহ পরে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের

গণপরিষদের ক্ষমতাবলে আনুষ্ঠানিক Proclamation of Independence ঘোষণা করে।

যুদ্ধকালীন সময়ে ফরাসী যুদ্ধজাহাজ গুলি ব্রিটিশ জাহাজগুলিকে অবিশ্রান্ত ভাবে নাজেহাল করিতে থাকে। ইহাছাড়া, ফ্রান্স ইহার সৈন্যবাহিনী ও বিপুল যুদ্ধাস্ত্র সরঞ্জাম সরবরাহ করতঃ সার্বক্ষনিক ভাবে continental army কে সহায়তা করিতে থাকে। একই ভাবে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নানা ভাবে সহায়তা প্রদান করে। ১৭৮১ সনে Yorktown এর যুদ্ধে ফরাসী নৌবাহিনী Neval blocked ছাড়াও York নদীর দিক হইতে Lord Cornwallis এর সেনাবাহিনীর অবস্থানের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষন আরম্ভ করে। সম্মুখে ফরাসী অশ্বারোহী ও গোলান্দাজ বাহিনী ফরাসী General Comte de Rochambeau, General Marquis de Lafayette প্রভৃতি সেনানায়কগণ George Washington এর বাহিনীর সহিত একযোগে ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমন করিলে ১৭৮১ সনের ১৯শে অক্টোবর Lord Cornwallis আত্মসমর্পন করে।

একইভাবে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর নিকট লেঃ জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পন করে।

জ) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা ঃ

উল্লেখ্য যে ২৫/২৬ শে মার্চ হইতেই বাংলাদেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে হইলেও মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। ঐ সময় মূলতঃ ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের ফেব্রুয়ারি সদস্যগণ এবং পুলিশ বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আক্রমন করতঃ প্রচন্ড চাপের মুখে রাখে। ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারি ছাত্র কৃষক, শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশার মানুষ 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসাবে যোগদান করতঃ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ আরম্ভ করে। কয়েক সপ্তাহ গেরিলা ট্রেনিং এর পরই তাহারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ অবিশ্রান্তভাবে গেরিলা আক্রমন পরিচালনা করিতে থাকে। এইরূপ অসংখ্য ঘটনার মাত্র দুই একটি নিম্নে বর্ণনা করা হইল ।

মুক্তিফৌজের ভয়ে পাক-সৈন্য সদা সন্ত্রস্ত
(দলিলপত্রঃ নবম খন্ড, পৃঃ ৬২৯-৬৩১)

মুজিবনগর, ২২ জুন (পি টি আই)-বাংলাদেশের বিভিন্ন খন্ডে মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর টহল দলগুলি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মুক্তিফৌজ কমান্ডোর জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার বলেছেন যে, মুক্তিফৌজ যে কোন মুহুর্তে আচমকা আক্রমণ চালাতে পারে মনে করে পাকিস্তানী সৈন্যরা আজকাল যতদূর সম্ভব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করছে। মুক্তিফৌজ যাতে চিনতে না পারে সেজন্য পাকসৈন্যরা সময় সময় অসামরিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে চলাফেরা করে থাকে। সৈন্যবাহিনী যখন সৈন্য ও সরবরাহ নিয়ে নদী পারাপারের জন্য মোটর বোট ব্যবহার করে তখন গেরিলাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নদী ও খালের উভয় তীরেই রক্ষী মোতায়েনের ব্যবস্থা করে।

ভেড়ামারায় ২০ জন পাকসৈন্য নিহত ঃ কৃষ্ণনগর, ২২শে জুন কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার মহিষকুন্ডি অঞ্চলে এক কোম্পানী পাকসৈন্যের ওপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজ অন্ততঃ ২০জন পাকসৈন্যকে হত্যা ও বেশ কিছুকে জখম করেছে বলে আজ সংবাদে পাওয়া গেছে। স্হানটি কৃষ্ণনগর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে ভারত-মেঘনা সীমান্তের বিপরীত দিকে। সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যায় যে, পাকসৈন্যরা আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্ত রভাগে পালিয়ে যায়।

মুক্তিফৌজ গত রবিবার মেহেরপুরের কাছে একটি সৈন্যবাহী ট্রাকের ওপর গোলাবর্ষণ করে এবং উহার ফলে প্রায় ২৪জন পাকসৈন্য নিহত অথবা আহত হয়। ঐদিনই মেহেরপুরের প্রায় ১৫ মাইল উত্তর-পূর্বে একটি অঞ্চলে মুক্তিফৌজ একটি সৈন্যঘাঁটির ওপর গুলীবর্ষণ করে। এই আক্রমণে ১১ জন পাক সৈন্য খতম হয়।

রংপুরে লালমনিরহাট খন্ডে মুক্তিফৌজ একটি সৈন্য শিবিরের ওপর আচমকা আক্রমণ চালিয়ে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ একটি ট্রাক দখল করে। এই আক্রমণে যে সকল পাকসৈন্য আহত হয় তাদের মধ্যে একজন অফিসারও আছেন। (যুগান্তর, ২৩জুন, ১৯৭১)

খান সেনাদের ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর হয়েছে ঃ
আরও সাত শতাধিক সৈন্য খতম

স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের খবরে প্রকাশ, হানাদার বাহিনী বাংলাদেশ যে বর্বরোচিত ও সুপরিকল্পিত গণহত্যা চালিয়েছে তারই অংশ হিসাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের সমর্থকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এই নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বয়োবৃদ্ধ অসুস্হ পিতামাতাও রেহাই পাননি। গত সাতদিন চট্টগ্রাম রণাঙ্গনে প্রায় একশত ৫০ জন পাক হানাদার মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের হাতে নিহত হয়েছে এবং বহু

স্হান থেকে পাকসেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র জানিয়েছে। সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনে গেরিলাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কক্সবাজারে বহু পাকসেনা হতাহত হয়েছে। এদিকে মর্টার ও মেশিনগানসহ আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ফেনীর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ২০০ জন পাকসেনাকে হত্যা করেছেন।

স্বাধীনতাকামী তরুণ যোদ্ধারা গত ১৯শে জুন সিলেট সেক্টরে একটি এলাকায় পাক-হানাদারদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে ১৩ জন পাকসেনাকে খতম করেন এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ৩ জন পাকসেনাকে আটক করেছেন। এর আগেরদিন এক প্রচন্ড সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী সিলেটের কয়েকটি স্হানে আক্রমণ চালিয়ে কয়েকটি শত্রুসেনার বাংকার নষ্ট করেছেন এবং ৩০ জন সৈন্যকে খতম করেছেন। এই আক্রমণে ২২তম রেজিমেন্টের একজন সৈন্যকেও আটক করেছেন।

মুক্তিবাহিনী রংপুরের বজরাপাড়ায় পাকসেনাদের ওপর অতর্কিত গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাদের নাজেহাল করে ছেড়েছেন। এই আক্রমণে অনেক খানসেনা হতাহত হয়েছে। সেই দিনই পাকসেনারা মৃত সৈন্যদের লাশ ও আহত সৈন্যদের নওগাঁয় নিয়ে যায়। এই আক্রমন একজন অফিসারসহ দু'জন পাকসেনাকে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা গ্রেফতার করেছেন। কয়েকদিন আগে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা ঠাকুরগাঁয়ের কাছে মর্টার ও মেশিনগান থেকে শত্রু ছাউনির উপর আচমকা গুলি চালায়। চট্টগ্রামেও মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দু'সপ্তাহ ধরে চট্টগ্রামে অধিক সংখ্যক গাড়ী ও সৈন্য নিয়ে পাকসেনাদের চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। কুষ্টিয়া রণাঙ্গনের মেহেরপুর এলাকায় এক দুঃসাহসিক আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী কমপক্ষে ৩০ জন পাকসেনাকে খতম করেছেন, সেখানকার কুতুবপুরে মুক্তিবাহিনী খানসেনাদের ওপর আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ১০ জন খানসেনাকে হত্যা করেন। গত ১৫ই জুন নাজিরাকোনায় এক প্লাটুন পাকসৈন্যকে আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনীর অসমসাহসী যোদ্ধারা ২০জন দুশমন সৈন্যকে খতম করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে প্রকাশ, সাতক্ষীরার নিকট দুশমন সৈন্যদের ঘাঁটির উপর মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালিয়েছেন। ঐ এলাকার কয়েকটি আউট পোস্টেও আমাদের মুক্তিবাহিনী প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে দস্যু সৈন্যদের অনেককেই হতাহত করেছেন।

গত ১২ই জুন ভোমরা সেক্টরের কলারোয়ায় মুক্তিবাহিনী প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে ১৬ জন খানসেনাকে খতম করেছেন। মুক্তিবাহিনী ঐ দিন রাতে আরেক অভিযানে ৬০ জন খানসেনাকে হত্যা করেছেন। কলারোয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও তথাকথিত শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট ওয়াজেদ আলী চৌধূরীকেও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা খতম করেছেন।

মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিম খন্ডে খানসেনার উপর ব্যাপক আক্রমণ চাপিয়ে মেহেরপুরের নিকটে এক প্লাটুন খানসেনাকে খতম করেছেন। মুক্তিবাহিনী মেহেরপুর শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে কামদেবপুর গ্রামে ইছাখালী সীমান্ত চৌকি দখল করে নিয়েছেন। এতদাঞ্চলে মর্টার থেকে গুলিবর্ষণ করে মুক্তিবাহিনী শত্রুসেনাদের এক প্লাটুন সৈন্য খতম করে দিয়েছিলেন। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন পদস্থ অফিসারও রয়েছে।

জয়বাংলা, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫জুন ১৯৭১

উপর্যুক্তভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্হানে ও প্রান্ত সীমানাগুলিতে গেরিলা যুদ্ধ চলিতেছিল। সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহত করিবার লক্ষে কলিকাতায় ১১ থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানী সহ সকল সেক্টর কমান্ডারগণ এই সম্মেলনে উপস্হিত ছিলেন (দলিলপত্র ঃ দশম খন্ড, পৃ ঃ ২) t

দশদিনব্যাপী সম্মেলনে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই বৈঠকে লেঃ কর্নেল এম, এ, রব বাংলাদেশ বাহিনীর চীফ-অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার ডেপুটি চীফ- অব-স্টাফ নিযুক্ত হন।

সন্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে ঃ

১। বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা নির্ধারণ।

২। গেরিলা যুদ্ধের আয়োজন ।

৩। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের অবিলম্বে ব্যাটালিয়ন ফোর্স এবং সেক্টর ট্রুপস এর ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে।

৪। শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

(ক) প্রতিটি সুবিধাজনক স্হানে শত্রুর বিরুদ্ধে রেইড এবং অ্যামবুশের মাধ্যমে আঘাত হানার জন্য বিপুল সংখ্যক গেরিলাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর ব্যবস্হা করতে হবে।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে দেয়া হবে না। বিদ্যুতের খুঁটি, সাবস্টেশন প্রভৃতি উড়িয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অচল করার মাধ্যমে এ কাজ করতে হবে।

(গ) পাকিস্তানীদেরকে কোন কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্য রফতানী করতে দেয়া হবে না। এসব জিনিস যেসব গুদামে থাকবে সেগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে।

(ঘ) শত্রুপক্ষের সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম আনা-নেয়ার জন্য ব্যবহারযোগ্য বাহন রেলপথ, নৌযান পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে হবে।

(ঙ) রণকৌশলগত পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

(চ) শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করার পরে তাদের বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর ওপর গেরিলারা মরণপণ আঘাত হানবে ।

উপরে বর্ণিত কার্যক্রম অনুসারে ক্রমান্বয়ে প্রায় লক্ষাধীক মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হইতেই তাহারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমাগত গেরিলা অভিযান পরিচালনা করিয়া হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। এমনকি খোদ রাজধানী ঢাকাতেও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল সহ (বর্তমান শেরাটন হোটেল) বিভিন্ন স্হাপনায় আক্রমন পরিচালনা করিয়া হানাদার বাহিনীকে তাহারা হতবাক করিয়া দেয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বন্ধে Lt. General JFR Jacob তাহার লিখিত ‘Surrender at Dacca, Birth of a Nation’ (1997) পুস্তকে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন পৃঃ ৯০-৯৪)ঃ

> On the request of the Provisional Government of Bangladesh, the Government of India directed the Army to provide assistance to the Mukti Bahini who controlled areas of East Pakistan contiguous to our borders. The code name given to the guerrilla operations in East Pakistan was ‘Operation Jackpot’. The recruitment and control operations of the Mukti Bahini was set up on a regional basis with their headquarters located at Calcutta at ‘Mujibnagar’ in Theatre Road. It was headed by Col M G Osmani, with Wing Cmdr Khondkar as his deputy. ....
>
> ....
>
> Some 400 naval commandos and frogmen were trained. They were effective in attacking port facilities. Together with a Mukti Bahini gunboat mounting a Bofors 40 mm gun they captured, sank or damaged some 15 Pakistani ships, 11 coasters, 7 gunboats, 11 barges, 2 tankers and 19 river craft. These were, in fact, the most significant achievements of the Mukti Bahini.

The Mukti Bahini operations were stepped up from September and became better organized and more effective. They began to have a demoralizing effect on the Pakistani Government in Dacca and also the Pakistani Army, particularly the enlisted men, who were becoming increasingly disenchanted with their cause and their officers...

....

The achievements of the Bangladesh forces and guerrillas were nevertheless, a key factor in the liberation struggle. Despite the limitations of training and lack of junior leadership, they contributed substantially to the defeat of Pakistani forces in East Bengal. They achieved significant results in occupation of areas in the interior, demolitions and harassment. They completely deoralized the Pakistani Army, lowering their morale and creating such a hostile environment that their ability to operate was restricted and they were virtually confined to their fortified locations. The overall achievements of the Mukti Bahini and the East Bengal Regiments were enormous. Bangladeshis can be proud of them. Their contribution was a crucial element in the operations prior to and during full scale hostilities. Due credit must be given to their dedicated efforts to achieve the independence of their country.

ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় আগমন করেন। সেই সময়কার অবস্হা সম্বন্ধে তিনি তাহার লিখিত East Pakistan : The Endgame পুস্তকে লেখেন (পৃঃ ১৭৫-১৮২)ঃ

The concept of one Pakistan was all but dead in the Bengali mind. The only thing between Bangladesh and Pakistan, in my mind, was the military presence in the East. Pakistan was bound to lose her eastern wing as soon as the military was withdrawn. It was a most extraordinary and distrubring state of affairs. Only armies of occupation find themselves placed in such a situation.

....

....

The army was—without doubt—present in full force, but whether it was also in full command, was another question. The whole situation was ridden with contradictions and paradoxes; there could be no genuine peace and normality while the army was there and yet, there would be no East Pakistan without the army. The presence of the military alone stood between the continued existence of East Bengal as a part of Pakistan and the instant emergence of Bangladesh as a *fait accompli.* The Bengalis had long since lost their attachment to Pakistan and the very word 'Pakistani' had become synonymous with 'traitor', 'collaborator', and agent of the 'Punzabi Fauj.'

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

In Dhaka itself, the public reaction to the coming by-election was not altogetehr negative but the rebels, fighting the actual war, reacted violently to it. Almost immediately, acts of subversion and sabotage increased manifold. Dhaka became the main target and the centre of terrorist activity. One evening, the entire city was suddenly plunged into darkness as terrorists attacked the main powerhouse. The cantonment used emergency lights with the help of the army generators. The guards, who used to stand outside the VIP room of the Mess and had been withdrawn earlier, were posted there again. Security checks at the points of entry to the cantonment were tightened. No Bengali could enter or leave the cantonment without a pass or an army escort. This included even government officials. Army patrols combed the town. No military officer could move out of the cantonment area by himself after dark, and even during the day, armed escorts accompanied them for security.

Most of the city seemed to have turned into a minefield, with the so-called 'nuisance mines' laid everywhere. The generals and brigadiers drove between the cantonment and city's main commercial area was in the grip of fear. Hardly a day went by when an explosion of some sort did not take place. Reports of the peace

committee members being attacked, killed, or wounded by the Muktis increased.

The West Pakistani civil servants were completely domoralized by the state of affairs.

....

....

For the first time, I also found a distinct change in the attitude of my Bengali friends, pariticularly those belonging to the press. They seemed to have lost the will and the need to communicate and were afraid of being seen with me in public. Even someone as forthcoming as Zahur Bhai of the *Shangbad,* hardly ever said anything during a meeting. He looked totally lost. ....Hashim (Babu) of the APP avoided me scrupulously despite my telephone calls. He would not even come to the cantonment to see me. Mainul of the *Ittefaq,* son of Manik Mian, was annoyed and dissatisfied with the treatment being meted out to highly respectable Bengalis like himself............. He thought the Bengalis were being treated even worse than third-class citizens. Inayatualh of the *Holiday* met me only briefly. Until only about a couple of months earlier he had been trying very hard to revive his weekly *Holiday*; but he would not even talk about it now. K.G. Mustafa, president of the Pakistan Federal Union of Journalists, was not around. There had been reports that he had defected. Badruddin, the Bihari editor of the *Morning News*, was also afraid.....................Perhaps the most disturbing feature of the situation was the loss of confidence of the West Pakistani, mainly the civil bureaucracy, in the army.

....

....

A growing sense of isolation was talking root in the minds of the West Pakistani civilians. Every one of them would have given anything in the worlds ot get back to the West; they were convinced of the futility of it all.

....

....

One was forced to wonder about how long the army could hold on. The military was not professionally trained for counter-insurgency operations. They were up against a very different type of enemy—their own people, the guerrillas of the Mukti Bahini—the proverbial fish in a sea of humanity. The army's brave posture was completely out of step with the real situation. It was aggravated by daily incidents of subversion and sabotage by the miscreants. Dhaka was an embattled city. The military was physically there but hardly in full command of the situation. The borders and the hinterland both were full of saboteurs. Many senior military officers were begining to finally realize the futility of the exercise. They felt abandoned and trapped. They had no rear, no sanctuary, in the event of a decisive military reverse (the word defeat, though uppermost in everyone's mind, was never uttered).

Farman would unhesitatingly call the army an 'occupation army.' He told me that he had seen two armies of occupation in his life—the first was the US Army in Japan and the second was the Pakistan Army in East Pakistan—and that he would not like to see a third one. He, too, seemed to be suffering from a feeling of isolation from the martial law authorities.

....

....

Niazi seemed convinced that the war would be fought on the enemy soil, if only he could control the depredations of the Mukti Bahini.

....

....

Mujib was crucial to the success of any political move at that stage. He was as crucial alive as dead. Alive, he could resume his political leadership; dead, he would turn into a symbol of martyrdom.

....

....

At the airport I came across the commissioner of Dhaka, Alamdar Raza and the IG Police, Mehmood Chowdhry—both friends from West Pakistan. A forthright and outspoken man, the commissioner had a lot to say about the behaviour of young military officers, he thought that they had were totally out of control and their superiors were just not willing to listen to anything against them. He cited the case of some naval officers who were on a rape-spree. He personally reported the matter to the colonel in-charge of civil affairs.

'What do you expect them to do in a situation like this- pray and count beads all the time?' the colonel replied curtly.

'Sir,' the commissioner went on to say, 'shall I take it that the boys are doing this with the approval of the authorities?'

'You,' the colonel shot back, 'may take it the way you like. Now, what's your next problem ?'

....

....

উপরের বর্ণনা হইতে ১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার অবস্হা সম্বন্ধে একটি মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়। বোঝা যায় যে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমনের সন্মুখে হানাদার বাহিনীর বীরত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল।

Newsweek এর দৃষ্টিতে বাংলাদেশের তখনকার অবস্থা নিবরূপ ঃ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১২ পরাজয়োন্মুখ	নিউজউইক	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

দলিলপত্র চতুর্দশ খন্ড ১৪ পৃঃ ২৫১

NEWSWEEK, NOVEMBER 15, 1971

THE SUB-CONTINENT: A LOSING BATTLE

To assess the military situation in that sector, Newsweek's Senior Editor Arnaud de Borchgrave flew last week to East Paksitan and cabled the following report :

"Go anywhere you want, see for yourself," Pakistan's President Mohammed Yahya Khan told me.

……………………………………………………………………………………

Such thinking lays bare the fact that the Pakistani Army has only the dismest notion of guerrila warfare. For while the soldiers were clustered on the border, the Mukti Bahini seemed to have the run of East Pakistan. The government has attempted to combat the insurgents with "razakars," local teen-age hoodlums raised to the status of a paramilitary force. But the razakars harm the government cause more than they help it. "They think they are God because they have guns," one villager told me. They tell the people they have blanket power from the army " to make life hell" for the revels, but they are as apt to terrorise a man who refuses to give them food or a girl who resists their lewd advances. Several times my car was stopped by two or three razakars at makeshift bridges-once with the barrel of a gun poking through the window. I was asked to pay a "toll." Such tactics when applied against the populace, have turned most Bengalis into Mukti Bahini supporters: when I asked people whether they wanted to remain part of Pakistan or create a new state of Bangladesh, almost all answered, "Bangladesh."

Even some unlikely people expressed hope for an autonomous Bangladesh. At a ferry crossing on the outskirts of the capital city of Dacca, I asked a young man who worked for the government what he thought would be best for the people. "I am not alllowed to say," he replied at first. But reassured that he would not be named, he mumbled in a low voice, "Bangladesh should be independent, of course. All of us feel that way." And seemingly thousands do. For while green and white Pakistani flags flutter over even the most wretched huts, and peasants every where make a point of wearing sarongs and shirts in the national colours, several people whispered to me that they did so only to deceive the razakars into thinking they favoured the government.

> Like the Americans in South Vietnam, the Pakistani command seems dangerously unaware of the real sentiments and loyaltics of the population. The official insistence that all was going well was reflected in the remarks of Gen. A.A.K. Niazi, the eastern sector commander. The revels were no serious problem-" we have the razakars to take care of them." the shelling from India's troops massed just across the border was not a great threat-" My men are not worried; as long as they are in their bunkers, they can relax, even play cards.," And as for the report that Mukti Bahini leaders were calling on Bengalis to take their fight into the streets of Dacca, Niazi insisted that he would relish such a move. " I wish they would do it," he told me, " My tanks are only a few miles from the city". Then, referring to the repression of the Bangalis' revolt last March he added, "They saw then what we can do –and we will do it again if need be."
>
> What the general does not seem to appreciate is the steady deterioration of internal security and the degree of organisation of the Mukti Bahini. By last week, the government had lost control of 25 per cent of the police stations in East Pakistan. A number of district commissioners are tacitly co-operating with the guerrillas and much of the area north of Dacca itself is controlled outright by the Mukti Bahini. I personally was contacted by a Mukti Bahini representative within 30 minutes of checking into my hotel in Dacca-despite tight Police security. The rebels have established a disciplined network carefully organised into teams-some assigned to collect taxes and organise bank robberies others designated as saboteurs, still others coldly earmarked to be assassins.

The harsh truth about Bengali resistance are being concealed not only from the area's civil governor, A.M. Malik, but from President Yahya himself. They are both convinced that the Pakistani Army is effectively and honourably fighting the guerrillas. Yet highly knowledgeable foreign observer accuses the soldiers of atrocities. Ostensibly in pursuit of a rebels, army troops, recently surrounded the village of Demora (where the Mukti Bahini had never been), raped all the women between 12 and 35

and shot all the men order than 12. Only days later, Pakistani gunboats swept up the river at Chalna, sinking fishing boats and shooting the fishermen as they swam for safety. All this accomplishes to make resistance in East Pakistan more extreme, more dedicated than ever. The majority of the people are already anxious to break away from Pakistan, while army commanders-despite their public bravo-are beginning to realise that they are trapped in an unwinnable guerrilla war.

ঝ) মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায় ঃ

২১/২২ নভেম্বর হইতে মুক্তি বাহিনী বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে প্রচন্ড আক্রমন আরম্ভ করে। একদিকে হানাদার বাহিনী পিছু হটিতে আরম্ভ করে অন্যদিকে মুক্তিফৌজ ধীরে ধীরে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে।

২৩শে নভেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

৩রা ডিসেম্বর বিকাল বেলায় পাকিস্তান বিমান বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে। সেনা বাহিনীও ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

ঐ সময় ইন্দিরা গান্ধী কলিকাতায় একটি সভায় ভাষণ দান করিতেছিলেন। তড়িৎ দিল্লি প্রত্যাবর্তন করিয়া ঐ রাত্রেই তিনি বেতারে নিম্নলিখিত ভাষণ প্রদান করেন। (Bangladesh Documents Vol. II, UPL, Page-209) :

II. OFFICIAL STATEMENTS

Prime Minister Indira Gandhi's broadcast to the Nation soon after midnight

December 3, 1971

I speak to you at a moment of grave peril to our country and to our people. Some hours ago, soon after 5-30 p.m. on December 3, Pakistan launched a full scale war against us. The Pakistani Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot,

Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. Their ground forces are shelling our defence positions in Sulaimanki, Khem Karan, Poonch and other sectors.

Since last March, we have borne the heaviest burden and withstook the greatest pressure, in a tremendous effort to urge the world to help in bringing about a peaceful solution and preventing the annihilation of an entire people, whose only crime was to vote for democracy. But the world ignored the basic causes and concerned itself only with certain repercussions. The situation was bound to deteriorate and the courageous band of freedom-fighters have been staking their all in defence of the values for which we also have struggled, and whcih are basic to our way of life.

Today, the war in Bangla Desh has become a war on India. This has imposed upon me, my Government and the people of India a great responsibility. We have no other option but to put our country on a war footing. Our brave officers and jawans are at their post mobilised for the defence of the country. An emergency has been declared for the whole of India. Every necessasry step is being taken, and we are prepared for all eventualities.

I have not doubt that it is the united will of our people that this wanton and unprovoked aggression should be decisively and finally repelled. In this resolve, the Government is assured of the full and unflinching support of all political parties and every Indian citizen. We must be prepared for a long period of hardship and sacrifice.

We are a peace loving people. But we know that peace cannot last if we do not guard our democracy and our way of life. So today, we fight not merely for territorial integrity but for the basis ideals which have given strength to this country and on which alone we can progress to a better future.

Aggression must be met, and the people of India will meet it with fortitude and determination and with discipline and utmost unity. Jai Hind !

ইহার পর পরই পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধের গতি তীব্রতর হয়। ভারতীয় সেনা বাহিনী ও মুক্তিফৌজ দুর্বার গতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করিতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে ভারত ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করে।

১২ই ডিসেম্বর এর মধ্যে ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর ঢাকা নগরীর কাছাকাছি অবস্হানে চলিয়া আসে। পাকিস্তানী জেনারেলগণও উপলব্ধি করিতে পারেন যে যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় তখন কেবল সময়ের ব্যাপার।

এ) বুদ্ধিজীবী হত্যা ঃ

এই সময় পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী আল্ বদর, আল্ সাম্‌শ, রাজাকার বাহিনী বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীগণকে পরিকল্পিত ভাবে ঠান্ডা মাথায় হত্যার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুসারে তাহারা ১২-১৪ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ২০০-২৫০ জন বুদ্ধিজীবীগণকে তাঁহাদের গৃহ হইতে অপহরণ পূর্বক নৃশংস ভাবে হত্যা করে। নিবে তাহাদের মাত্র কয়েকজন সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইল ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ৮ম খন্ড

পৃঃ ৬২০- ৬৩০

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হানাদার বাহিনীর সহযোগী আল-বদরদের হত্যার শিকার কয়েকজন	সাপ্তাহিক বিচিত্রা জাতীয় দিবসের বিশেষ সংখ্যা	১৯৭৩

শেষ দিন শেষ কথা

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

বেলা তখন বারো কি এক। এমন সময় নীচে লোহার গেটে শব্দ শোনা গেল। কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে। মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখলেন কম বয়সী কয়েকটি বাঙ্গালী ছেলে দরজা ধাক্কাচ্ছে। মুনীর চৌধুরী সে সময় স্ত্রীকে বললেন, থাক দেখার দরকার নেই। সরে এসো। বলে তিনি আবার চুল আঁচড়াতে লাগলেন। স্ত্রীর সাথে মুনীর চৌধুরীর ঐ ছিল শেষ কথা।

এমন সময় নীচে থেকে তাঁর ছোট ভাই ওপরে এসে বললেন, মুনীর ভাই আপনাকে নীচে ডাকছে।

মুনীর চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, আমার নাম করে বলেছে ?

হ্যাঁ।

পাঞ্জাবী পরে তিনি আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেলেন। মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী লিলি চৌধুরী কিন্তু তখনও আতঙ্কিত হননি। তাঁর স্বামীকে কেউ যে ধরে নিয়ে যেতে পারে একথাও তার মনে হয়নি। কারণ যারা তাকে ডাকতে এসেছে সবাই কম বয়সী, বাঙ্গালী।

তবুও লিলি চৌধুরী সিঁড়ি ধরে নীচে নামলেন। দেখলেন মুনীর চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন নীচে। আসে পাশে বন্দুক নিয়ে কয়েকটি অল্প বয়সী ছেলে। তিনি শুনলেন, মুনীর চৌধুরী তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের অফিসার কোথায়?

একথা বলার সাথে সাথে একটি ছেলে তাঁর পিঠের কাছে বন্দুক উঁচিয়ে বললো, আছে, আপনি চলুন। মুনীর চৌধুরী আস্তে আস্তে হেঁটে তাদের সাথে চলে গেলেন। (পৃঃ ৬২০-৬২১) ।

অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

আল-বদর এবং রাজাকারেরা চৌদ্দই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ফ্ল্যাটে তাঁর খোঁজ করলো। পেল না। পরে তাঁর তবলীগ পন্থী চাকরের কাছ থেকে মালিবাগের ঠিকানা জেনে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।

চৌদ্দই ডিসেম্বর দুপুরের দিকে আল-বদররা এসে হাজির হলো লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর বাসায়। দরজায় কড়া নাড়ার পর লুৎফুল হায়দার দরজা খুলে দিলেন।

'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কোথায় ?'

'এখানেই আছেন।'

'আমাদের অফিসার তাঁর সাথে কথা বলবেন, তাঁকে একটু ডেকে দিন।'

লুৎফুল হায়দার ডেকে দিলেন। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সাথে তাঁর স্ত্রীও এলেন বাইরের ঘরে। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের অফিসার কোথায়?'

'গাড়ীতে আছেন।'

'আপনারা যে তাঁকে নিতে এসেছেন, ওয়ারেন্ট আছে আপনাদের সাথে ?' মোফাজ্জল সাহেবের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

'আছে।'

'আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে ?' ফের তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

'জানি না।'

'বাঃ, এটা কেমন কথা।' স্ত্রী অবাক হলেন, ভয় পেলেন। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তখন বললেন, 'ঠিক আছে আমি কাপড় পরে নেই।'

বাথরুমে তাঁর গোসলের জন্য তখন গরম পানি তৈরী। কিন্তু তিনি আর গোসল করলেন না। স্ত্রী স্যুট বের করে দিলেন। তিনি স্যুট পরে আবার বাইরের ঘরে এলেন। তাঁর স্ত্রী তখন বললেন, 'আমি ওর সঙ্গে যাবো।'

একজন আল-বদর জওয়াব দিল, 'আপনি তো আমাদের মায়ের মতো। আপনি আর কই যাবেন। আর উনি তো আমাদের স্যার। আমরা এখনই ওকে ফেরত দিয়ে যাবো।'

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তখন হঠাৎ বললেন, 'আমি চাট্টি খেয়ে নিতে পারি ?

'আমাদের ওখানে সব ব্যবস্হা আছে। আপনি চলুন।'

তিনি তখন আবার হঠাৎ বললেন, 'ঘড়িটা পরে নেই ?'

'না, না, দরকার নেই। আপনি তো এখনি আবার চলে আসবেন।'

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শেষ যাত্রার জন্য পা বাড়ালেন। পা বাড়াবার আছে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তো অন্যায় কিছু করিনি, তুমি ঘাবড়াচ্ছো কেন ? আমি এখনই চলে আসবো।'

<u>অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ও</u>

<u>অধ্যাপক রাশীদুল হাসান</u>

------দরজা নক। দরজা খুললেন আনোয়ার পাশার ছোট ভাই। তারা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। আনোয়ার পাশা আর রাশীদুল হাসান তখন ড্রইংরুমে। একজন আনোয়ার পাশাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন।, 'আপনার নাম আনোয়ার পাশা ?'

হ্যাঁ।'

'আপনি বাইরে আসুন।'

এমন সসময় তাদের চোখ পড়লো রাশীদুল হাসানের দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার নাম ?'

'রাশীদুল হাসান।'

'আপনিও চলুন।'

সেই সময় রাশীদুল হাসানের স্ত্রী এসে দরজার মুখে দাঁড়ালেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আনোয়ার পাশা এবং রাশীদুল হাসান একবার তার দিকে তাকালেন। চোখ তাঁদের ছলো ছলো। কিন্তু একেবারে নিশ্চুপ তারা। ছলো ছলো চোখে দুজনে আরেকবার তাঁর দিকে (রাশীদুল হাসানের স্ত্রী) তাকিয়ে আস্তে আস্তে আল-বদরদের সাথে পা বাড়ালেন। আনোয়ার পাশার স্ত্রী জানালা দিয়ে শুধু দেখলেন তাদের গায়ের চাদরে তাদের চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (পৃঃ ৬২২-৬২৩)

ডঃ সিরাজুল হক খান

১৪ই ডিসেম্বর খুব ভোরে তিনি ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়লেন। একবার ওপরে নিজের ফ্ল্যাটে গেলেন তারপর আবার নীচে নেমে এলেন। এবং সে সময় তার নজরে পড়লো, একটু দূরে আল বদর বাহিনীর কিছু লোক রুমাল দিয়ে এক ভদ্রলোকের চোখ বাঁধছে। সাথে সাথে তিনি ওপরে উঠে গেলেন। সবাইকে বললেন, 'ওরা আমাদের এলাকায় ঢুকেছে। তোমরা সাবধানে থাকো।'

আল-বদর বাহিনী ওপর তলায় তাঁর ফ্ল্যাটে এসে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা ডঃ সিরাজুল হকের বাসা ?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কোথায় ?'

'নীচে গেছেন।'

'কোন বিভাগের অধ্যাপক তিনি ?'

'শিক্ষা-গবেষণা কেন্দ্র।'

'হ্যাঁ, আমরা তাকেই খুঁজছি।'

এই বলে তারা ডঃ খানের ভাইকে নিয়ে ইসমাইল সাহেবের ড্রইংরুমে উপস্থিত হলো। ডঃ খানকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলো। তারপর তাঁকে ঘর থেকে বাইরে এনে, তাঁরই পকেটের রুমাল দিয়ে তাঁর চোখ বেঁধে অচেনা গন্তব্যের দিকে নিয়ে চললো। পরিবারের সবাই তাকিয়ে রইলো বিমূঢ় হয়ে। (পৃষ্ঠা-৬২৩-৬২৪)

<u>ডাক্তার আলীম চৌধুরী</u>

২৯ নম্বর পুরানা পল্টনের দোতলায় থাকতেন মিটফোর্ড হাসপাতালের ডাক্তার আলীম চৌধুরী। তার নীচের তলায় থাকতেন মওলানা আব্দুল মান্নান, নীচের তলায় আগে ডাক্তার আলীমের ক্লিনিক ছিল। কিন্তু মওলানা সাহেব একবার বিপদে পড়ে প্রাক্তন স্পীকার এ,টি,এম,মতিনকে ধরে বসেন আশ্রয়ের জন্যে। মতিন সাহেব আলীম সাহেবকে বললেন, ডাক্তার চৌধুরী, ক্লিনিক উঠিয়ে মওলানাকে আশ্রয় দিন।

১৫ ডিসেম্বর ঢাকায় তখন ভারতীয় বিমান হরোদমে বোমা বর্ষণ করছে।

বেলা দুটো থেকে আবার বোমা বর্ষণ শুরু হলো। দোতলার বারান্দায় বসে সেই বোমা বর্ষণ দেখছিলেন ডাঃ চৌধুরী। বিকেল সাড়ে চার। একটা মাইক্রোবাস এসে থামলো বাসার নীচে। কয়েকজন আলবদর নামলো। ডাক্তার চৌধুরীর স্ত্রী একটু উঁকি দিয়ে দিয়ে তাদের দেখছিলেন তখন তিনি বললেন, অতো উঁকিঝুঁকি দিয়ো না। বোধহয় আর্মি এসেছে। বলে তিনি বাথরুমে গেলেন। ব্যাপারটার তেমন গুরুত্ব দেননি স্বামী-স্ত্রী। কারণ মওলানা মান্নানের বাসায় হরদম এধরণের লোকজন আসা-যাওয়া করতো।

বাথরুম থেকে তিনি বেরিয়েছেন, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলো।

স্ত্রী বললেন, 'বোধহয় আমাদের বাসায়ই আর্মি এসেছে। কি করবো এখন ?'

ডাঃ চৌধুরী হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে গেলেন। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এলোমেলোভাবে বললেন, ও, এসেছে, তা দরজা খুলে দাও।

একথা বলেই তিনি নীচে নামার উদ্যোগ নিলেন। ডাঃ চৌধুরীর মা তখন বলে উঠলেন, 'আরে কোথায় যাচ্ছো ?'

তিনি বললেন, 'নীচে, মওলানার কাছে কারণ মওলানা বলেছিল, এ ধরণের কোন ব্যাপার ঘটলে যেন তাকে খবর দেয়া হয়।

নীচে নেমে তিনি মওলানার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। এমনিতে মওলানার দরজা সব সময় খোলা থাকতো। কিন্তু সেদিন দরজা বন্ধ। এদিকে ডাঃ চৌধুরী দরজা ধাক্কাচ্ছেন, চীৎকার করে মওলানাকে দরজা খুলতে বলেছেন। কিন্তু মওলানার কোন সাড়াশব্দ নেই। খানিক পর মওলানা ভিতর থেকে বললেন, ভয় পাবেন না। আপনি যান। আমি আছি।

তিনি ফের উপরে ওঠার জন্য পা বাড়ালেন। এমন সময় আলবদরের আদেশ 'হ্যান্ডস আপ, আমাদের সাথে এবার চলুন।'

'কি ব্যাপার কোথায় যাবো ?'

প্রশ্ন করলেন ডাঃ চৌধুরী।

'আমাদের সাথে চলুন।'

'প্যান্টটা পরে আসি।

কোন দরকার নেই।'

আলবদররা তাঁকে ঘিরে ধরলো। আস্তে আস্তে তিনি মাইক্রোবাসের দিকে অগ্রসর হলেন। (পৃঃ ৬২৫-৬২৭)।

<u>শহীদুল্লাহ কায়সার</u>

শহীদুল্লাহ কায়সার প্রায়ই স্ত্রীকে বলতেন, দেখো, আমাকে যে কোন সময় নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং সব সময় আমার জন্য কিছু কাগজ-কলম আর সিগারেট রেখে দেবে। আর কিছু টাকা। শহীদুল্লাহ কায়সার আরো বলতেন, 'আমি এক জন সাংবাদিক। তারা আমাকে যাই করুক মারবার সাহস পাবেনা।'

চাকরকে তিনি রুটি বানাবার কথা বলেছেন এমন সময় দরোজায় ধাক্কা। মিলিটারী এসেছে।

আলবদররা এদিকে দরজা ধাক্কাচ্ছে। তিনি বললেন দরজা খুলে দাও।

পর্দার কাছ থেকে শহীদুল্লাহ কায়সার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কাকে চান ?'

আপনার নাম কি ?' তারা পাল্টা জিজ্ঞেস করলো।

শহীদুল্লা কায়সার।'

সঙ্গে সঙ্গে তারা তাঁর হাত ধরলো। 'আপনার সাথে কথা আছে।' বলে তারা তাঁকে বারান্দায় নিয়ে এলো।

এদিকে বাসা জুড়ে হৈ-চৈ চীৎকার আলবদররা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় শহীদুল্লাহ কায়সার কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আমি তো যাচ্ছিই। আপনারা আমার হাত ধরবেন না।' এ বলে তিনি একবার পিছন ফিরে সবাইকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু আলবদররা তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি। (পৃঃ ৬২৭-৬২৮)।

সিরাজউদ্দিন হোসেন

সিরাজউদ্দিন হোসেন ছিলেন বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। ইত্তেফাকের 'মঞ্চে নেপথ্যে' কলামটি তিনিই লিখতেন।

১৯৭১ সনের ১১ই ডিসেম্বর ভোর ২-৪৫ মিনিটে পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্দেশে একদল উর্দুভাষী লোক তাঁকে তাঁর বাসা থেকে অপহরণ করে হত্যা করে। সিরাজউদ্দিন হোসেনের মৃতদেহের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। (পৃঃ ৬২৯)।

গিয়াস উদ্দীন আহমেদ

১৪ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। ঢাকা শহরে তখন চলছে একটানা কারফিউ। সকাল সাড়ে সাতটা। একটা মাইক্রোবাস এসে দাঁড়াল হলের হাউস টিউটরদের বাসার সামনে। বাস থেকে সশস্ত্র ৩/৪ জন লোক নেমে দাঁড়াল। তারা ছিল ইউনিফর্ম পরা। তাদের দুইজন এসে প্রথমে নীচতলায় পরিসংখ্যান বিভাগের বজলুল হক সাহেবের বাসায় তল্লাশী চালায়। এর পর তারা উপর তলায় আমাদের দরজায় আঘাত করতে থাকে আমার স্বামী (জনাব নূরুল হক সরকারী চাকুরে) দরজা খুলে দেন। একজন বন্দুক হাতে কাল মুখোশ পরা তাঁর বুকের সাথে বন্দুক লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল, গিয়াসউদ্দীন কে ? উনি বল্লেন, বাসায় নেই, হলের কাজে গেছেন। লোক দুটো তখন বল্লো, আপনি চলুন। আমাদের সাথে, তাঁকে খুজে বের করে দেবেন। আমরা থাকতাম আজিমপুর কলোনীতে।

কলোণীতে মিলিটারী আসায় ভাই-এর বাসায় আমরা চলে আসি। আমার স্বামী তাদের বল্ল, আমরা এখানে নতুন এসেছি, হলের কোন কিছু জানিনা। তারা বল্ল, ভিতরে চলুন, এখানে গিয়াসউদ্দিন সাহেব থাকতেন। ভাই এর কামরায় এসে ওরা সমস্ত রুম তছনছ করে দিয়ে গেল। ঘরে আমার এক মামাতো ভাই ছিল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে, ওকে নিয়ে চলল- হলে ভাইকে খুঁজে দিতে। হলে গিয়ে তারা দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো, গিয়াস সাহেব কোথায় ? তারা বল্ল, হলের পেছণে পানির পাম্প ঠিক করছেন। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে ভাইকে ধরে নিয়ে এল। সামনে পড়া একজন দারোয়ানের কাছ থেকে একটা গামছা ছিনিয়ে নিয়ে চোখ বেঁধে তাঁকে নিয়ে চলল। বাসে উঠার আগে ভাই মামাতো ভাইটিকে বললেন "নুরুকে বলিস টেলিফোন করতে।" স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্না-ভেজা কন্ঠে কথাগুলো বলছিলেন অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন সাহেবের বোন।

ট) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন ও বিজয় দিবস ঃ

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের অব্যবহিত পূর্বে গভর্ণরের বাসভূমি ও ঢাকা শহরের চিত্র ঢাকায় অবস্হিত জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কর্মকর্তা জন কেলীর নিবোক্ত প্রতিবেদন হইতে পাওয়া যায় ঃ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আত্মসমর্পনের আগে দখলদার বাহিনীর বেসামরিক সরকারের পদত্যাগ ও সে সময়ের পরিস্হিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কর্মকর্তা জন কেলীর একটি প্রতিবেদন।	এ্যাডভোকেট আমিনুল হক।	৮মার্চ, ১৯৭২।

দলিলপত্রঃ সপ্তম খন্ড পৃঃ ৬৪৯-৫৫৫

THREE DAYS IN DACCA 1971
by
Jhon R. Kelly

This is a personal accound of some of the events which occurred in Dacca on 14, 15 and 16 December 1971. It in no way involves the Organization of which I am a member, and is written simply as a personal recollection of some of the events surrounding the birth of Bangladesh.

My own involvement in the events stated when I was assigned in August to Dacca by the United Nations High Commissigner for Refugees, Prince Sadruddin Aga Khan, to assist here in any problems restrain assignment, and as this is a non-political account, I am not putting down any comments on that aspect here

and will sayd that, perhaps because I am an Irishman, I felt great sympathy for the Bengali people and wish onwy to see them enjoy a happy, prosperous and peaceful future.

When hostilities broke out at the beginning of December it was quite clear that activities concerning refugees were at an end for the duration. The Assistant Secretary-General fo the United Nations was in over-all charge fo the United Nations Relief Operation, Mr. Paul Marc Henry, a redoubtable Frenchman and an inspiratinn to us all, happened to be in Dacca for a short visit when hostilities broke out and trpped him here. He naturally assumbed over-all charge of the whole UN group, and asked me to undertake liaison with the military and governmental authorities, which involved many matters which, I would stress, were all purely humanitrian in purpose with the sole aim of saving lives and alleviating suffering. This note, however, deals only with some of the events of the last three days of the hostilities of December 1971.

Thursday 14, December

On the morning of 14 December Dr. A. M. Mallik, then Governnor of East Pakitan, telephone me at the Inter-Continental Hotel where I was living and asked if I and Mr. Peter Wheeler, also of UN, could go around an see him at Governor's House about his own situation. I had met Dr. Malik many times in my functins both as UNHCR Representative in Dacca and also during the war period when I was doing military and Governmental liaison.

By this time the course of the war was obvious. The front was crumbling and from within Dacca the situation seemed very similar to Berlin in early 1945. When Peter Wheeler and myself went to see Dr. Malik at Governor's House he was in a Cabinet meeting but came out and led us to his ADC's Office. He asked for personal advice on his own situation.

I told him I thought he and his Ministers were in grave and imminent danger of being killed and that unless he sought refuge in the Neutral Zone at the Iner-Continental Hotel immediately he probably would not survive the night. However, in order to gain admission to the Neutral Zone they would have resign from all

official functions. He said that his Cabinet was at that moment considering whether or not to resign but they were reluctant to do so. He himself felt that he should not resign as, he said, in the eyes of history it would look like desertion if he resigned at that moment. He then asked if he could send his wife and daughter to the Neutral Zone. I replied that although his wife and daughter would certainly be admitted to the Neutral Zone at the Hotel Inter-Continental , this would not active his purpose the Hotel was full of journalists and they would say that Dr. Malik had so lost confidence in the future that he was sending his family into safety and they would then ask when he himself was coming.

At that moment Governor's House shook violently under several heavey explosions. It was clear that the building had come under direct attack from the Indian Air Force and Peter Wheeler and myself immediatley left, jumping over the balustrade, and I took shelter under a jeep about five yards away. There were about six Indian planes which made two strikes each on the building with rockets and then followed up with cannon. Duirng the first part of this attack Muzaffar Hussain, then Chief Secretary, emerged looking very pale and we exchaged **wan** salutations. As the strikes on Governor's House continued, I ran to a trench about 20 yards away which was already full of soliders and lay on top of them. All this time I kept a running commentrary on the action over my handset radio ("walkie talkie") to Paul Marc Henry at the UN location. General Farman Ali ran past, also looking for shelter" and said to me as he passed : "Why are the Indians doing this to us ?" Under the circumstances, as the Indian aircraft were continuting to attack the building some 20 yards away with rocket and cannonfire, it dod not seem a suitable occasion to engage in a discussion and I let General Farman carry on to find his own shelter. The sound of the attacks were deafening but eventullay they stopped and I got into my car, picked up Peter Wheeler, and returned to the UN location.

At the UN Location I informed Mr. Paul-**Mare Henry** of what had happended and met there Mr. Gavin young of "The Observer." Gavin Young told me, with a confidence which was subsequently proven very mistaken, that it would be at leaset an hour before the

Indian Air Force could return as they would have to go back to India to refuel and reload. He suggested that we return to Governor's House to see what had happended there. I agreed, and drove Gavin Young in my car back to Governor's House. We were met there by the Military Secretary who informed us that Dr. Malik and his Cabinet had taken shelter in a bunker in the grounds of the left of the Governor's House. He took us there and we found Dr. Malik and his Cabinet looking very shaken but still undecided whether to resign or not. I told them that I thought that they were not only in danger of being killed by irregulars, and they could not depend on their guards, but the Indian Air Force itself had now made a direct attack on their lives.

At that moment the Indian Air Force made a second devastating attack on Governor's House. Gavin Young had unfortunately been wrong in his estimate of the time for their return. The bunker is not a very safe bunker and it is above ground and we did not know whether or not the Indian Air Force knew of it existence. Certainly, a direct hit would have wiped it out. The aircraft continued to make Ministers then drew up a letter of resignation to the President of Pakistan which was singed by Dr. Malik and all the Ministers present.

Dr. Malik then withdrew to an inner room in the bunker where his wife and daughter were waiting, washed himself, knelt and said his prayers. The ex-Governor and the ex-Ministers moved a little later that day to the Neutral Zone in the Inter-Continental Hotel.

It seems clear that the collapse of the whole civil Government of East Pakistan on 14 December must have provided a severe shock to those directing the war on the Pakistan side and brought home to them the seriousness of the situation. It may well be that the collective resignation of the whoel East Pakistan Government thus shortened the war by one or more days.

Wednesday, 15 December

Early on the morning of 15 December Dr. Malik came to me in the Inter-Continental Hotel to say that in between his resignation as Governor and his departure from Governor's House on 14 December

he had received a telegram from President Yahya. So far as I know, this is the first time President Yahya authorized a cease-fire.

Dr. Malik said he had been unable to contact General Niazi concerning President Yahya's instructions : "You should now take me all necessary measures to stop the fighting," and he asked me for assistance. In order to save further loss of life, and in a personal capacity, I agreed to help. I then contacted Colonel Gaffur, the Pakistan Army Liaison Officer (in civilian clothes) in the Neutral Zone, and the three of us then went to my room where we telephoned General Niazi.

Dr. Malik asked General Niazi what action he had taken on the President's instruction; and General Niazi replied that he would like to discuss this with Dr. Malik and invited him to leave the Hotel and go to the Cantonment to discuss the matter. I advised Dr. Malik that if he left the Neutral Zone he would no longer have any protection and that under the circumstances of his resignation the day before and its likely effect, it might be dangerous for him to do so; I suggested that, instead, he invited General Niazi to come to the Hotel, but said he would send General Farman around to represent him at such a meeting.

General Farman duly came around to the Hotel. As a foreigner, and in any case I was acting privately and in no way as an intermediary, I withdrew from the discussion of such an internal nature and Dr. Malik, General Farman and Colonel Gaffur conferred together. Subsequently, they invited me back, and showed me the following proposals they had drawn up and which General Farman was taking to General Niazi for approval and transmission to President Yahya.

"To bring an end to loss of further human lives and destruction we are willing to, under honourable conditions :

a. Cease fire and stop all hostilities immediately in East Pakistan;
b. Hand over peacefully the administration of East Pakistan as arranged by the U.N.;
c. The UN should ensure :

(i) Safety and security of all armed personnel of both military and para-military forces of Pakistan pending their return to West Pakistan.

(ii) safety of all West Pakistani personnel-civillian and civil servants pending their return to West Pakistan;

(iii)safety of all non-locals settled in East Pakistan since 1947."

(iv) gurantee of no reprisals against those who helped and served the Government and cause of Pakistan since March 1971."

General Farman undertook to return to the Neutral Zone later that day and let us knew the reactions of General Niazi and President Yahya to their proposals. General Farman did return about 2100 hours and informed us that, althogh General Niazi had approved these proposals, Islamabad had rejected them on item (b) "to hand over the administration of East Pakistan." Thus ended yet another attempt at a cease-fire in the hostilites.

Thursday, 16 December

Early on the morning of 16 December we learned of the ultimatum by the Indian Army to the Pakistan Army in East Pakistan to surrender by 0930 hours Dacca time that morning. Colonel Gaffur, Dr. Malik, Dr. Sven Lampell of the League of Red Cross Seocieties and myself all made desparate efforts to contact Pakistan Army, Head quarters by telephone from the Hotel but were uable to get any contact. Having myself participated in the Second World War in North Africa and Europe as an infantry Officer in the British Army I am only too well aware of the appalling loss of life and destruction which an all-out attack on Dacca would entail. Colonel Gaffur told us that he knew that the Pakistan Army Communications Centre had been destroyed by the Indian air attacks the day before and he was not sure, firstly, whether General Niazi accepted the ultimatum and, secondly, whether the Pakistan Army had been able to inform the Indian Army whether or not they accepted the ultimatum.

The Indian Air Force was already circling over Dacca, presumable in preparation for attack, and we knew that the Indian Army was gethering strength in the suburbs, also presumable in

order to launch an overwhelming artillery and infantry assault. I might add that we were subsequently told by Indian officers when they entered Dacca that the Indian Forces really meant business, if the ultimatum had not been accepted they really would have made an annihilating assault on Dacca. It was desperately urgent to save the city and, about 0830 hours, Colonel Gaffur, Mr. Lampell and myself decided to leave the Neutral Zone and drive to the Cantonment to find out from General Niazi what was happending and whether he had been able to get into contact with the Indian Army.

On the way to the Cantonment I informed Mr. Paul-Marc Henry at the UN location by my handset radio what we were doing, and he put the UN radio signallers in Dacca and New Delhi on the altert to stand-by for a possible extremely important message.

After some delay we were brought to the Command Bunker, but General Niazi was not to be seen. However, we found General Farman in the Bunkder-an obvious prime target looking ashen-faced and completely broken. Staring into space, he gave the impression of having given up everything. He informed me that he was authorized to speak for the whole Pakistan Army in East Pakistan and that they had agreed to accept the Indian ultimatum. He also confirmed that as their Communication Centre had been destroyed they had not been able to infrom the Indian Army of their acceptance of the ultimatum.

I asked General Farman whether, purely as a channel of communications, he wished me to convey by the UN radio network the acceptance by the Pakistan Army of the Indian ultimatum. General Farman replied in the affirmative, so I led him outside the bunkder in order to enable my handset radio to work and contacted Paul-Mare Nenry at the UN location. I then gave the message in General Farman's presence to Paul-Marc Henry, and General Farman added two further points : First, to request the Indian Army for a six hour extension to the truce because of the breakdown in the Pakistan Army' communications, second, to invite the Indian Army to send party of staff officers to discuss further arrangements, if possible by helicopter to Dacca Airport, where they would have

safe conduct and proper courtesies. I duly passed the whole message by my radio to Paul-Mare Henry who in turn had it transmitted immediately to New Delhi. The time was 0920 hours.

Colonel Gaffur, Mr. Lampell and myself then left the bunker area, with the Indian Air Force still circling overhead. However, the message got through to the Indian Command in time, and the threatened onslaught on Dacca did not take place.

Dacca : 8 March 1972.

পৃঃ ৬৪৯-৬৫৫।

২৬শে মার্চ বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্ম- প্রকাশ করে। স্বাধীনতা ঘোষণার অপরাধে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাংলাদেশে পৃথিবীর ইতিহাসে নগ্নতম গণহত্যা সর্বপ্রকার অত্যাচার নিপীড়ন আরম্ভ করতঃ ফেব্রুয়ারি জাতিকে নিঃশেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই অসহনীয় অবস্থায় ফেব্রুয়ারি জাতি রুখিয়া দাঁড়ায়।

১৬ই ডিসেম্বর দ্বিগ্বিজয়ী পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় ও বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর নিকট নিঃশর্ত ভাবে আত্মসমর্পন করে। ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকীর পুস্তক হইতে প্রাপ্ত পাকিস্তান সরকারের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ছিল নিবরূপ (East Pakistan ঃ The Endgame, P.209) :

“16 December dawned on a doleful, funereal note for Pakistan. Foreign networks, mainly the BBC , the villain of the piece, had even announced the details of the surrender parade scheduled for that afternoon .Communication between the GHQ and the Eastern Command, extremely erratic since 11 December , had been totally cut off. No one knew as to when, how and who, might have accepted unconditional surrender.

Until about 4 p.m. on 16 December, we were still at sixes and sevens about the accuracy of the news and how to break it officially. Gul Hassan was not available, so I contacted Major General

Shaukat Riza, deputy chief of the general staff. 'We must catch the 5 p.m. news bulletin', I urged. Shaukat agreed , suggesting that we should go to the information secretary and seek his views.

We drove to his Chaklala office to find him and his senior officers in a huddle, looking utterly confused. He had been in constant touch with the foreign secretary, Sultan Mohammad Khan, who, in turn, had little to add to what we had all heard over the BBC. We phoned the military secretary to the president, Major General Ishaque, hoping to have a word with the president. Ishaque brusquely told us that the 'old man' had just retired to catch a wink of sleep and could not be disturbed. That left nothing for us to do, except to put our heads together, and produce a 26-word draft as follows:

Under an arrangement between the commanders of India and Pakistan in the eastern theatre, Indian troops have entered Dhaka and fighting has ceased in East Pakistan.

So that was the end of the burlesque, which began at midnight on 25-26 March 1971, ending on the afternoon of 16 December 1971. A reprieve of full nine months- long enough to correct the course-had been cold-bloodedly cussedly wasted away."

১৬ই ডিসেম্বর ঘটনা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে কাদের সিদ্দিকী বলেন (দলিলপত্র ঃ নবম খন্ড, পৃঃ৬৪৭) ঃ

কাদের বাহিনীর গঠন ও যুদ্ধ তৎপরতা-২

॥ আমার পরিচয় পেয়ে নিয়াজী তড়াক করে দাঁড়িয়ে আমাকে স্যালুট করলো।

১৬ই ডিসেম্বর সকালে মেজর জেনারেল নাগারা ও কাদের সিদ্দিকী একটি হেলিকপ্টারে এসে সাভারগামী সড়কে মীরপুর ব্রীজের পরবর্তী ব্রীজের কাছে নামলেন। সঙ্গে রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার। বলছিলেন কাদের সিদ্দিকী ঃ ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার টঙ্গী অভিমুখে এগিয়ে যাওয়া বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছিলেন। সাভারগামী বাহিনীর অধীনায়কত্ব করছিলেন ব্রিগেডিয়ার সানত সিং। হেলিকপ্টার থেকে নেমে মেজর জেনারেল

নাগরা জেনারেল নিয়াজীর কাছে একটি চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি নিয়াজীকে লিখলেন, আমি অমুক জায়গায় রয়েছি। তুমি আত্মসমর্পণ করবে কিনা জানাও এবং উত্তর দাও। ভারতীয় বাহিনীর একজন মেজরকে বাহক করে চিঠি পাঠান হলো। তার সাথে রয়েছে ভারতীয় বাহিনীর তিনজন জওয়ান ও পথ চেনাবার জন্যে একজন মুক্তিযোদ্ধা। দু'টি জীপ তাদের নিয়ে চলে গেলো। জীপের সম্মুখে সাদা পতাকা। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। নিয়াজী চিঠি পেয়ে জানাল যে, সে আত্মসমর্পন করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোন লিখিত ভাষ্য সে ছিল না। পাক বাহিনীর মেজর জেনারেল জামশেদকে পাঠিয়ে দিল। জমাশেদ এসে মেজর জেনারেল নাগরাকে স্যালুট করল। তখন নাগরা বললেন-শুনো সিদ্দিকী, হামকো স্যালুট করেগো তো হাম লেগা আউর তুম লেগা। হামলোগদো এক সাথ আয়া হ্যায়।' জামশেদ এসে তার নিজের রিভলভার ও মাথার ফৌজি টুপি তুলে দিল বাহিনীর সম্মিলিত কাছে আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে। রিভলভারটি গ্রহণ করলেন মেজর জেনারেল নাগরা এবং টুপি তুলে দেয়া হলো আমার হাতে। জেনারেল নাগরা তখন আমাকে বললেন, আরে সিদ্দিকী, ক্যামেরাম্যান হ্যায়? ইয়েতো হিস্ট্রি বন যায়েগো। কিন্তু দুর্ভাগ্য সে সময়ে কোন ক্যামেরাম্যান সেখানে ছিল না। মেজর জেনারেল জামশেদ যখন আত্মসমর্পণ করলো, তখন সকাল দশটা।'

কাদের সিদ্দিকী বললেন, 'আমরা ঠিক করলাম যে, জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। মীরপুর ব্রীজের এপারে এলাম-জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার, ব্রিগেডিয়ার সানত সিং ও আমি। এলাম পাক বাহিনীর গাড়ীতে চেপে। রাস্তায় প্রহরারত পাক বাহিনী আমাদের স্যালুট ঠুকছে। আমাদের বাহিনী পড়ে রইলে পেছনে। এপারে এসে এক জায়গায় টেলিফোন করতে গিয়ে দেখি কোন শব্দ নেই। টেলিফোন ডেড। লাইন কাট-আপ। এলাম মোহাম্মদপুর। নিয়াজীকে টেলিফোন করা হলোঃ কিন্তু কোন সাড়ানেই, রিং হচ্ছে না। তখন জেনারেল নাগরা বললেন ঃ উন লোক চালাকি কিয়া। যেধার যাতাহু ওধারই লাইন নেহী হ্যায়।' তখন সকাল প্রায় সোয়া দশটা পেরিয়েছে। জেনারেল নাগরা তখন ভাবছেন যে-আমার ক্যান্টনমেন্টে যাবো কি যাবো না। যাওয়াটা কি ঠিক হবে। আমি বললাম, যখন এসেই পড়েছি তখন যাবোই। তারপর দশটা চল্লিশ মিনিটে আমরা ক্যান্টনমেন্টে নিয়াজীর দপ্তরে পৌঁছলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। নিয়াজী এসে স্যালুট করলো। নাগরা স্যালুটের জবাব দিলেন। নাগরা বসলেন। নিয়াজী নাগরা তখন

পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, ইয়ে হ্যায় ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার, ইয়ে হ্যায় ব্রিগেডিয়ার সানত সিং, আউর ইয়ে হ্যায় বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীকা কাদের সিদ্দিকী। নিয়াজী তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্যালুট করলো ....। (পৃঃ ৬৪৭-৬৪৮)।

১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠান এবং ঐদিনের প্রারম্ভ হইতে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানা যায় Lt. General JFR Jacob এর পুস্তক হইতে (Surrender of Dacca, Birth of a Nation, Page 140-147) **:**

I was met by the Chief of Staff of the Pakistani Eastern Command, Brig Baqar Siddiqui. Present also was the United Nations representative at Dacca. He had offered his good offices in negotiating with the Pakistani Army but I had no intention of involving the United Nations as I could see no role for them in this situation.

....

....

Gen Niazi received me in his office. Present at the discussions were Maj Gen Rao Farman Ali, who dealt with civil affairs, Maj Gen Jamshed, Rear Adm Shariff, the Naval Chief, Air Cmdre Imam, the Air Force Cmdre and Brig Baqar Siddiqui. Maj Gen G C Nagra, who had taken over from Gurbax Gill when he was wounded at Jamalpur, had arrived a little earlier.

....

....

I returned to Niazi's office and Col Khara read out the terms of surrender. There was dead silence in the room, as tears streamed down Niazi's cheeks. The others in the room became fidgety. They had expected the document to be on the lines of the proposals they had handed over on 14 December to Spivack, which envisioned a cease fire and evacuation under arrangements of the UN. Farman Ali objected to surrendering to the Indian and Bangladesh forces. Niazi said that what I was asking him to sign was unconditional surrender when we were drafting the instrument of surrender we had tried to word it in such a manner that it would not be offensive. .... I asked him if the document was acceptable. He handed it back to me without comment. I

took this as acceptance. We then discussed with Niazi the modalities of the surrender. ....

At around 1630 hours the Army Commander and his entourage arrived in a fleet of five Mi4 and four Alloutte helicopters. Niazi and I went to receive them. The Army Commander accompanied by Mrs. Aurora alighted. Air Marshal Dewan, Vice Adm Krishsnan, Lt Gen Sagat Singh, the Divisional Commanders of IV Corps and Wing Cmdr Khondkar also deplaned, Osmani, however, was not to be seen Niazi, Lt. Gen Aurora and Air Marshal Dewan proceeded to the car. I had planned to travel in this car but I had to make way for Mrs. Aurora, who took her place by the side of her husband. The car then drove off I hitched a ride to the Race Course. Though there had been very little time for preparation, the ceremony went off reasonably well. After Inspecting the guard of honour Aurora and Niazi proceeded to the table. The surrender documents brought with Aurora were placed on the table. Niazi glanced through them curiously and signed. Aurora signed. I took a careful look at the documents and was aghast to see the heading-which read 'Instrument of Surrender- To Be Signed at 1631 Hours 1st (Indian Standard Time)' I looked at my watch. It showed a time of 1655 hours. Niazi then undid his epaulette and removed his .38 revolver with attached lanyard and handed it over to Aurora. There were tears in his eyes. It was getting dark. The crowd on the Race Course started shouting anti Niazi and anti-Pakistani slogans and abuses. We were concerned about Niazi's safety, therebeing hardly any troops available at the Race Course. We senior officers formed a cordon around Niazi and escorted him to an Indian Army jeep. I briefed Sagat Singh regarding disarming of the Pakistanis and maintainance of law and order and the movement of the prisoners of war to India. We then returned to the Dacca airfield to take off for Agartala. While we were waiting, Rear Adm Shariff of Pakistan Navy, who had earlier obtained my permission, came to see off Adm Krishnan. The latter asked him to give him his pistol. Shariff removed it from his holster and handed it to Krishnan. We then took off by helicopter for Agartala. (Page 140-147).

....

....

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নয় মাস দখল অত্যাচার এর প্রধান হোতা সব চেয়ে ঘৃণিত যে দুইজন জেনারেল তাহার একজন হইতেছে Lt. General A.A.K. Niazi বাংলাদেশে তিনিই হানাদার বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি তাহার লিখিত 'The Betrayal of East Pakistan' পুস্তকে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর আত্মসমর্পন সম্পর্কে বলেনঃ (পৃঃ ২৩২-২৩৫) :

Surrender

General Manekshaw had informed us that an Indian team would be coming to Dhaka to finalize surrender arrangements. The helicopter hovered over Dhaka Airport, the heavy blades churning in the air like the arms of a giant windmill, and soon settled down. Major-General Jacob, Chief of Staff, Indian Eastern Command, alighted with his team from the helicopter. Brigadier Baqir Siddiqui, the Pakistani COS, after receiving them at the airport escorted them to HQ Eastern Command. The Indian team had come to discuss and negotiate the terms and conditions for the cessation of hostilities. They had brought a draft of the surrender document. The preliminary discussions between Jacob and Baqir, the two Chiefs of Staff were carried out in Baqir's office. After the presentation of the proposal, Baqir discussed the issue with me. I asked Baqir to call Generals Jamshed and Forman and Admiral Sharif, the senior Pakistani Army and Naval officers present at Headquarters. The Indian delegation blackmailed us with the threat that, if their conditions were not agreed to, they would hand over the local loyal population, and our civilian officers who had taken refuge in the Intercontinental Hotel, to the Mukti Bahini forces, who would massacre them. Despite our objections to the use of the phrase 'Joint Command of India and Bangladesh', and to the place and manner of surrender, in the circumstances we were forced to comply.

Among the Generals, Farman's demeanour underwent a dramatic change. The guilt and weakness he had displyed during the hours of crisis seemed to disperse. The despair and anguish visible in his eyes and actions dissipated. His having been a Military Adviser to five Governors, coupled with his participation in the drastic military action on 25 March, had aroused the animosity and seething anger of the Bengalis, who wanted to punish him for his alleged crimes against them. He was blamed for the massacre of intellectuals although here too the case has been a little overstated because some of the Bengalis named therein are still alive. Thus encased in a cocoon of fear, he wanted to escape. The Bengalis had vowed vengeance at any price.

After some discussion, the senior Pakistani officers agreed to accept the Indian proposal, so I called the Indian team to my office..................................

....

The surrender ceremony took place on 16 December, 1971. Major-General Farman and Admiral Sharif witnessed the ceremony. As I signed the document with trembling hands, sorrow rose from my heart to my eyes, brimming them with unshed tears of despair and frustration. Before the ceremony, a French reporter came to me and said, 'How are you feeling, Tiger?' I replied, 'Depressed.'

....

......এই ঘটনা বিশ্বখ্যাত একটি নাটকের কথা আমাদের মনে করাইয়া দেয় ঃ

"But man, proud man,

Drest in a little brief authority,

Most ignorant of what he's most assured.

His glassy essence, like an angry ape,

Plays such fantastic tricks before high heaven

As make the angels weep"

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে রমনা রেসকোর্স ময়দানে উপরোক্তভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ দলিলটি নিম্নরূপ (Bangladesh Documents, Vol. II, UPL, P-550):

INSTRUMENT OF SURRENDER

December 16, 1971.

The Pakistan Eastern Command agree to surrender all Pakistan Armed Forces in Bangla Desh to Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora, General Officer Commanding in Chief of the Indian and Bangla Desh forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all Pakistan land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently

located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora.

The Pakistan Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with in accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisiosns of the Geneva Convention and guarantees the safety and well-being of all Pakistan military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistan origin by the forces under the command of Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora.

(Sd.) JAGJIT SINGH	(Sd.) A.A.K. NIAZI
(Jagjit Singh Aurora)	(Amir Abdullah Khan Niazi)
Lieutenant-General	Lieutenant-General
General Officer Commanding In Chief	Martial Law Administrator Zone B
Indian and Bangla Desh Forces in	and Commander
The Eastern Theatre	Eastern Command (Pakistan)
16th December,1971.	16th December,1971

এইভাবেই বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজ বিজয় ছিনাইয়া আনে এবং আমরা বাঙালিরা শত বেদনার মধ্যেও স্বাধীনভাবে সম্ভবত ইতিহাসে প্রথম বারের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি।

এই রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশকে সৈয়দ শামসুল হক যখন অভিবাদন জানান তখন তিনি বাঙালিদেরই হৃদয়ের কথা বলেন ঃ

"তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,

তুমি ফিরে এসেছ তোমার মানচিত্রের ভেতরে

যার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তেরশ নদীর ধারা;

তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,

তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে

যার আলোয় এখন রঞ্জিত হয়ে উঠেছে সাহসী বদ্বীপ;

তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,

------------------------------------"

১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখের ভাষণ ঃ

অতঃপর, ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারী তারিখে প্রদত্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ।

গ্রেট ব্রিটেনের রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটি কমেট বিমান ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারী দ্বিপ্রহরে ঢাকা শহরের আকাশে প্রায় ৪৫ মিনিট যাবত চক্রাকারে ঘুরিয়া বিমান বন্দরে অবতরন করে। বিমান বন্দরে অগনিত মানুষের ঢল। সকলে অধির আগ্রহে উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমান। অবশেষে বিমান হইতে অবতরণ করিলেন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তেজগাঁও বিমান বন্দর হইতে রমনা রেসকোর্স পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার পথ পৌঁছাইতে দুই ঘন্টা সময় লাগিয়াছিল। রেসকোর্স ময়দানে তিনি এক ভাষণ প্রদান করেন। সেই দিনকার ঘটনাবলী সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলি বিশদ বিবরণ প্রদান করে।

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চের দিবাগত রাত্রে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করিয়া ক্যান্টনমেন্টে লইয়া যায়। গ্রেফতারের কিছু পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন । ২৬শে মার্চ তারিখে BBC নিম্নলিখিত সংবাদ প্রচার করে (দলিলপত্র ঃ চতুর্দশ খন্ড, পৃ ঃ ৪৫১) ঃ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৭। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর বি বি সি, প্রচারিত সংবাদ।	বি বি সি, লন্ডন	২৬ মার্চ-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

26.3.71 A.43 2200 PAKISTAN-ONE

Extensive fighting is reported from East Pakistan following moves by President Yahya Khan to restore his government's authority and reports from India that Sheikh Mujib-ur-Rahman has declared the province independent. The American Consul-General in Dacca, the eastern capital, said that tanks were being used to put down disturbances there. Earlier reports from India-some quoting a clandestine radio in East Pakistan said fierce fighting had broken out in many places. East Bengali army units were said to have joined police and armed civilians in clashed with army units from West Pakistan. There have been no reports direct from East Pakistan.

President Yahya Khan announed his moves in a strongly worded broadcast in which he accused Sheikh Mujib of treason, and banned his majority party in the Awami League which had virtually taken control of East Pakistan. He also announced a ban on allpolitical activity in Pakistan and complete censorship of the press.

Para One : RW 2100 (When US new)
fighting detail from 2030;
Yahya snaps from 1520; Ind. from1650.

তিন দিনের মধ্যে তাঁহাকে করাচী লইয়া যাওয়া হয়। ইতিমধ্যে ২৬শে মার্চ সন্ধায় জেনারেল ইয়াহিয়া করাচী হইতে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করেন এবং আওয়ামী লীগকে চিরতরে বেআইনী ঘোষণা করেন।

শেখ মুজিব জনগণের একজন সহজাত নেতা ছিলেন। কলিকাতাস্থ ইসলামিয়া কলেজে পড়াশুনা কালেই তিনি ছাত্র রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং মুসলিম ছাত্র লীগের একজন সক্রিয় নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ সনে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হইলে শেখ মুজিব ইহার অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সনের ২৩শে জুন এক সভায় পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী সর্ব প্রথম তাঁহার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়। ২য় গণপরিষদে নির্বাচিত হইবার পর প্রতিটি অধিবেশনে তিনি অন্যান্য দাবীর সহিত পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্ব শাসন, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি, প্রস্তাবিত East Pakistan নামের পরিবর্তে এই প্রদেশের নাম Bengal নাম করণের জন্য জোর দাবী জানাইতে থাকেন ঃ

> " Sir, you will see that they want to place the words "East Pakistan" instead of "East Bengal". We have demanded so many times that you should make it Bengal (Pakistan). The word "Bengal" has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted................" (অধোরেখা প্রদত্ত)
>
> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৩১)

১৯৫৫ সনের ২২শে অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ অধিবেশনেই 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' এর নাম হইতে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়া জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উক্ত দল অবারিত করা হয়।

১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে মার্শাল ল জারী করা হইলে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের শত শত নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করিয়া অকথ্য নির্যাতন চালান হয়।

১৯৬৪ সনে তিনি আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ১৬ই জুলাই পল্টন ময়দানে তিনি একটি অসাধারণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি মর্মস্পর্শি ভাষায় বক্তৃতার প্রারম্ভে বলেনঃ

> "সোনার বাংলার ভাইয়েরা আমার! স্বাধীনতার ১৭ বছর পরে আবার জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নামতে হবে- ১৭ বছর পরে আবার ভোটের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে- ১৭ বছর পরে আবার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে হবে- একথা কোন দিন ভাবিনি। নিজ দেশে নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধেও ব্রিটিশ আমলের মত জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে ভাবলে মন আমার শিউরে ওঠে।"

তিনি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন এই ভাবে ঃ

"ভাইসব, কাল আমার দেশদ্রোহিতার মামলার দিন। আসামীর কাঠ গড়ায় গিয়ে দাঁড়াবার পূর্ব মুহুর্তে পল্টনের এই জনসমুদ্রের মাঝে যে আশা- ভরসা আর দুর্দমনীয় প্রাণাবেগের বহিঃ প্রকাশ দেখে গেলাম, তাই আমাদের আগামী দিনের একমাত্র সম্বল, একমাত্র পাথেয়। এই পাথেয় যাদের আছে কোন শক্তিই তাদের গতিরোধ করতে পারবে না। জনগণের প্রাণবহ্নির সম্মুখে নমরুদ- ফেরাউন যখন টেকে নাই, তখন লক্ষকোটি নিরন্ন বুভুক্ষুর ক্রোধানলের সম্মুখে এদেশের ক্ষমতাসীনরাও টিকবে না।"

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ন স্বায়ত্ত্ব শাসন দাবী সম্বলিত ৬ দফা কর্মসূচী শেখ মুজিব ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলন যেমন ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সোপান, তেমনি ৬ দফা কর্মসূচী ছিল ইহার দ্বিতীয় সোপান। কিন্তু আইয়ুব খান ৬ দফা দাবীর জবাব অস্ত্রের ভাষায় দিবার ঘোষণা দেন। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলার পর মামলা দায়ের হইতে থাকে এবং তিনি প্রায় প্রতিটি জেলায় ক্রমাগত গ্রেফতার হইতে থাকেন। অতপরঃ তাহার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় যাহার বিবরণ উপরে প্রদান করা হইয়াছে।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ তারিখে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের নাম 'বাংলাদেশ' নামকরণ করেন।

৬ই ডিসেম্বরের দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ

অতঃপর, এ প্রদেশের নাম হইবে

'বাংলা দেশ'

"আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (শুক্রবার) ঢাকায় ঘোষনা করেন যে, এখন হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু মাত্র 'বাংলা দেশ'।

ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার মাজার প্রাঙ্গণে সোহরাওয়ার্দী স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে শেখ সাহেব বলেন, এক সময় এ দেশের বুক হইতে মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি বলেন,

একমাত্র "বঙ্গোপসাগর" , ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বাংলা

ও বাঙ্গালীর অবিসংবাদিত গণনায়ক শহীদ সোহরাওর্দী ও শেরে বাংলার প্রতি ও অমার্জনীয় অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। বক্তৃতা মঞ্চের অনতিদূরে চিরনিদ্রায় শায়িত নেতৃদ্বয়ের মাজারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শেখ মুজিব বলেন, বাংলার এই দুই কৃতী সন্তান আজ অসহায়ের মত আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। এই দুই নেতার মাজারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষনা করিতেছি-আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলা দেশ'।

সমবেত শ্রোতৃমন্ডলী বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনি সহকারে নেতার এই ঘোষণার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।"

১৯৭১ সনে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল শেখ মুজিবকে তাঁহার বাস ভবন হইতে গ্রেফতার করে। তৎপর তাঁহাকে করাচী প্রেরণ করা হয় এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার আরম্ভ করা হয়। শেখ মুজিব প্রতিবাদে তাঁহার পক্ষে আইনজীবি নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করেন।

ইহারই ধারাবাহিকতায় ৩রা অগাস্ট, ১৯৭১, তারিখে Pakistan Television Corporation এ প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন :

"President Agha Mohammad Yahya Khan has said that Sheikh Mujibur Rahman, leader of the defunct Awami League, would be put on trial.

He said Sheikh Mujib was arrested for committing acts of treason and he would be dealt with under the law of the land.

....

............The President, who was asked what would be the fate of Sheikh Mujibur Rahman, said that the leader of the defunct Awami League had deviated from his electoral campaign in which he demanded autonomy for East Pakistan.

President Yahya said that after Sheikh Mujib got the mandate, he and a coterie of his people deviated from that aim and wanted secession. In other words, he said Sheikh Mujibur Rahman had committed "acts of treason, acts of open rebellion" and incited armed rebellion against the State."

....

"How would you treat your criminal", he posed a question to the foreign news media representatives present at the interview.

(The DAWN, Karachi-August 5, 1971

(Bangladesh Document, Vo.II UPL Page 21).

(অধোরেখা প্রদত্ত)

এই পটভূমিকায় ইন্দিরা গান্ধী ৮ই অগাস্ট তারিখে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র প্রধানের নিকট নিম্নলিখিত আবেদন জানান ঃ

MESSAGE FROM PRIME MINISTER INDIRA GANDHI TO HEADS OF GOVERNMENTS

August 8, 1971.

Government and people of India, as well as our Press and Parliament, are greatly perturbed by the reported statement of President Yahya Khan that he is going to start secret military trial of Sheikh Mujibur Rahman without affording him any foreign legal assistance. We apprehend that this so-called trial will be used only as a cover to execute Sheikh Mujibur Rahman. This will aggravate the situation in East Bengal and will create a serious situation in India because of the strong feelings of our people and all political parties. Hence our grave anxiety. We appeal to you to exercise your influence with President Yahya Khan to take a realistic view in the larger interest of the peace and stability of this region.

(Bangladesh Documents, Vol. II , UPL Page 28).

(অধোরেখা প্রদত্ত)

একই প্রসঙ্গে ৯ই অগাস্ট ভারতীয় বৈদেশিক মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ ঃ

“ Government view with grave concern press reports of President Yahya Khan’s statement that Sheikh Mujibur Rahman would be “court martialled”, and that he could not say whether or not the Sheikh would be alive when the so-called Pakistan National Assembly meets. President Yahya Khan himself had, in one of his earlier statements, referred to Sheikh Mujibur Rahman as “the future Prime Minister of Pakistan”. As the leader of the Awami League Party which won 167 of the 169 seats to the National Assembly from Bangla Desh and thus had a clear majority of votes in the National Assembly of Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman held a unique position as the acknowledged leader not only of East Pakistan, but of the whole of Pakistan. What happened after the 25th of March this year is known to the whole world. The denial of the verdict of the people and letting loose of military oppression and trampling of the fundamental human rights of the people of Bangla Desh stand self-condemned. Instead of respecting the verdict of the

people and acknowledging Sheikh Mujibur Rahman as the elected and undisputed leader of Bangla Desh, the Pakistan Government has launched a reign of terror and carried out a calculated plan of genocide, the like of which has not been seen in recent times. To stage a farcical trial against Sheikh Mujibur Rahman is a gross violation of human rights and deserves to be condemned by the whole world."

(Bangladesh Documents Vol. II, Page 28-29)

ঐ একই ৯ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তান সরকার নিম্নলিখিত একটি প্রেস রিলিজ প্রদান করে ঃ

Trial For " Waging War Against Pakistan"

Official Press Note

August 9, 1971.

" Sheikh Mujibur Rahman, President of the defunct Awami League, will be tried by a Special Military Court for "waging war against Pakistan"and other offences, a Press Note issued by the Headquarters of the Chief Martial Law Administrator said to day (August 9).

The trial will commence on August 11 in camera and its proceedings will be secret, the Press Note said.

(**THE DAWN**, Karachi- August,10,1971)
(Bangladesh Documents, Vol.II, UPL Page 21-22).

(অধোরেখা প্রদত্ত)

ইতিমধ্যে জাতিসংঘের মহাসচিবসহ সমগ্র বিশ্ব সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের গোপন বিচার অনুষ্ঠানের নিন্দা জানাইতে থাকে। জাতি- সংঘের মহাসচিব এ সম্পর্কে ১০ই আগস্ট একটি নোট্ পাকিস্তান সরকারকে প্রদান করেন।

১৫ই আগস্ট ১৯৭১ তারিখের LA NACION, বুয়েন্স এয়ার্স এক প্রতিবেদনে লেখে ঃ

"The Secretary General of the United Nations, U-Thant, has warned that the secret trial for treason against Mujibur Rahman, absolute leader of East Pakistan can lead towards more serious consequences than the hurricane which devasted East Bengal last November and the subsequent cholera epidemic.

International observers agree with U-Thant. The 98 per cent gained by the Awami League in the last elections is an element they have taken into consideration to make their comments.

.... In the meantime, Yahya Khan's administration refuses to reveal even the place where Rahman is being sued. Their information only says that the trial is taking place "in some place in Pakistan". (অধোরেখা প্রদত্ত)

(Bangladesh Documents, Vol.II, UPL Page 34).

জেনেভাস্থ International Commission of Jurists ১৭ই অগাস্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট নিবলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন ঃ

" President Yahya Khan,
President's House
Rawalpindi.

World opinion is most apprehensive that military tribunal will sentence Sheikh Mujibur Rahman to death. Should this happen, International Commission of Jurists respectfully urges your Excellency to show clemency, strength and wisdom by commuting sentence to prevent further escalations of violence, terror and suffering.

MACDERMOT.
Secretary-General

(অধোরেখা প্রদত্ত)

(Bangladesh Documents, Vol.II, UPL Page 29-30).

হেলসিংকিস্থ World Peace Council সচিবালয় ২০শে অগাস্ট নিবলিখিত বক্তব্য প্রদান করে ঃ

Appeal by the Secretariat, World Peace Council, Helsinki, to the Government of Pakistan.

In complete defiance of all norms of human behaviour, and in utter disregard of world-wide public opinion, the Government of Yahya Khan in Pakistan is putting to trial Sheikh Mujibur Rahman, the chosen leader of the people of East Pakistan (Bangla Desh). The trial is being held secretly, and no one knows what is being perpetrated by the militarist rulers of Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman allegedly is being tried for "waging war against Pakistan". This, in fact, is a terminology taken over from British imperialist rulers of India in the old colonial days when hundreds of Indian patriots and freedom-fighters were tried, but not in secret, for "waging war against the King-Emperor," and hanged.

In this, as in all their other actions of massacre and pillage, the Yahya Khan dictatorship has revealed itself to the world as imitators of imperialists and autocrats who have nothing but contempt for the people. The only fault of Sheikh

Mujibur Rahman, who also fought against British alien rulers of India while Yahya Khan and his henchmen were loyally serving the British masters, is that the people of Bangla Desh gave his party 167 seats out of 169 in the first –ever general election held in Pakistan.

(অধোরেখা প্রদত্ত)

(Bangladesh Documents, Vol.II, UPL Page 3o).

বনস্থ Der Spiegel ইহার ৩০শে অগাস্টের প্রতিবেদনে শেখ মুজিবের গোপন বিচার সম্বন্ধে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শফিকে উদ্ধৃতি করিয়া বলে ঃ

A West-Pakistani military tribunal is deciding secretly the fate of the political leader of East Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman, Judge Shafi knows it already;: "Of course he shall be sentenced to death."

....

Pakistan's Head of State, Yahya Khan, anticipated the Judgment. When a representative of the World Bank, Mr. Cargill, requested for a reprieve, the General declaimed: " This person is guilty of high treason, he should come to the gallows. (আধোরেখা প্রদত্ত)

(Bangladesh Documents, Vol. II, UPL P-35)

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আগাশাহী ৩১ অগাস্ট নিউইয়র্কে সাংবাদিকগণকে বলেন ঃ

"Questioned about the trial of Sheikh Mujibur Rahman, leader of the Awami League in East Pakisntan, Mr. Shahi said his trial started August 11 and should be over in another two weeks.

He said Sheikh Mujib had been charged with waging war against the State and incitement to rebellion and violence."

(অধোরেখা প্রদত্ত)

(Bangladesh Documents, Vol.II, UPL Page 23).

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখের The Guardian, London পত্রিকায় নিবলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ

"Mr. Bottomley, Britain's former Secretary of State for the Commonwealth, urged Governments to put pressure on Pakistan to release Sheikh Mujibur Rahman when a conference of the Commonwealth Parliamentary Association opened here today (Kuala Lampur, Septempber 13).

He said Sheikh Mujib was the only person who could speak for the people of East Pakistan. He also gave a warning that there would soon be a famine there in which hundreds of thousands would die.” (অধোরেখা প্রদত্ত)

(Bangladesh Documents, Vol.II , UPL Page 31-32).

দিল্লিতে ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, তারিখে বাংলাদেশের উপর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাস হয় ঃ

“ The International Conference on Bangla Desh at its meeting today (September 18, 1971) in New Delhi :-

Condemns the trial in secret by a Pakistan Military Tribunal of Sheikh Mujibur Rahman, the beloved and undisputed leader of Bangladesh Desh and the embodiment of the aspirations of its people, on charges of “treason” for leading his party, the Awami League, to overwhelming victory in the first ever General Elections held in Pakistan in December 1970;

Appeals to the world public opinion and governments to bring pressure on the military Government of Pakistan to desist from this grave violation of all canons and laws governing civil liberties and human freedom recognised in all civilised communities; and

Urges the immediate and unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman and other democratically elected representatives of Bangla Desh.”

(অধোরেখা প্রদত্ত)

(Bangladesh Documents, Vol.II, UPL Page 32).

২৯শে অক্টোবর ১৯৭১ তারিখের The Times of India পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঃ

“ The Austrian Chancellor, Dr. Bruno Kreisky, has deplored the detention of Sheikh Mujibur Rahman by the West Pakistan military junta and said that “no democratic party in Europe will tolerate it.”

....

....

(Bangladesh Documents, Vol.II, UPL Page 33).

বিশেষ জেলে শেখ মুজিবকে কোন রেডিও বা সংবাদপত্র দেওয়া হইত না। তাঁহার দীর্ঘ ৯ মাস কারাবন্দী জীবনে বাংলাদেশে বা বহির্বিশ্বে কি ঘটিতেছে তাহার কিছুই তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের পর

জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁহাকে ফাঁসি দিতে চাহিয়াছিলেন এবং এক পর্যায়ে জেলখানায় তাঁহার সেলের পার্শে তাঁহার দৃষ্টি গোচরের মধ্যে কবরও খোঁড়া হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্টের পদ হইতে পদত্যাগ করায় তাহা কার্যকর করা যায় নাই। তাহার পরেও তাঁহাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল কিন্তু জেইলর ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজের বাসভবনে তাঁহাকে স্হানান্তর করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করে।

পাকিস্তান হইতে মুক্তির পূর্বে একটি confederation আকারে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র একত্র রাখিয়া তাঁহাকে প্রেসিডেন্ট পদে থাকিবার জন্যও প্রচন্ড চাপে রাখা হয়। সেই সময় যদিও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন, বিশ্ব পরিস্হিতি, এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না তবুও তিনি বন্দীদশায় সর্ব প্রকার মানসিক চাপের মুখেও নত হন নাই এবং ভুট্টোর কোন প্রস্তাবই তিনি গ্রহণ করেন নাই।

১৯৭২ সনের ৮ই জানুয়ারি তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া লন্ডন প্রেরণ করা হয়। যদিও যুক্তরাজ্য তখনও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করে নাই তবুও যুক্তরাজ্য সরকার তাঁহাকে রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদা প্রদান করে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এড্ওয়ার্ড হীথ তাঁহার আগমনের খবর প্রাপ্ত হইয়া দ্রুত লন্ডনে ফিরিয়া আসেন এবং ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীট্ এর বাসভবনে তাঁহাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিরোধী দলীয় নেতা হ্যারল্ড উইলসন হোটেলে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুক্তরাজ্য সরকার রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানযোগে তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে তাঁহাকে প্রথমে দিল্লী তৎপর ঢাকায় পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করেন।

১০ই জানুয়ারী সকাল বেলায় তিনি দিল্লী পালাম বিমান বন্দরে পৌছাইলে ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহাকে স্বাগত জানান। দিল্লী বিমান বন্দরে শেখ মুজিবকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা প্রদান করা হইয়াছিল তাহার কিছুটা বিবরণ ১১ই জানুয়ারীর The Indian Express পত্রিকা হইতে পাওয়া (Bangladesh Documents Vol. II UPL, Page 604) :

A WELCOME DELHI WILL REMEMBER

Sheikh Mujibur Rahman, President of Bangladesh, was given a joyous welcome when he arrived in the Capital (New Delhi) today (January 10) on his way to Dacca.

The Sheikh, looking slightly weary after his journey from Nicosia, was greeted with full-throated cries of “Sheikh Mujibur Rahman Zindabad” and “Long live Mujib” as he climbed down the steps from the RAF aircraft which brought him here (New Delhi).

As the Royal Air Force Comet, gleaming in the morning sun, glided on the tarmac at the Technical Area of Delhi Airport, an air of hushed expectancy descended upon the place.

For four long minutes, between the time the Comet came to a stop and the moment when the Sheikh set his foot on Indian soil, craning heads in colourful shamianas waited impatiently to see the figure who had swept himself into the hearts of the people. Chairs in enclosures were forgotten, only to be remembered later when VIPs realised that standing on them would give a better view.

The Bangaldesh Foreign Minister, Mr. Abdus Samad, entered the plane and remained inside for a few minutes.

The moment came. And the Sheikh, clad in a dark grey suit and black overcoat, climbed down the steps from the aircraft. The cold morning breeze ruffled his hair as he waved his hands to acknowledge the strident cheers which greeted him. A 21-gun salute boomed as the Sheikh was hugged by the President, Mr. V.V. Giri, and warmly welcomed by the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi.

A battery of photographers, drating from place to place to get a good picture, clicked their cameras incessantly as the Sheikh greeted Ministeres and other VIPs.

After the initial exchange of greetigns, Sheikh Mujibur Rahman inspected a gurard of honour presented to him by the three services before moving to the VIP pandal where he was showered with Marigold petals.

The national anthem of Bangla Desh, “Amar Sonar Bangla,” was played the moment the Sheikh took position on the saluting base. It was followed by the Indian national anthem “Jana Gana Mana.” The flages of the two countries flanking the pandal fluttered in the air.

The Sheikh was then intorduced to a large number of members from the diplomatic corps, Exuding a quiet charming simplicity, he mixed easily with the diplomats and stopped every now and then to talk to some of them.

In the enclousers, there was total confusion as people hopped from chair to chair to get a glimpse of the Sheikh. And every now and then, a single, piercing cry of “Sheikh Mujib Zindabad” rent the air as a spectator, overcome with emotion, screamed his adoration for the father figure of Bangla Desh.

At the Parade Ground of Delhi Cantonment, where the Sheikh addressed a public meeting, people milled around to get a better look of him. And when he entered the six-door Mercedes Benz which was to take him to Rashtrapati Bhavan, wild crowds almost surrounded the car in a vain attempt to shake his hand.

Earlier, overnight, Delhi had prepared a gay welcome for Sheikh Mujibur Rahman. Floral arches were set up on roads at several places from the Parade Ground to Rashtrapati Bhavan. Banners reading “Long live the Creator of Bangla Desh” and “Long live the Liberator of Bangla Desh” were also flying.

The arches were decorated with potted plants in flower pots and with portraits of the Sheikh. And on the side of the road, some iron frames covered with leaves had also been erected.

A large number of people lined the route from Parade Ground to Rashtrapati Bhavan in spite of the bitter cold. And as the motorcade cruised towards Rashtrapati Bhavan, persons from all walks of life cheered the Bangla Desh leader.

(THE INDIAN EXPRESS, New Delhi—January 11,1972)

দিল্লী বিমান বন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে স্বাগত জানাইয়া বলেন

(Bangladesh Documents Vol.II, UPL P.605) :

PRESIDENT V.V. GIRI’S SPEECH WELCOMING SHEIKH MUJIBUR RAHMAN AT PALAM AIRPORT, NEW DELHI
January 10, 1972

It gives me great joy and pleasure to welcome Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahamn to our country. This is an event whcih my government and the people of India have looked forward to.

You are the embodiment of the undying spirit of suffering and sacrifice in the cause of human liberty and human freedom. The emergence of independent Bangla Desh is itself a unique event in the annals of democratic movements in world history. Your have truly been acclaimed the Father of the new Nation, Bangla Desh. The trust and devotion of the 75 million people of Bangla Desh reposed in you, have led to the birth of Sonar Bangla, and we have no doubt that it will come to occupy a pride of place in the comity of nations.

শেখ মুজিব তাঁহার প্রতিউত্তরে ভারত সরকার ও ভারত বাসীকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন (Bangladesh Documents Vol.II, UPL P.605) :

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN'S SPEECH IN REPLY TO PRESIDENT GIRI'S ADDRESS OF WELCOME
January 10, 1972

For me, this is a most gratifying moment. I have decided to stop over in this hostoric Capital of your great country on my way back to Bangla Desh. For this is the least I can do to pay personal triute to the best friends of my people, the people of India and this Government under the leadership of your magnificent Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. (Cheers). She is not only a leader of men, but also of mankind.

You all have worked so untiringly and sacrificed so gallantly in making this journey possible—this journey from darkness to light; from captivity to freedom; from desolation to hope.

I am at last going back to Sonar Bangla, the land of my dreams, after a period of nine months. In these nine months, my people have traversed centurices.

When I was taken away from my people, they wept. When I was held in captivity, they fought. And now that I go back to them, they are victorious.

I go back to join my people in the tremendous tasks that now lie ahead in turning victory into a road of peace, progress and prosperity. I go back not with any hatred in my heart for anyone, but with the satisfaction that truth has at last triumphed over

falsehood, sanity over instanity, courage over cowardice, justice over injustice, good over evil. Joi Bangla, Jai Hind.

অতঃপর, শেখ মুজিব নয়াদিল্লীতে বিশাল এক জনসমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন **(Bangladesh Documents Vol.II, UPL P.606) :**

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT PUBLIC MEETING AT NEW DELHI TO WELCOME SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
January 10, 1972

Wecoming the President of Bangla Desh, Mrs. Indira Gandhi said that Sheikh Mujibur Rahman had promised freedom to his people and given it to them. India had taken a pledge to free Bangla Desh, free Mujib and finally send the refugees to their homes and hearths. "We have also kept our promise", she added.

Mrs. Gandhi said now that the Bangabandhu was returning home, it was her firm belief that secularism and democracy will prosper under his guidance. She added, even when Mujibur Rahman was in a Pakistani jail, the young men of Bangla Desh were drawing inspiration from him to fight the military regime of Pakistan. It was due to his insspiration that people of Bangla Desh were able to fight so gallantly.

The Prime Minister said it was a red-letter day in the history of Bangla Desh. The Sheikh was returning to his country, his people and his family, and, at home a great challenge awaits him –the reconstruction of Bangla Desh.

Mrs. Gandhi spoke briefly as she did not want to stand between the Sheikh and the large number of people who had gathered at the Parade Ground to hear him.

(THE INDIAN EXPRESS, New Delhi—January, 11, 1972)

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN'S SPEECH AT PUBLIC MEETING, NEW DELHI
January 10, 1972

In a voice charged with emotion, Sheikh Mujibur Rahman told the huge gathering "Bangla Desh and its people will never forget your Prime Minister, your Government and your brave armed forces and your common people who have extended all sympathies and support to their sufferings and struggle".

The Sheikh, dressed in a grey suit and a dark brown overcoat, drove to the grounds accompanied by the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, immediately after he was accorded a ceremonial reception at Delhi Airport.

Speaking in Bengali, the Bangabandhu said never in the history of man had such brutalities been perpetrated as the Pakistanis had done in Bangla Desh.

He said that he believed in the ideals of secularism, demoracy, freedom of man and peace in the world.

As he was overwhelmed by emotion, the Bangabandhu said he could not help this for he never knew that he would live to go back to his "Sonar Bangla".

The Pakistan army had killed one million people of Bangla Desh India had looked after ten million people who had been forced out of Bangla Desh.

His first words of address were: "Shrimati Indira Gandhi, ladies and gentlemen present".

Wave after wave of applause greeted the Bangabandhu as he rose to address the mammoth gathering.

He said that he was returning to his people, a free but sad people. He had lost a large number of his friends, who had been slaughtered by the Pakistani army, whose homes had been burnt and their honour taken away.

He repeatedly spoke of the unity of feelings between the people of Bangla Desh and of India, in their ideals and beliefs. He hoped that his country. Sonar Bangla, would prosper amid undying friendship betwen the two countries.

He said India had fed 10 million people of Bangla Desh despite its own problems. "I know this".

Till two days ago, he was a prisoner and did not know whether he would be free and be able to go back to Bangla Desh and see his people and "fulfil my hope". Sheikh Mujib said great tasks lay ahead of him on his return to Bangla Desh. He said he could never forged the help given by the Indian armed forces for the liberation of Bangla Desh. Never before in the history of freedom

struggles had any nation paid so colossal a price for freedom as the people of Bangla Desh had done.

He ended his speech with a shout of “Jai Hind”. Mrs. Gandhi then joined him by hailing “Jai Bangla”.

(U.N.I.—January 10, 1972.”

১০ই জানুয়ারীর দ্বিপ্রহর পৌনে দুইটার সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য লক্ষাধিক জনতা সকাল হইতেই সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। The New York Times এর রিপোর্ট নিবরূপ Bangladesh Documents II, UPL Page 611-613) :

SHEIKH MUJIB HOME: 500,000 GIVE HIM ROUSING WELCOME

DACCA, BANGLA DESH January 10 –Sheikh Mujibur Rahman received a tumultuous, triumphant welcome today from a crowd of half a million Bengalis as he returned to his native land for the first time since he was arrested nine months ago.

The exultant crowd showered Sheikh Mjjib with flowers and chanted “Joi Bangla !” (“Victory for Bengal!”) as their leader stepped from the British Royal Air Force Comet jet that had brought him from New Delhi.

Sheikh Mujib, looking tired but elated by this reception, later said at an enormous rally at the Dacca Race Course. “My life’s goal has been fulfilled. My Bengal is independent”. His voice broke with emotion.

Despite an appeal by West Pakistan to retrain some ties, he said, “the unity of the country is ended”.

He greets diplomats

Wiping flower petals from his head, Sheikh Mujib inspected an honor guard of the army, navy and air force of Bangla Desh, the nation proclaimed by his followers in East Pakistan last month after India helped them wrest the region from Pakistan.

Sheikh Mujib greeted the members of the Dacca displomatic corps, though only India and Bhutan have recognized Bangla Desh and have official Representatives here.

The American Consul-General, Herbert D. Spivack, bowed sightly as he shook hands with the Bengali leader, saying. "Welcome back to Dacca" Sheikh Mujib smiled broadly and replied, "Thank you very much".

Mr. Spivack said that he had been invited in his personal capacity and that his attendance did not have any political significance. Bengali-American relations are poor.

Sheikh Mujib's wife Fajilotdun did not attend today's ceremonies, reportedly because she was on the point of nervous exhaustion and was barely able to speak.

Unit his release early Saturday, Sheikh Mujib had been under detention in West Pakistan, where he had been charged with treason.

Standing in the bright sunlight today, Sheikh Mujib appealed to his vast audience not to seek revenge for the three million Bengalis he said had been murdered by the Pakistani Army during their nine month drive to suppress the Bengali secession movement he led.

"Forgive them !" he shouted to the crowd. "Today I do not want revenge from anybody ! There should not be any more killing !"

"The Bengal that will eat, smile, sing and be happy is my Bengal. Everyone in Bengal is now a Bengali and we must live together", he said.

His appeal was thought to be directed to the problem of the two million Biharis, the non-Bengali immigrants from India who had sided with the Pakistani army.

Bengali officials estimated that half a million people were at the race course and that 100,000 lined the mile-and-a-half route there from the airport. But the crowd was smaller than on several previous occaisons when Sheikh Mujib spoke.

Many still in villages

Many Bengalis believed that the size of the crowd reflected the enormous number of deaths in the war. And many Dacca residents have still not returned from their native villages where they fled during the war. As the flower-bedecked truck on which Sheikh

Mujib rode from the airport passed slowly through the crowd, there were long rhythmic chants of “Sheikh Mujib Zindabad!” (Long live Sheikh Mujib”) .

Thousands of voices also chanted :

“A new natin has come upon the earth-Bangla Desh ! Bangla Desh!” “A new ism has come to the world—Mujibism! Mujibism !”

Many excited spectators tried to tough their leader and some who managed to break through police lines hugged him in long embraces.

Sheikh Mujib has long been the overwhelming favourite of the 75 million Bengalis. The Awami Leage, the party of which he is President, won 167 of the 169 seats alloted to East Pakistan in the National Assembly elections in December,1970.

When Sheikh Mujib demanded autonomy for the eastern region, President Agha Mohammad Yahya Khan of Pakistan first postponed the assembly session and then, on March 25, moved with his army to crush the Bengali movement. Guerrilla warfare broke out and as many as 10 million Bengalis are said to have fled to India.

Friend of Bengal

The 51-year-old Sheikh Mujib, who is tall for a Bengali and has a thick mustache and a heavy shock of graying hair, was affectionately hailed today as Bangabandhu, or friend of Bengal. He was wearing a black suit with a high buttoned collar.

The first man to greet Sheikh Mujib, as his plane landed at 1-45 p.m., was a beared guerrilla leader known as Kashru, who wore army fatigues with pistols strapped to his hips.

Thousand of people then rushed past guards from the East Bengal Regiments to engulf Sheikh Mujib, and he was unable to decend from the plane for 10 minutes.

At the race course, Sheikh Mujib told his vast audience that the last words of the new Pakistani President, Zulfikar Ali Bhutto, to him before his release were, “try to keep Pakistan together if there is any way.”

“I said nothing”, Sheikh Mujib recalled. “But now I say to you, Bengal is independent, and let the people of Pakistan and the people of Bangla Desh live happily. The unity of the country is ended.”

Word is virtually law

Sheikh Mujib’s popularity is so great that his word has virtually become law with many Bengalis. His followers in the Bengali cabinet, one of whom have even a fraction of his prestige or popularity, have postponed most cirtical decisions pending his return.

Among the questions awaiting Sheikh Mujib are how to disarm the 100,000 or more men who have been fighting as guerrillas and how to protect the two million Biharis. He will also be expected to help Bangla Desh gain international recognition and find large amount of foreign aid to rebuild the nation’s shattered economy.

It has been officially estimated that the new nation needs at least $ 3-billion for reconstruction, or three quarters of the region’s total annual produciton of $ 4-billion.

(FOX BUTTERIELD in THE NEW YORK TIMES-January 11, 1972)

সেই দিনের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন নিবরূপ ঃ

“রূপোলী ডানার মুক্ত বাংলাদেশের রদ্দুর। জনসমুদ্রে উল্লাসের গর্জন। বিরামহীন করতালি, শ্লোগান আর শ্লোগান। আকাশে আন্দোলিত হচ্ছে যেন এক ঝাঁক পাখি। উম্মুক্ত আগ্রহের মুহূর্তগুলো দুরন্ত আবেগে ছুটে চলেছে। আর তর সইছে না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসেছেন রক্তস্নাত বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরীতে দখলদার শক্তির কারা প্রাচীর পেরিয়ে। ....আমার সোনার বাংলা সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি, হৃদয়ের রক্ত-গোলাপ শেখ মুজিব এসে দাঁড়ালেন। আমাদের প্রত্যয়, আমাদের সংগ্রাম, শৌর্য, বিজয় আর শপথের প্রতীক বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন তাঁর স্বজনের মাঝে। চারধারে উল্লাস, করতালি, আকাশে নিক্ষিপ্ত বদ্ধ-মুঠি, আনন্দে পাগল হয়ে যাওয়া পরিবেশ- যা অভূতপূর্ব, শুধু অভূতপূর্ব। এই প্রাণাবেগ অবর্ণনীয়।” ....

'দৈনিক বাংলা', ১১ই জানুয়ারী, ১৯৭২

'আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সেই বীর শহীদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।

ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে, এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হল, তা কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশের মুক্তি- সংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজীর নাই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে। সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার করে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দীশালায় থেকে আমি জানতাম তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি স্হিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নিচু করব না।

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে মানুষ করনি।' কিন্তু আজ আর কবিগুরুর সে কথা বাংলার মানুষের বেলায় খাটে না-- তাঁর প্রত্যাশাকে আমরা বাস্তবায়িত করেছি। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মত বাঁচতে জানে। ছাত্র- কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, আপনারা কত অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, গেরিলা হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, রক্ত দিয়েছেন দেশমাতার মুক্তির জন্য। আপনাদের এ রক্তদানবৃথা যাবে না।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয়মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য দিয়েছেন। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্হল হতে ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম--- এবারের সংগ্রাম

স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন ফেব্রুয়ারি র প্রাণ থাকতেও আমরা এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোন শক্তি নেই।

আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, তাহলে আমাদের এ স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে-- পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। আপনারা নিজেরাই সেসব রাস্তা মেরামত করতে শুরু করে দিন। যার যা কাজ, ঠিকমত করে যান। কর্মচারীদের বলছি আপনারা ঘুষ খাবেন না। এদেশে আর কোন দুর্নীতি চলতে দেয়া হবে না। প্রায় চার লাখ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানে আছে। আমাদের অবশ্যই তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। বাংলাভাষী নয় এমন যারা বাংলাদেশে আছেন, তাদের ফেব্রুয়ারি দের সাথে মিশে যেতে হবে। কারও প্রতি আমার হিংসা নেই। অফেব্রুয়ারি দের প্রতি কেউ হাত তুলবেন না। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। অবশ্য যেসব লোক পাকিস্তানী সৈন্যদের সমর্থন করেছে, অযামাদের হত্যা করতে সাহায্য করেছে, তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেয়া হবে।

আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল এবং অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, আমি তাদের জানি। আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার জেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবরই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না । ফঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, 'আমি ফেব্রুয়ারি , বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।'

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন । আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম , বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদে মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। তাজউদ্দিন এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।

আমার পাকিস্তানী ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমি চাই আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনদের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের

গ্রামগুলো বিধস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোন আক্রোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যে কোন দেশের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধুমাত্র সেই ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের কোন লোক মারা যায়নি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্হান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্হান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্হান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না, আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক। এদেশের কৃষক-শ্রমিক হিন্দু মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তি তে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পন্ডিত জহরলাল নেহরুর কন্যাই নন, পন্ডিত মতিলাল নেহরুর নাতনীও। তাঁর সাথে আমি দিল্লীতে পারস্পারিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্য বাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেবার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় এক কোটি লোক যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকী যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে সেই বীর মুক্তিবাহিনী, ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক সমাজ, বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ই,পি,আর, পুলিশ,বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, তার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তাঁর নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা,

বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

পাকিস্তানী কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন-- সম্ভব হলে আমি যেন দুদেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম আমার জনসাধারণের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্ব প্রথম প্রাণ দেবে। পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়ার জন্য সাহায্য করুন।

জয় বাংলা”

(বজ্রকণ্ঠ, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক
প্রকাশিত পুস্তিকা, ঢাকা, ১৯৭২) ।

(মযহারুল ইসলাম ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ১৯৯৩, পৃঃ ৭৭৩-৭৭৭ হইতে উদ্ধৃত)

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন নিম্নরূপঃ

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ই জানুয়ারী, ১৯৭২

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে
(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

আজ বহু প্রতীক্ষিত সেই শুভদিন। সাড়ে ৭ কোটি বাঙ্গালীর অন্তরে অন্তহীন আস্থা ও ভালবাসা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার স্বর্ণ-সিড়িতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া স্বাধীন বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান সুদীর্ঘ ১ মাস পরে আবার জননী বাংলার কোলে ফিরিয়া আসিতেছেন। পাক সামরিক জল্লাদদের কারাগার তাঁকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন তাঁর সারা জীবনের ত্যাগ ও তপস্যার ফসল স্বাধীন বাংলার বুকে। লন্ডন হইতে বৃটিশ বিমান বাহিনীর একখানি বিমানে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী হইয়া আজ (সোমবার)

মধ্যাহ্নে বাঙ্গলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় পদার্পন করিতেছেন।

বঙ্গবন্ধুর আগমন-লগ্নে, আজ দুঃখিনী বাঙ্গলার সজল চোখে মুখে হাসির ঝিলিক। শহর-বন্দরে, গ্রাম-গঞ্জে, রাজপথে ও জনপদে আজ পরিতৃপ্ত চিত্তে উল্লাসিত জয়ধ্বনির তূর্যনাদ-কোটি কণ্ঠে আজ একই বজ্রধ্বনি ঃ সালাম, হে বীর, লহ সালাম।

ঢাকা বিমান বন্দরে উপনীত হইবার পর বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা ও অবিস্মরণীয় এক ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে। বাঙ্গলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও মিত্রবাহিনীর পক্ষ হইতে বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হইবে। বিমান বন্দর হইতে স্মরণকালের বিশালতম শোভাযাত্রা সহকারে বাঙ্গলার নয়নমণিকে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লইয়া যাওয়া হইবে। বিগত ৭ই মার্চ যে ময়দানের বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া তিনি বাঙ্গলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে ঔপনিবেশিক পাক সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার আহ্বান জানাইয়াছিলেন--যে ময়দানে গত ১৬ই ডিসেম্বর দখলদার বর্বর পাক সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, আজ (সোমবার) সেই ঐতিহাসিক ময়দানেই বিজয়ী বীরের বেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগ্রামী ঢাকাবাসীদের সাক্ষাৎদান করিবেন। অতঃপর তিনি প্রায় দীর্ঘ ১ মাস পর তাঁর প্রিয় পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য ধানমন্ডিস্থ স্বীয় বাসভবনে গমন করিবেন।

ইতিমধ্যে রাজধানী ঢাকার প্রিয় নেতার আগমণ উপলক্ষে উল্লাসিত জনতার চঞ্চল পদচারণার রাস্তাঘাট মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় অলিতে গলিতে তোরণ নির্মানের হিঁড়িক পড়িয়া গিয়াছে এই উপলক্ষে বাঙ্গলাদেশ সরকার সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশ শত্রুমুক্ত হইয়াছে তিন সপ্তাহ আগে। কিন্তু জাতির পিতা শত্রুর জিন্দানখানায় বন্দী থাকায় শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাঙ্গলার জয় জয়ন্তী ততদিন পূর্ণতার সোনালী আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে জল্লাদের কারাগার হইতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ফলে জন্মভূমির স্বাধীনতা আজ পরিপূর্ণ মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে একটি শক্তিশালী ঔপনিবেশিক শক্তিকে এমন চূড়ান্ত ভাবে পর্যুদস্ত করিয়া স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় কোন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের জন্য শেখ মুজিবের আদর্শের পতাকাধারা বাঙ্গালী জাতি চরম মূল্য দিয়াই পাইয়াছে এবার পরম পাওয়াকে।

বাঙ্গলার মাটি আর মানুষই বঙ্গবন্ধুর আজন্মের সাধনার ধন। নেতা ও জনতার অনাবিল ভালোবাসা, আস্থা আর নিবিড় নৈকট্যবোধেরই সোনালী ফসল আজিকার স্বাধীন বাঙ্গলা। ১৯৬১ সালে প্রচন্ড গণ-আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে আইয়ুব খানের জেলের তালা ভাঙ্গিয়া যায়--মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শেখ মুজিব আবার জনগণের মধ্যে ফিরিয়া আসেন। সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, আমার

জীবন বাঙ্লার মানুষের কাছে মটগেজ দেওয়া। যে রক্ত দিয়া আমাকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছে, নিজের রক্তের বিনিময়ে হইলেও আমি সেই রক্তের ঋণ শোধ করিয়া যাইব।

কিাত সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে এবারের সংগ্রামকে মুক্তির সংগ্রাম-স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়া ঘোষণা করিয়া বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতার শেষ বাক্যটিতে বলিয়াছিলেন, 'আমি রক্তদানের জন্য প্রসঁত হইয়া গেলাম ....।' আর বাঙ্লার মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য, জননী বাঙ্লার স্বাধীনতার জন্য নিজের বুকের রক্ত ঢালিয়া দেওয়ার দুর্লভ মহিমামন্ডিত প্রতিজ্ঞা লইয়াই ২৫শে মার্চের সেই ভয়াল বিভীষিকাময় রাত্রে বঙ্গবন্ধু কারারুদ্ধ হন। জল্লাদ বাহিনীর হাতে বন্দী হইবার আগে তিনি জাতির উদ্দেশে বজ্রকণ্ঠ নির্দেশ প্রদান করিয়া যানঃ "বাঙ্লাদেশ স্বাধীন। শত্রু আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। সজোরে পাল্টা আঘাত হানো।"

তার পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। এই সুদীর্ঘ দিনগুলি বঙ্গবন্ধু কাটাইয়াছেন শত্রুর কারাগারে দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনের দুঃসহ দুঃখের তপস্যায়। আর এদিকে তাঁর আদর্শের পতাকাহাতে বাঙ্লার সাড়ে সাত েটি মানুষ তাঁরই নির্দেশে চালাইয়াছে মাতৃভূমির স্বাধীনতা যুদ্ধ-নেতাকে জল্লাদের কারাগার হইতে ছিনাইয়া আনার সংগ্রাম।

শেখ মুজিব আজ ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি সাড়ে ৭কোটি বাঙ্গালীর অন্ত হীন ভালোবাসা আর অগাধ বিশ্বাসের দুর্লভ ঐশ্বর্যে গড়া একটি অনুপম ইতিহাস-বিশ্বের এক নুতন দেশ, নূতন মতবাদ, নূতন আদর্শের জনক। বাঙ্লার মাটি, বাঙ্লার মানুষ, বাঙ্লার জল, বাঙ্লার আকাশ-বাতাস হইতে শেখ মুজিবকে আলাদা করিয়া দেখা যায় না। আর যায় না বলিয়াই আজ মুকুটহীন সম্রাট শেখ মুজিবের ফিরিয়া আসার দিনে বাঙ্লার দিগন্তে আনন্দের আগমনী-- বিজয়ের উল্লাস।

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়ের প্রথম অংশ নিবরূপ ঃ

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ জানুয়ারী ১৯৭২

সম্পাদকীয়

স্বাগতম এস, বাঙ্লার স্বাপ্নিক

ব্যাকুল আগ্রহের অবসান ঘটিয়াছে। শক্তি মদমত্ততায় শতাব্দীর সূর্যকে গ্রাস করার চরম ঔদ্ধতা প্রদর্শনকারীর কারাগার হইতে নিপীড়িত জনগণমনঅধিনায়েক বঙ্গবন্দু শেখ মজিবুর রহমান আজ মুক্ত। কিাত পচিশ মার্চের সেই বীভৎস কুটিল রাত্রে হানাদার বাহিনী কর্তৃক বন্দী হওয়ার পর তাঁহাকে পশ্চিম পাকিস্তানের এক জিন্দাখানার নির্জন প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ করা হয়, বাঙ্লাদেশ বহির্বিশ্বের ক্রমবিবর্তিত ঘটনাপ্রবাহের অকাতি হইতে তাহকে রাখা হয় সর্ম্পূন

বিচ্ছিন্ন। কারা মুক্তির পর লন্ডনে অবস্থানকালে সবে তাহাকে অবহিত করা হইয়াছে। ---

দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার প্রতিবেদন নিবরূপ ঃ

পূর্বদেশ
১১ জানুয়ারী, ১৯৭২

আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে ঃ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টর)

বাঙ্গলার প্রাণপ্রিয় নেতা, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাঙ্গলার একজন লোকও বে'চে থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাঙ্গলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই।'

নয় মাস পরে স্বদেশে ফিরে এসে দেশবাসীর সামনে বক্তৃতা করতে গিয়ে জনতার প্রিয় নেতার চোখে অশ্রু নেমে আসে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে, যাঁরা বর্বর বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে তাঁদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, "আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাঙ্গলাদেশ আজ স্বাধীন। বাঙ্গলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম। তোমরা আমার সালাম নাও।"

তিনি বলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানে আমি ফাঁসিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম বাঙ্গলাদেশ স্বাধীন হবে।" তিনি বলেন, "বাঙ্গলার মানুষ মুক্ত হওয়ায় বাস করবে। খেয়ে-পরে সুখে থাকবে এটাই ছিল আমার সাধনা।" বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, "আমার সোনার বাঙ্গলা তোমায় আমি অত্যন্ত ভালবাসি।" কবি গুরুর 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করোনি ....।' কবিতাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, কবিগুরুর এই আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। তিনি বলেন, বাঙ্গালী জাতি প্রমান করে দিয়েছে যে, তাঁরা মানুষ, তাঁরা প্রাণ দিতে জানে। এজমন কাজ তাঁরা এবার করেছে যার নজীর ইতিহাসে নেই।"

ছাত্র সমাজ, শ্রমিক, কৃষক জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, "তোমরা, আমার ভাইয়েরা গেরিলা হয়েছিলে দেশমাতার মুক্তির জন্য। তোমরা রক্ত দিয়েছ। তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না।"

প্রিয় নেতা আরো বলেন, "গত সাতই মার্চ এই রেসকোর্সে বলেছিলাম দুর্গ গড়ে তোল। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙ্গালী বে'চে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাঙ্গলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরুপেই বে'চে থাকবে। বাঙ্গলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই।

> বঙ্গবন্ধু আরো ঘোষণা করেছেন, "বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।"
>
> পাকিস্তানী বাহিনী গত দশ মাসে বাংলাদেশকে বিরান করে দিয়েছে বলে উল্লেখ করে শেখ সাহেব বলেছেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট হিসাবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসাবে..........।

এইভাবে ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করতঃ উপরোক্ত নীতি নির্ধারণী বক্তব্য প্রদান করেন।

অতঃপর, ১৯৭২ সনের ১৭ই মার্চ তারিখে ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ প্রসঙ্গ ঃ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণ ক্রমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সনের ১৭ই মার্চ তারিখে এক শুভেচ্ছো সফরে ঢাকায় আগমন করেন।

১৭ই মার্চ তারিখে ঢাকা বিমান বন্দরে হাজার হাজার জনতা তাঁহাকে প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা জানায়।

ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের প্রথম কাতারের নেতা মতিলাল নেহেরুর পৌত্রী এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরুর কন্যা। তাঁহার নেতৃত্বে ১৯৭১ সনের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস নিরঙ্কুস বিজয় লাভ করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম হইতেই তিনি বাংলাদেশের প্রতি অতিশয় সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁহার সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে বাংলাদেশের ১ কোটি শরণার্থীকে কিছুতেই বাঁচান সম্ভব হইত না।

পাকিস্তানের সামরিক সরকার শেখ মুজিবকে বিচারের নামে ফাঁসি দিবার ষড়যন্ত্র করিলে ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন তৎপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য জনমত গড়িয়া তোলেন। ১৯৭১ সনে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের প্রতি সবসময়েই সহানুভূতিশীল থাকিলেও বিশ্বের পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র সরকার কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি মোটেও সহানুভূতিশীল ছিল না, তাহারা বরঞ্চ পাকিস্তানকে সর্ব প্রকারে সহযোগিতা করিতেছিল। তাহাছাড়া, আর একটি পরাশক্তি চীন দেশও ভারতের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন

ছিল এবং পাকিস্তানকে সামরিক অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিত। কিন্তু এইরূপ বৈরী পরিবেশও ইন্দিরা গান্ধীকে দমাইতে পারে নাই। তিনি শরণার্থীদের জন্য, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য মমতাময়ীর মত তাহাদের সকলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

তিনি রাশিয়া, ব্রাসেলস,পশ্চিম জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ভিয়েনা, লন্ডন , ওয়াশিংটন, ফ্রান্স, প্রভৃতি রাষ্ট্রে উল্কার মত ভ্রমন করেন এবং সর্বত্র বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্য দাবী ও অধিকার যেভাবে মমত্বের সহিত উপস্থাপন করেন তাহার কোন তুলনা নাই। তিনি রাষ্ট্র প্রধানগণের সহিত কথা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় গমন করিয়া ছাত্র, অধ্যাপকদের সহিত কথা বলেন, সাংবাদিক, সাধারণ মানুষ সকলের কাছে তিনি বাংলাদেশের আর্তি পৌঁছাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৯৭১ সনের ৫ই নভেম্বরে ওয়াশিংটনে জাতীয় প্রেস ক্লাবে তিনি বলেন (Bangladesh Documents, Vol. II. UPL Page 265-267) ঃ

Prime Mnister Indira Gandhi's speech at the National Press Club, Washington
November, 5, 1971

....

The elections aroused new hope in our people and generated new energy and purpose in us. But today, your thoughts and mine are proccupied with the crisis of Bangla Desh, that is, East Bengal. There, too elections were held. The fact that even under a military regime the people of East Bengal so over-whelmingly voted for the Awami League showed their deep desire for democratic rights. The military rulers used the period of negotiations to amass troops. And on the very day, when the Awami League thought that settlement was to be reached, a reign of terror—such as history has rarely witnessed—was unleashed.

I have not hesitated sometimes to criticise the Press, of course, in self-defence. But on this occasion, I should like to express appreciation of the manner in which the Press correspondents of many countries have tried to arouse the conscience of the world. They have shown courage and perseverance in lifting the veil around

East Bengal and revealing the truth of the grim tragedy being enacted there. Their words have been honest and direct, but the photographs have outdone them in conveying the very essence of sorrow and misery.

What is taking place there is not a civil war in the ordinary sense of the word; it is a genocidal punishment of civilians for having voted demoreatically. It is a strange and cynical way of getting rid of one's opponents and of deliberately using helpless millions as a weapon against a neighbour nation. The number of the refugees is equal to the population of some of the countries of Europe, such as Austria and Belgium, where I was only recently.

We feel that this is a new kind of aggression. It certainly casts an unconscionable economic burden on us and has created political and social tensions endangering our security. This is not a purely internal matter of one country, because the overflow of the political, economic and security consequences are affecting another country, that is, India. This is not an international dispute, certainly not an Indo-Pakistani dispsute, for the traditional international instruments to be invoked.

We are told that the confrontation of troops is a threat to peace. Is there no threat to peace when a whole people are massacred? Will the world be concerned only if people die because of war between two counteies and not if hundreds of thousands are butchered and expelled by a military regime waging war against the people ?

We cannot draw upon precedents to deal with this unprecedented variety of aggression. We have to devise new patterns of response. It is in order to impress on world leaders the nature of the crisis and the means of resolving it that I wrote to heads of Governemnt several months ago and sent some of my colleagues to meet them. We informed them that the only way out of the mess which the military rulers of Pakistan have made for themselves is to have a political settlement with the elected representatives of East Bengal, Sheikh Mujibur Rahman, if he is alive, and his colleagues who embody the Will of the people.

Had the world realised it then, much of this mounting misery and the migration of many more millions could have been avoided. The chances of such a settlement have grown more slender with each new day of neglect. But there might still be time if world leaders appreciated the reality of the situation.

In the various capitals I have visited on this tour, I have been asked what solution India would like. The question is not what we would like, or what one or other of the big powers would like, but what the people of East Bengal will accept and what solution would be a lasting one.

I should like to plead with the world not to press me for a solution which leaves out the people of East Bengal. It is an illusion to think that the fate of a country can be decided without reference to its people. Once again, we see the old habit of underestimating the power of nationlism in Asia and of the demand of the people of Asia to make their own choice. Those who subscribe to the belief that democratically reached decisions are the most viable should recognise that the process of democracy admits no geographical disqualification. If democracy is good for you, it is good for us in India, and it is good for the people of East Bengal.

The supression of democracy is the original cause of all the trouble in Pakistan. The nations of the world should make up their minds who is more important to them, one man and his machine or a whole nation.

I am asked what initiatives India will take. We have taken the biggest possible initiative in remaining so self-restrained and in keeping in check the anger within our country. We have endeavoured strenously to see that this does not become an Indo-Pakistan issue. Any direct talks between the two countries would immediately be converted into such a dispute and make the solution more difficult. Pakistan has been trying to create conditions in which the world would think that Pakistan is threatened by a more powerful neighbour. As I have said, the threat to Pakistan has come from its own rulers, not from us. When the regime there found out that its calculations will not succeed, it moved its troops to our

western frontier, knowing full well that we would be forced to follow suit.

Pakistan's pleas for observers from the United Nations, for bilateral talks with India, and for mutual withdrawal of troops, seemed very plausible at first sight. But these are only methods ot divert the attention of the world from the root of the problem to what are merely by-products. We cannot be side-tracked. We cannot have a dialogue with Pakistan on the future of East Bengal, because we have no right to speak for the people of East Bengal. Only Sheikh Mujib or the elected and accepted representatives of East Bengal have that right.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বনস্হ বিথোভেন হলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২১ নভেম্বর ১৯৭১

<u>দলিলপত্র ঃ দ্বাদশ খন্ড, পৃঃ ১৬২</u>

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH IN BEETHOVEN HALL, BONN, NOVEMBER 21, 1971.

Following are excerpts from the speech :

You know, just as we had elections in India, there were elections in Pakistan after a very very long time, because the people were getting tired of military rule and there was a general demand for elections. In Pakistan, Sheikh Mjujibur Rahman, the leader of the Awami League Party, got a majority that was even much bigger than my majority in India. Almost toa man, the people in East Bengal-man or woman-voted for him. But whereas in India it was a logical conclusion-you win an election, you form the Government-on the other side this did not happen. The six-point programme was not a new programme, it was the programme which Sheikh Mujibur Rahman had put before the people before the elections. This was his election campaign, his election programme. And if anybody had any objection, whether the leaders or anybody else, the time to raise the objections was before the elections. They should have said we cannot have elections on the basis of this six-point programme. But

nobody said anythign. It was when the electins were won by such a big majority that this was raised; "that this means far too much autonomy than we are prepared to give." And negotiations began. We thoguht, and the people of East Bengal thought, that this was a genuine attempt to come to an understanding; but the time was used for bringing across more troops from West Pakistan by sea, and when they thought that there were sufficient troops to deal with the population, on the 24th March, I am told by a leader of East Pakistan, who says he was, if not in the same room, at least in the same house where talks were being held that they thought that things were going on well and that they were approaching a solution and an agreement. The very next day, a regin of terror, of massacre, and all that goes with it, was unleashed, and this resulted in millions of refugees-the number is now over 9 million-it is the population of Belgium or Austria who are now sitting on Indian soil in the greatest of discomfort, in the greatest of misery, in very inadequate camps.

Now, even if in a rich country 9 million people were to come suddenly, not a few at a time, but very suddenly in a few weeks, they would not be able to manage the situation. So you can imagine that India being one of the poorest countries, with very limited resources, and in this situation we have 9 million people. You can imagine the pressure on supplies, on the administration, on the resources, on money, on every possible thing. Most of the refugees have come into four States of India in the Easter region, and in one of them, Tripura, there is hardly room to put a person now. They are occupying the schools and the colleges and parks, every possible public building. In the beginning, the people were every sympathetic. Now the parents say: 'well we are sympathetic but what about our children ? When will the schools open ? Are they going to miss years of their education ? ' So, all administrative work in some of these States is at a standstill. Every official is busy looking after the camps.

The economic burden is tremendous, the administrative problems are there, but even more so are the social and political problems which have arisen. We have organised trade

unions. There is a recognised rate. Now, the refugees can't –we are trying to keep them in the camps, but because the number is so large, and many of them don't come to camps at all-they offer their services at a much lower rate. Now, immediately there is trouble, because the labour unions say 'well, this is our rate and you cannot employ'. But we have people who was to take advantage of such a situation, and so we have great social tensions. I am just given one example to show the type of problems that can arise; but more serious than all of this is the threat to India's stability; because amongst the refugees there are many who may not be genuine refugees. We have no way of booking them. And we are having acts of sabotage, trains are being blown up, lembs are found in places, and a lot of propaaganda is being done in order to there tension between the different religions Pakistan has raised a question about the number of refugees; we say they are over 9 million. They have given the figure of 2½ to 3 million. Now, there is some logic in their argument, because 2½ to 3 million is the figure of the Muslim refugees, but we have not only Muslim refugees, we have Hindus, we have Christains, we have Buddists. In three of the States, Tripura, Meghalaya and Assam, everybody is fully accounted for, for there every individual has a ration card. It is true, in West Bengal things are not so well orginised because the larger numbers are there. But after this question arose, we are having a recounting at all the Camps and it may be over by now, because it started some time before I left the country. It may be a little less, it may be a little more, but I don't think there will be a great difference in the figures which we have give.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Now, what does withdrawal mean ? People say, even though it was their fault, what harm is there in withdrawing

the troops ? Well, the question is that their cantonments are right near the border, but ours are not; ours are very far a way and if we withdraw, there is no way we can really adepuately defend our country if they change their mind. And, we have had no cause to trust them, I mean, we have been attacked twice and on each occasion for many months they have said, "we have nothing to do with it, we have sent no infiltrators," and then they themselves have admitted this in public forums, such as, either the Security Council or somewhere else. This is the history and the background. As any head of Government although India is deeply committed to peace, to total disarmament, India believes that war does not solve problems-but we cannot leave our borders undefended in the present circumstances, especially as all the news coming from Pakistan state that since they are bnound to lose East Bengal, why should they not grab a piece of the West. This is the situation which we face. Seeing India from a long distance, it may seem to you : "well, it does not make any difference." But the people who live on the borders, and ours are inhabited right up to the very edge-in fact, in East Pakistan we have houses where the houses are in India and the kitchens are in East Bengal or vice-a-versa. We have no natural border; there is no river or road or anything like that. To the people who live in the border, it means a great deal whether they are properly defended or not, whether they can trust the Government to defend them. So, this is what the position is.

So, today, we feel that very much more is at stake than people are realising; and I have come here not to ask for anything from the Government, from any of the countries where I have been, but merely to give my assessment of the situation as ti exists. and it is then for these countries, these governments or the people, to decide what they should do in such a situation, whether they should help or they should not.

Naturally, everybody welcomes sympathy, everybody welcomes friendship, everybody welcomes support, but we know that in life, in the ultimatte anylysis, everybody-even a parent, or a child, or a sister, or a brother, each individual is alone; each country is alone; and India must learn to stand on her feet; she is going to stand on her feet and deal with the problems herself.

মুক্তিযুদ্ধের শেষভাগে জানা যায় যে যুক্তরাষ্ট্র ইহার ৭ম নৌবহর বাংলাদেশ অভিমুখে প্রেরণ করিতেছে, ঐ সময় ১৯৭১ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে ইন্দিরা গান্ধী নিবোক্ত পত্র নিক্সনের বরাবরে প্রেরণ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি।	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

<u>দলিলপত্র ঃ দ্বাদশ খন্ড, পৃঃ১৯৬-১৯৮</u>

RIGHTS OF 75 MILLION PEOPLE OF BANGLADESH TO LIFE, LIBERTY AND PURSUIT OF HAPPINESS

Letter from Shrimati Indira Gandi, Prime Minister of India, to his Excelency Mr. Richard Nixon, President of the United States of America, December 15, 1971.

DEAR MR. PRESIDENT,

I am writing at a moment of deep anguish at the unphappy turn which the relations between our two countries have taken.

I am setting aside all pride prejudice and passion and trying, as calmly as I can, to analyse once again the origins of the tragedy which is being inacted.

There are moments in history when brooding tragedy and its dark shadows can be lightened by recalling great moments of the past. One such great momnt which has inspired millions of people to die for liberty was the Declaration of Independence by the United States of America. That declaration stated that whenever any form of Government becomes destructive of man's inalienable rights to life, liberty and pursuit of happiness, it was the right of the people to alter or abolish it.

All unprejudiced persons objectively surveying the grim events in Bangladesh since March 25 have recognised the revolt of 75 million people, a people who were forced to the conclusion that neither their life, nor their liberty, to say nothing of the possibility of the pursuit of happiness, was available to them. The World Press Radio and Television have faithfully recorded the story. The most perceptive of American scholars who are knowledge about the affairs of this sub-continent revealed the anatomy of East Bengal's frastrations.

The tragic war, which is continuing could have been averted if during the nine months prior to Pakistan attack on us on December 3, the great leaders of the world had paid some attention to the fact of revolt, tred to see the reality of the situation and searched for a genune base for reconcilation . I wrote letters along these lines. I undertook a tour in quest of peace at a time when it was extremely difficult to leave the country inthe hope of presenting to some of the leaders of the world the situation as I saw it. It was heart-breaking to find that while there was sympathy for the poor refugees, the disease itself was ignored.

War could also have been avoided if the power, influence and authority of all the States, and above all of the Unitetd States, had got Sheikh Mujibur Rahman released. Instead we were told that a civilian administration was being installed. Everyone knows that this civilian administration was a farce; today the farce has turned into a tragedy.

Lip service was paid to the need for a political solution, but not a single worthwhile step was taken to bring this about. Instead, the rules of West Pakistan went ahead holding farcical elections to seats which had been arbitrarily declared vacant.

There was not even a whisper that anyone from the outside world had tried to have contact with Mujibur Rahman. Our earnest plea that Sheikh Mujibur Rahman, should be released, or that, even if he were to be kept under detention, contact with him might be established, was not considered practical on the ground that the U.S. could not urge policies which might lead to the overthrow of

President Yahya Khan. While the United States recognised that Mujib was a core factor in the situation and that unquestionably in the long run Pakistan must acquiesce in the direction of greater autonomy for East Pakistan, arguments were advanced to demonstrate the fragility of the situation and of Yahya Khan's difficulty.

Mr. President, may I ask you in all sincerity: Was the release or reven secre: negotiations with a single human being, namely, Sheikh Mujibur Rahman, more disastrous than the waging of a war ?

The fact of the matter is that the rulers of West Pakistan got away with the impression that they could do what they liked because no one, not even the United States, would choose to take a public position that while Pakistan's integrity was certainly sacrosanct, human rights, liberty were no less so and that there was a necessary interconnection between the inviolabilty of States and the contentment of their people.

Mr. President, despite the continued defiance by the rulers of Pakistan of the most elementary facts of life, we would still have tried our hardest to restrain the mounting pressure as we had for none long nine months; and war could have been prevented had the rulers of Pakistan not launched a massive attack on us by bombing our airfields in Amirtsar, Pathankot, Srinagar, Avantitpur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra in the broad day light on December 3 1971 at a time when I was away in Calcutta, my colleague, the Defence Minister, was in Patna and was due to leave further for Bangalore in the South and another senior colleague of mine, the Finance Minister, was in Bombay. The fact that this initiative was taken at this particular time of our absence from the Capital showed perfidious intentions. In the face of this, could we simply sit back trusting that the rulers of Pakistan or those who were advising them had peaceful, constructive and reasonable intent ?

We are asked what we want. We seek nothing for ourselves. We do not want any territory of what was East Pakistan and now constitutes Bangla Desh. We do not want any territory of West

Pakistan. We do want lasting peace with Pakistan. But will Pakistan give up its ceaseless and yet pointless agitation of the last 24 years over Kashmir ? Are they willing to give up their hate campaign and posture of perpetual hostility towards India ? How many times in the last 24 years have my father and I offered a Pact of Non-aggression to Pakistan ? It is matter of recorded history that each time such offer was made, Paskistan rejected it out of hand.

We are deeply hurt by the innuendos and insinuations that it was we who have precipitated the crisis and have in any way thwarted the emergence of solutions. I do not really know who is responsible for this calumny. During my visit to the United States, United Kingdom, France, Germany, Austria and Belgium, the point I emphasised publicly as well as privately was the immediate need for a political settlement. We warited nine months for it. When Dr. Kissinger came in August 1971, I had emphasised to him the importance of seeking an early political settlement. But we have not received, even to this day, the barest framework of a settlement which would take into account the facts as they are and not as we imagine them to be.

Be that as it may it is my earnest and sincere hope that with all the knowledge and deep understanding of human affairs you, as President of the United States and reflecting the will, the aspirations and idealism of the great American people, will at least let me know where precisely we have gone wrong before your representatives or spokesmen deal with us with such harshness of language.

With regards and best wishes.

১৯৭১ সনের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। ঐ তারিখে ইন্দিরা গান্ধী রাজ্য সভায় এক বিবৃতি প্রদান করেন।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে প্রদত্ত প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি।	রাজ্যসভার কার্যবিবরণী	৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

দলিলপত্র ঃ দ্বাদশ খন্ড, পৃঃ ৭৬০

STAMEMENT BY PRIME MINISTER : RECOGNITION OF BANGLADESH

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Mr. Chairman, Sir, the valiant struggle of the people of Bangla Desh in the face of tremendous odds has opened a new chapter of heroism in the history of freedom movements.

Earlier, they had recorded a great democratic victory in their elections and even the Preident of Pakistan had conceded the right of Sheikh Mujibur Rahman to become Prime Minister of Pakistan. We shall never know what intervened to transaform this benevolent mood and realistic approach, if it really was that to deception and the posture of open hatted.

We are told that Sheikh Mujubur Rahman and his party, the Awami League, had planned a non-violent movement of resistance to the Government of West Pakistan. But they were caught unawares and overtaken by a brutual military assault. They had no alternative but to declare for independence. The East Pakistan Rifles and East Bengal Regiment became the Mukti Fauj and later the Mukti Bahini, which was joined by thousands of young East Bengalies determined to sacrifice their lives for freedom and the right to fashion their future. The unity, determination and courage with which the entire population of Bangla Desh is fighting have been recorded by the worls Press.

These envents on our doorstep and the resulting flood of refugees into our territorry could not but have far-reaching repercussions on our country. It was natural that our sympathy should be with the people of Bangla Desh in their just struggle. But we did not act precipitiously in the matter of recognition, our decisions were not guided merely by emotion but by an assessment of prevailing and future realities.

With the unanimous revolt of the entire people of Bangla Desh and the success of their strguggle it has become increasingly apparent that the so-called mother State of Pakistan is totally

incapable of bringing the people of Bangla Desh back under its control. As for the legitimacy of the Government of Bangla Desh the whole world is now aware that it reflects the will of the overwhelming majority of the people, which not many governments can claim to represent. In Jefferson's famous words to Governor Morris, the Government of Bangla Desh is supported by the "will of the nation, substantially expressed." Applying this criterian, the Military regime in Pakistan whom some States are so anxious to buttress, is hardly representative of its people even in West Pakistan.

Now that Pakistan is waging war against India, the normal hesitation on our part not to do anything which could come in the way of a peaceful solution, or which might be construed as intervention, has lost signaificance. The people of Bangla Desh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves parties in the same cause.

I am glad to inform the House that in the light of the existing situation and in response to the repeated requests of the Government of Bangla Desh, the Government of India have after the most careful consideration, decided to grant recognition to the GANA PRAJATANTRI BANGLADESH.

It is our hope that with the passage of time more nations will grant recognition and that the GANA PRAJATRANTRI BANGLADESH will soon from part of the family of nations.

Our thoughts at this moment are with the father of this new State-Sheikh Mujibur Rahman. I am sure that this House would wish me to convey to their Excellencies the Acting President of Bangla Desh and the Prime Minister and to their colleagues, our greetings and warm felicitations.

I am placing on the Table of the House copies of the communication which we have received from the Government of Bangla Desh. Hon'ble Members will be glad to know that the Government of Bangla Desh have proclaimed their basic principle of State policy to be democracy, socialism, secularism and the establishment of an egalitarian society in which there would be no

discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. In regard to foreign relations, the Bangla Desh Government have expressed their determination to follow a policy of non-alignment, peaceful co-existence and opposition to colonialism, recialism and imperialism in all its manirfestations. These are the ideals to which India also is dedicated.

The Bgngla Desh Government have reiterated their anxiety to organise the expeditious return of their citizens who have found temporary refuse in our country, and to restore their lands and belongings to them. We shall naturally help in every way in these arrangements.

I am confident that in future the Government and the peoples of India and Bangla Desh, who share common ideals and sacrifices will forge a relationship based on the principles of mutual respect for each other's sovereignity and territorial integrity, non-interference in internal affairs, equality and mutual benefit. Thus working together for freedom and democracy, we shall set an example of good neighbourliness which slone can ensure peace, stability and progress in this region. Our good wishes to Bangla Desh.

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সনের ১৭ই মার্চ তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশে আগমন করেন। ঐদিন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ঢাকাবাসী তাঁহাকে এক প্রানঢালা সম্বর্ধনা প্রদান করে। সে সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় নানান প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। নিবে তাহার কয়েকটি বিবরণ প্রদান করা হইল।

"দৈনিক আজাদ"
১৮ মার্চ, ১৯৭২
আমরাও আপনার সাথে থাকবো

।।রহিম আজাদ।।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শুক্রবার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, বিশ্বের দুঃখী মানুষের সংগ্রামে বাংলাদেশ ভারতের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাবে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গতকাল মহান ভারতের মহিয়সী নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু একথা বলেন।

সমবেত জনসমুদ্রকে লক্ষ্য করে তিনি বলেনঃ "বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাত করার জন্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত এখনো চলছে। সুতরাং, প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে আবার হাতে অস্ত্র তুলে নেয়ার ডাক দিতে পারি।"

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এ ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু চৌদ্দ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আজ বাংলাদেশের এক পরম সৌভাগ্যের দিন। বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, দুনিয়ার দুঃখী মানুষের পাশে বরাবর যিনি নির্ভয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন - সেই মহান নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে আজ আমরা আমাদের মাটিতে আনতে পেরেছি। সৌভাগ্য যে, শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের ডাকে সারা দিয়েছেন। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আজ এই পবিত্র লগ্নে, তাঁকে জানাই অন্তরঢালা অভিনন্দন।"

এই ময়দানে

বঙ্গবন্ধু বলেন, যে ময়দানে আজ আমাদের মহান বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে নিয়ে এসেছি সে ময়দানটির একটি ইতিহাস আছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এই ময়দানেই স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলাম- বাংলার মানুষকে অস্ত্র তুলে নিতে বলেছিলাম। ষোলই ডিসেম্বর এই ময়দানেই বর্বর ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনী আত্মসমর্পন করেছিল। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর এই ময়দানেই আমি আপনাদের সাথে মিলিত হয়েছি। আর আজ এই ময়দানেই সংযোজিত হচ্ছে এক নতুন অধ্যায়। বাংলার শিকল ভাঙ্গবার সারথী ভারতের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত।

মাতৃরুপে আপনি ....

বঙ্গবন্ধু বলেন- "মাননীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন। বাংলার মানুষের উপর জল্লাদ ইয়াহিয়া বাহিনী যেদিন হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল আপনি সেদিন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নিঃসঙ্কোচে। ওরা আমার ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, ৩ কোটি লোকের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য আমার সোনার বাংলার এক কোটি লোক আপনার দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। আপনি শ্রীমতী গান্ধী সে দিন মাতৃরূপে আমার বাংলার দুঃখী মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য দিয়েছেন, সমর্থন দিয়েছেন আর দিয়েছেন মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার।"

ভাল বাসা ছাড়া দেবার কিছুই নেই

জাতির জনক বলেন- 'মহান ভারতের নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আপনাকে দেবার মতো আমাদের কিছুই নেই। আমরা বড় গরীব। বাংলার গ্রাম-গঞ্জে আজ হাহাকার। মানুষ না খেয়ে মরছে- শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। স্কুল কলেজ বন্ধপ্রায়। হিংস্র হায়েনার দল আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এ অবস্থায় দেবার মত আমাদের কিছুই নেই- আছে কেবল অফুরন্ত ভাল বাসা- আছে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সজিব প্রাণের আকো। আপনি বাংলার এই ভালবাসা গ্রহন করুন।"

ভুলবার নয়

বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার বাংলার স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে আপনি এসেছেন উদার হাতে। আপনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ৫ লক্ষ টন খাদ্য দিয়েছেন। আপনার সামরিক বাহিনী আমার দেশের বিধ্বস্ত রেল পথ মেরামত করে দিয়েছে, রাস্তা-ঘাট সংস্কার করেছে, টেলি যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠায় দিন-রাত কাজ করেছে। আপনার এ সহযোগীতা ভুলবার নয়-- শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

সাম্রাজ্যবাদীরা দেখে যাও

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন- 'ভারতের মহীয়সী নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী- আপনার ভারতীয় বাহিনী যখন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে তখন সাম্রাজ্যবাদী চক্র বার বার প্রচার চালিয়েছে যে, ভারত বাংলা দেশকে দখল করতে যাচ্ছে।

শ্রীমতী গান্ধী, আপনি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় বাহিনী দখলদার বাহিনী নয়। সাম্রাজ্যবাদী আজ দেখুক বাংলাদেশ একটিও ভারতীয় সৈন্য নেই।

বঙ্গবন্ধু বলেন- আপনি শুধু ভারতের নেত্রী নন- আপনি দুনিয়ার মজলুম মানুষের নেতা। আপনি যে ভাবে দুঃখী বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেভাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার দুঃখী মানুষের

জন্যে যখনই সংগ্রামী পদক্ষেপ গ্রহন করবেন আমরা বাংলাদেশ সরকার ও অগনিত জনতা আপনার সাথে থাকবো।

বাংলা দেখাতে পারলাম না

মহীয়সী নেত্রী, সোনার বাংলা আপনাকে দেখাতে পারলাম না। এই শ্যামল দেশে ওরা যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করলে আপিন চোখের পানি রাখতে পারতেন না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, এই ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে আপনাকে দেবার মত কিছুই নেই। তবে আমি বিশ্বাস করি বাংলার দুর্দিনে যেমন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ভবিষ্যতেও তেমনি করেই আপনাকে পাবো।

উপসংহারে বঙ্গবন্ধু স্বকণ্ঠে জয় বাংলা, জয় ভারত, জয় ইন্দিরা গান্ধী শ্লোগান উচ্চারণ করে মহান নেত্রীর প্রতি বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

"দৈনিক আজাদ"

১৮ই মার্চ, ১৯৭২

ইন্দিরাজীর অভয়বাণী

রক্তস্নাত বিধ্বস্ত ও বিপন্ন স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পন করেই ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অভয়বাণী শুনিয়াছেন- বাংলার বীর জনতা সুখী ও সমৃদ্ধশাল ী সমাজ গড়তে সক্ষম হবেই। বাংলাদেশের তমসাচ্ছন্ন ৯ টি মাসের যে - কণ্ঠটি আমাদের বারংবার "ওরে ভয় নাই তোর ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই" বলে আশ্বাস দিয়েছেন সেই বীরাঙ্গণা-কণ্ঠে অধিকারিনী ভারতীয় জনগণের অফুরন্ত ভালবাসা ও শুভেচ্ছার বাণী বয়ে নিয়ে মুক্ত রাজধানী ঢাকায় এসেছেন।

গতকাল দিল্লী থেকে সরাসরি বিমান বন্দরে পৌঁছে বাসস প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, আমি নিশ্চিত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ বাংলাদেশের জনসাধারণের সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

তিনি আরও বলেন যে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার মৈত্রী ও ভাতৃত্বের বন্ধন আরও জোরদার হবে। দু'দেশের মধ্যে রয়েছে একই আদর্শ ও ভাগ্যোন্নয়নের দৃঢ় সংকল্প। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই দৃঢ় সংকল্পই দু'দেশের উজ্জল ভবিষ্যৎ রচনায় সক্ষম হবে।

ভবিষ্যৎ ভাগ্য রচনার যে আশ্বাসবাণী তিনি ঢাকা বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি জানালেন, সেই অতিপরিচিত আশ্বাস ধ্বনি এতদিন ইথারের মাধ্যমে আমাদের কানের পর্দায় ভেসে এসেছে। পূণর্বার একই আশ্বাস ধ্বনি শুনে বাংলাদেশের মানুষ আনন্দিত ও পুলকিত।

পঁচিশে মার্চের কালরাতের পর থেকে ষোলই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভীষিকাময় দিন গুলোর স্মৃতি ও নিপীড়িত, নির্যাতিত বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। পঁচিশে মার্চের পর পাকজল্লাদ- বাহিনী ঝাঁপিয়ে পরলো নিরীহ নিরপরাধ আবাল-বৃদ্ধবনিতার উপর। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ চললো অবাধে ও অবলীলাক্রমে। প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ে ঝাপটার আহত-পাখীর মত বাংলার মানুষ শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়াতে লাগলো সামান্য আশ্রয়ের আশায়। প্রাণে বেঁচে থাকার তাগিদে। রুপসী বাংলা লাল হয়ে উঠলো শহীদদের রক্তে। এক কোটি মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় নিলো ভারতের মাটিতে। ইতিহাসের এমনটি দুর্যোগময় মুহুর্তে আশ্রয়ে ও আশ্বাসের বাণী নিয়ে এগিয়ে এলেন ভারতের মহান নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করার জন্য তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন, মানবতার নামে তোমরা এ গণহত্যা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে এসো। নিপীড়িত, নির্যাতিত দুঃস্হ মানুষগুলোকে তোমরা বাঁচাও। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আকুল আবেদনে সেদিন অনেক দেশই সাড়া দেয়নি। শান্তি, প্রগতি, স্বাধীনতা ও মানবতার বাণীকে গলাটিপে হত্যা করে তারা সেদিন নিরব দর্শকের মত দাঁড়িয়েছিলো। আবার কোন কোন দেশ নিজদের ঘৃন্য স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জল্লাদ শিরোমণি ইয়াহিয়া চক্রকেই সাহায্য করেছে। আর্ত ও বিপন্ন মানবতার সেবায় সেদিন কেউ এগিয়ে না এলেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন দীপ্ত পদক্ষেপে। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,তবে একলা চলরে"- কবিগুরু এই মহান বাণীকে বুকে ধারন করে সেদিন তিনি একলাই সংগ্রাম করেছেন সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে। শ্রীমতী ইন্দিরা সেদিন ছিলেন আমাদের আশ্বাস, সাহস ও সংগ্রামের সঙ্গী। রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভারত ও বাংলাদেশের রাখীবন্ধন হয়েছে। এ বন্ধন অচ্ছেদ্য।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বার বার বলেছেন, "বাংলাদেশকে স্বরাজ পেতে আমরা যা সাহায্য দিয়েছি তা আমাদের আদর্শ ও নীতির অনুসরণমাত্র।" বাংলাদেশ ও ভারতের আদর্শ অভিন্ন। একের সঙ্গে অন্যের কোন অমিল নেই। শান্তি, প্রগতি, স্বাধীনতা ও জনগণের দারিদ্র্য মোচনের স্বার্থেই দুটো দেশের মধ্যে মৈত্রী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখার প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী। আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ ও ভারত একই মায়ের দুটি সন্তানের মত বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় রেখে এগিয়ে যাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

“Bangladesh Observer”
Dacca, Saterday, 18th March, 1972

INDIA WANTS A STRONG BANGLADESH: INDIRA GANDHI

We will march together

Bharatratna Srimati Indira Gandhi, addressing a mammoth public meeting in Dacca on Friday, said that India and Bangladesh would march together to peace and prosperity. The two countries, she said, would share the burden of the oppressed humanity and create a new Asia for the future generation.

The Indian Prime Minister described Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as a leader of the oppressed people of the world and not of Bangladesh alone. She hoped that under the able leadership of the Bangabandhu Bangladesh would prosper and grow from strength to strength. She called upon the people of Bangladesh to strengthen the Bangabandhu’s hands in rebuilding the new born state.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman addressed the meeting early to welcome the quest. The meeting, the biggest ever in Dacca, was held at the Shahid Suhrawardy Udyan (former Race Course) on the Bangabandhu’s 53rd birthday.

Mrs Ghandhi said that her country would provide all possible assistance to Bangladesh in reconstructing the newly independent country. She however said that one should not be under the impression that with the achievement of independence all problems facing the country would be solved. She said that it was a gigantic task and it could be achieved through dedicated and selfless services of all.

To enjoy the fruits of independence, Mrs. Gandhi emphasised, every citizen would have to work with devotion. “It is a hard task.” she observed. Even then she said the people would have to achieve there goal by their dedicated services towards growing a happy society. She said that the independence would be meaningless unless people be provided with food shelter and education.

Bangladesh would have to stand on her own and chalk out her own plans and programmes to reach her goal. In this context Mrs. Gandhi quoted in Hindi the famous poem of Tagore (jodi tor dak shune kew na ashe tabe ekla chal re) and urged Bangladesh to go ahead alone even if responses to her needs were not forthcoming from any quarter.

Referring to the help and assistance given by India in the liberation struggle of Bangladesh and afterwards. The Indian Prime Minister said that her country did it for a cause, the cause of the oppressed humanity.

She said that the peoples of Bangladesh and India would march together and share burden of the oppressed humanity and help create a new Asia for the future generation.

The Indian Premier said that her country had no territorial ambition nor she did want to dominate over others. She said that it was India's interest that Bangladesh grew as a strong and powerful country.

She said that every country in the world should follow their own ideology, customs and traditions in building a happy and prosperous society.

Mrs. Gandhi said that Bangladesh and India had many identitical views on a number of national and international issues; but each country should follow its own path in establishing a happy society in their respective countries. The basis of friendship between the two countries, she said, should be on the basis of mutual respect for each other's views and policies.

Referring to the participation of Indian Army in the liberation war of Bangladesh. Mrs. Gandhi said that the Indian Army shed their blood in the soil of Bangladesh and their blood was mingled with that of the freedom fighters of Bangladesh. She said "this has strengthened our friendship."

Paying glowing tributes to the youths of Bangladesh-the valiant Mukti Bahini and the members of the Students League, she said the struggle of the brave sons of Bangladesh was crowned with success.

Recalling the early phase of the liberation struggle, Mrs. Gandhi said that the true followers of Sheikh Mujib had continued their struggle after Sheikh Mujib was arrested and taken to Pakistan. The followers of Sheikh Mujib, she said had set up their headquarters at Mujnibnagar and spread the message of the liberation struggle all over the world.

Mrs. Gandhi said that she was happy to note today that many of the countries were according recognition to Bangladesh, although some of them took indifferent attitude to the cause of the suffering humanity in Bangladesh at the initial stage. There were also many rich countries among them.

She said that at that critical hour, the people of India, who are themselves pior came forward to the help and assistance the oppressed people of Bangladesh.

In supporting the liberation struggle of Bangladesh and demanding release of Sheikh Mujib. India had incurred the displeasure of some countries but she remained firm in her stand, Mrs. Gandhi said.

The Indian Prime Minister cautioned that some forces were now active to drive a wedge between the India Bangladesh friendship. But they would fall in their sinister moves, she declared.

Speaking about her own country, she said that she was committed to remove poverty from India. She, however, said that it was not a task to be achieved overnight and her people had now realised it. Mrs. Gandhi said that people of India were now confident that poverty would be removed in due time.

Mrs. Gandhi began her speech first in Bengali. She said in Bengali that she had carried with her the love and affection of the

55 crore Indians for the people of Bangladesh. She said that it was an auspicious day because, the birthday of the Bangabandhu also coincided with her visit to Banglaedesh. At this point she recited a verse from Tagore. But then Apologising for her inability to speak in Bangali fluently she switched over to Hindi.

The national anthems of India and Bangladesh were rendered by a troupe of 125 vocal and instrumental artists when Indira Gandhi accompanied by the Bangabandhu went up the dais.

Sardar Swaran Singh also took his seat in the dais Begum Mujib with her youngest son Russel sat beside Mrs. Gandhi on the dais. The members of the Bangladesh cabinet took their seats on the dais which was tastefully decorated.

The Indian Premier concluded her 20 minute speech with the slogan of Bharat Bangladesh Moitri Zindavad and Bangladesher Neta Sheikh Mujib Zindabad.

“Bangladesh Observer”
Dacca, Saterday, 18th March, 1972

Friendships at all cost: Mujib

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman told the mammoth public meeting in Dacca on Friday that if needed the people of Bangladesh would not hesitate took give more blood to preserve their hard-earned independence.

The Bangabandhu, speaking at the meeting which was later addressed by Mrs. Indira Gandhi, said that his people were also ready to lay down their lives to maintain the friendship between India and Bangladesh. Lakhs of people who had converged at the Shahid Suhrawardy Udyan (former Race Course) to hear him and the Indian Prime Minister. Mrs. Gandhi, expressed their willingness by raising hands to make supreme sacrifice in preserving freedom and maintaining Indo- Bangladesh Friendship.

Expressing the gratitude of people of Bangladesh to the people of India and her Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, the Bangdhu

said that it was a great occasion for the Bangalis to find Mrs. Gandhi amidst them. The Bangabandhu said, “we are happy that we could bring the friend of the oppressed people here today”

The Bangabandhu further said that Mrs. Gandhi would not be able to stop her tears if she could see the marks of brutality of the Pakistani Army all over Bangladesh. But due to the disruption of communications Mrs. Gandhi could not be taken to other places.

He said that those of the Pakistan Army who were responsible for killings and other heinous crimes would be brought to Bangladesh from their present abode in P.O.W. camps in India.

Recalling the services rendered by the people of India and Mrs. Indira Gandhi for the cause of Bangladesh, the Bangabandhu said that he had nothing to offer to the Indian Prime Minister except the infinite love and affection of the seven and a half crore Bangalis.

The Bangabandhu said that Mrs. Gandhi was not only the leader of the biggest democratic country in the world; she was the acclaimed leader of the oppressed humanity. The Bangabandhu said that he would also work hand in hand with Mrs. Gandhi for the oppressed people.

The Bangabandhu said that the barbarous Pakistan Army devastated Bangladesh. They killed 30 lakh people, dishonored two lakh women, looted food godowns and destroyed industries. Even then their thirst for blood had not been quenched, he said. They were out to kill the four lakh Bangalis now trapped in Pakistan. The Bangalis were taken to the concentration camps. The Bangabandhu apprehended another genocide by Pakistan on the Bangalis and that in Pakistan.

However, the Bangabandhu said that the Bangalis did not believe in revenge. “We want to live in peace with others”, he added.

Lauding the role of Mrs. Indira Gandhi for the cause of Bangladesh, the Bangabandhu said that with motherly care she gave shelter to one crore displaced Bangalis. He said that India not

only fed the displaced persons at that time, she also contributed generously to Bangladesh after her liberation. He said that India gave monetary help, repaired damaged communication lines and also promised to give five lakh tons of foodgrains.

Speaking about the deep friendship between India and Bangladesh, the Bangabandhu said that some imperialist forces were trying to spread a propaganda that Indian Army would not leave Bangladesh so soon. He said that their motive had been frustrated; the Indian Army left Bangladesh ahead of schedule.

At the same breadth, the Bangabandhu said, "The Bangalis are not a coward people", they know how to stand against any oppression.

He cautioned the people that conspiracies were still going on to frustrate the hardearned independence of Bangladesh. The imperialist forces who opposed the liberation movement were still active, he observed.

The Prime Minister said that preservation of independence was a difficult as achieving it. He asked the people to be vigilant against conspiracies. If needed he said, the arms deposited by the people with the Government would be returned to them to maintain independence. Thirty lakh people had laid down their lives for achieving independence and to preserve it even one crore people would not hesitate to lay down their lives, he observed. The Bangabandhu said that some forces were instigating people on various issues. Major issues could not be solved overnight he said.

The Bangabandhu said that those who would try to create confusion among the people at this stage would be treated as Razzakar and Al Badr gangsters.

The Bangabandhu concluded his ten-minutes speech with the slogans of "Joy Bangla"; 'Joy Bharat', "Joy Indira" and "Bharat-Bangla Bandhutta Zindabad."

"Bangladesh Observer"

Dacca, Saterday, 18th March, 1972

Human Sea

Suhrawardy Udyan (formerly Race Course Ground) turned into a vast human sea on Friday. Hundreds of thousands of people from all work of life throughout Bangladesh converged into the Maidan to have a glimpse of Mrs. India Gandh, the Prime Minister of India, and express their gratitude to her.

Standing atop a 35 foot high boat-shaped "Yostrum Mrs. Indira Gandhi and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman addressed the mammoth gathering. The rostrum was named 'India Mancha'.

From early morning on the day people started to assemble at the Maidan. They came in processions, in buses and trucks, in rickshaws and on foot. By noon the whole Maidan was filled up , still countless human streams coming to it. A large number of blocks were created for the audience to maintain discipline in the historic meeting. Seating arrangement for 50,000 women in the Maidan was made. For the first time a public meeting in Dacca drew such a huge gathering of women audience. The women audience included a large number of Burqa-clad ladies from conservative Muslim families . Many of them were fairly old and came with their children.

Large number inscribing Various slogans were hung in the meeting place. Some of the slogans were: long life Indira-Mujib : long life Bharat-Bangladesh Maitri (friend ship); Joy Bangla Joy Bharat and great leader Indira-Zindabad. Four hundred loud Speakers were affixed on long bamboo poles. National Flags of India and Bangladesh flew on the rostrum.

Strict discipline was maintained althrough the meeting. With rapt attention and in pin drop silence the audience ence listened to Mrs. Indira Gandhi and the Bangladesh. The speeches of Mrs. Indira Gandhi and Sheikh Mujibur Rahman were punctuated by cheerful clappings and full throated Joy Bangla slogans. At one. stage when Mrs. Gandhi and Bangabandhu came to the Maiden at

about 3:30 p.m the crowed became almost uncontrollable as everyone was eager to have a glmipse of the two great leaders.

For the last few days people from distant arears of the country were started touring in the city to attend the meeting. Rail, road and river transports were heavily crowded. People availed even the roofs of the transports. By Friday hotel accommodation in the city was almost impossible to get. The enthusiastic people who had no kith and kin in the city passed their time on the verandahs of city dwellings and on the rail way platforms and terminals.

বাংলাদেশের তৎকালীন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের প্রধান মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর এবং তাঁহার বন্ধুত্বের হাত সম্প্রসারণ ঐ সময় বাংলাদেশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ছিল।

অভিমত ও সিদ্ধান্ত ঃ

রমনা রেসকোর্স ময়দান, বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৪৮ সন হইতে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত জনসভাগুলি এবং ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ঐ উদ্যানেই অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারী পক্ষে দাবী করা হইয়াছে যে উক্ত জনসভাগুলি এবং আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেই কারণে এই স্থানগুলি ২৪ অনুচ্ছেদে ব্যক্ত ঐতিহাসিক স্থান। কাজেই উক্ত স্থানগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করণ সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রতিবাদী সরকার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল মহোদয় দরখাস্তকারী পক্ষে উত্থাপিত দাবীর প্রতিবাদ করেন নাই, বরঞ্চ এক মত পোষণ পূর্বক সমর্থন করিয়াছেন।

বিশ্বের ইতিহাসের প্রতি দৃকপাত করিলে প্রতীয়মান হইবে যে সেই প্রাচীনকাল হইতে রাজা-বাদশাগণ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল স্থাপনা তদানীন্তন সভ্যতার সাক্ষ্য বা নিদর্শন হিসাবে রহিয়াছে এবং ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। এই

প্রসঙ্গে প্রাচীন মিশরের পিরামিড, স্ফিংস ও ফারাওদের মূর্তি, গ্রীক ও রোমক সভ্যতার বিভিন্ন স্থাপনা উল্লেখযোগ্য। আবার অনেক স্থাপনা রহিয়াছে যাহা রাষ্ট্র বা ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনে নির্মাণ করা হইয়াছিল কিন্তু পরবর্তীতে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। যেমন চীন দেশের সুদীর্ঘ প্রাচীর বা উত্তর ইংল্যান্ডের হ্যাড্রিয়ানের প্রাচীর। অনেক সময় সাধারণ স্থাপনাও প্রাচীনত্বের কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে, যেমন হরপ্পা-মহেন জো দাড়ো, রোমক লন্ডিভিয়াম (লন্ডন) এ খৃষ্টপূর্বের বিভিন্ন স্থাপনা। আমাদের দেশেও নরসিংদির নিকট প্রাপ্ত উয়ারী বটেশ্বর বা কুমিল্লার ময়নামতি বা বগুড়ার মহাস্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপনা আবিস্কৃত হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যেও বিভিন্ন স্থানে বিলুপ্ত নগারীর নিদর্শন পাওয়া যায়। হাজার হাজার বৎসর পূর্বের বিভিন্ন সভ্যতার সময় নির্মিত বিলুপ্ত নগারীগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অত্যন্ত যত্নের সহিত খনন করতঃ ইহাদের পুরাতন স্মৃতি পুনরুদ্ধার করিবার কার্যে নিয়োজিত। তাহাদের আবিস্কৃত একটি সাধারণ হাম্মামখানা বা স্নানাগারও ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে, কারণ ঐ স্নানাগারটি প্রমাণ করে যে ঐ সময়কার মানুষ পৃথক স্নানাগার ব্যবহার করিবার মত সভ্য ছিল।

বিশ্বের বহু জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের স্থানগুলি ঐতিহাসিক স্থান বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। ৬২৪ সনে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয় যে উক্ত যুদ্ধ মানব সভ্যতার ইতিহাস পরিবর্তন সাধন করিয়াছে কাজেই আবশ্যিকভাবেই উক্ত যুদ্ধ ঐতিহাসিক এবং যুদ্ধের স্থান একটি ঐতিহাসিক স্থান। ১০৬৬ সনে the Battle of Hastings এ William the Conquerer Saxon King Harold কে পরাজিত করিয়া ইংল্যান্ড দখল করেন। ঐ ঘটনা ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পরিবর্তন সূচনা করে। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের Hastings এর যে স্থানে King Harold চক্ষুতে তীরবিদ্ধ হইয়া ঘোড়া হইতে পতিত হন এবং মৃত্যু বরণ করেন, সেই স্থানটি ঐতিহাসিক স্থানরূপে চিহ্নিত রহিয়াছে।

১২১৫ সনে ইংল্যান্ডের রাণী মিড্ নামক স্থানে ইংল্যান্ডের রাজা John –II তাহার রাজ্যের জমিদার ও বিশপদের সহিত একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ইহাই পৃথিবী বিখ্যাত Magna Carta ।

বিশ্বের বহুস্থানে প্রিয়জনদের স্মৃতি রক্ষার্থে নৃপতিগণ বিশাল ও বিভিন্ন আকারের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সম্রাট শাহজাহান তাহার স্ত্রী মমতাজ

বেগমের স্মৃতি রক্ষার্থে তাজমহল নির্মাণ করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে শুধু মোগল সাম্রাজ্য নয় ইহা বিশ্ব সভ্যতার একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন।

ভাষণ সংক্রান্ত আলোচনায় বলা যায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ভাষণ হইল ৬৩২ সনে মক্কাশরীফের নিকটবর্তী আরাফাত ময়দানে হযরত মোহাম্মদ (দরুদ ও সালাম) প্রদত্ত বিদায় হজ্বের শেষ ভাষণ। ঐ ভাষণে তিনি মানব মুক্তির বাণী শুনাইলেন। ভাষণের শেষ ভাগে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহ আমি কি তোমার নির্দেশ যথার্থভাবে ঘোষণা করিয়াছি ?" সমবেত লক্ষাধিক উম্মত একবাক্যে আওয়াজ তুলিলেন, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর নবী !" ইতিহাস সৃষ্টি হইল। উপরোক্ত ভাষণ অতুলনীয় ও স্বর্গীয়।

ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করিলে আমরা দেখিব যে খৃষ্টের জন্মের ৩৯৯ বৎসর পূর্বে সক্রেটিস বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া হেমলক পানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এ্যাথেন্সবাসীদের সম্মুখে এক অবিস্মরণীয় ভাষণ প্রদান করেন। যাহা তিনি শেষ করেন "It is now time to depart, for me to die, for you to live. But which of us is going to a better state is unknown to everyone but God."

২৩ শত বৎসর পর ১৮৬১ সনে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৮৬৩ সনে Gettysburg শহরের নিকট এক যুদ্ধে ইউনিয়ন বাহিনী জয় লাভ করিলেও বহু সৈন্য প্রাণ হারায়। যুক্তরাষ্ট্রে তখনও কোন জাতীয় সমাধিক্ষেত্র ছিল না। Gettysburg শহরের এর একজন নামজাদা এ্যাটর্নি David Wills একটি জাতীয় সমাধিক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্ব প্রথম উপলব্ধি করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে Gettysburg যুদ্ধক্ষেত্রের একটি অংশ এই পবিত্র সমাধিক্ষেত্রের জন্য উৎসর্গ করা হইবে। এই উৎসর্গ উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান বক্তা Edward Everett কে প্রধান বক্তা হিসাবে মনোনীত করা হয়। ১৯শে নভেম্বরে উৎসর্গ অনুষ্ঠানে তিনি সোয়া দুই ঘন্টা বক্তৃতা প্রদান করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে জাতীয় সমাধিক্ষেত্র আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করিবার পূর্বে 'a few appropriate remarks' প্রদান করিবার জন্য Abraham Lincoln কে আমন্ত্রণ জানান হয়। ক্যামেরাম্যান ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা সেট্ করিবার পূর্বেই তিনি তাহার ভাষণ শেষ করেন এই বলিয়া যে '....................that government of the people, by the people, for the people, shall not perrish from the earth.

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের কারণে Abraham Lincoln যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সর্বত্রই প্রবলভাবে সমালোচিত হন। কিন্তু পরবর্তীতে সকলে তাঁহার বক্তৃতার গুরুত্ব ও মর্মার্থ উপলব্ধি করিয়া শিহরিত হয়। ভাষণটি ঐতিহাসিক গুরুত্বলাভ করে এবং ইতিহাসে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে Gettysburg জাতীয় সমাধিক্ষেত্র ঐতিহাসিক স্মৃতি নিদর্শনে পরিণত হয়। যে স্থানে Abraham Lincoln ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন সেখানে তাঁহার একটি আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ করতঃ বিশাল একটি স্মৃতিসৌধ গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সেইস্থানে পূর্ণ ভাষণটি মুদ্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা এখন বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে।

প্রায় একশত বৎসর পর, ওয়াশিংটনের Lincoln Memorial এর সম্মুখে ১৯৬৩ সনে ২৮শে অগাস্ট তারিখে Rev. Martin Luther King, JR. এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় বলেন ‘ I have a dream that one day this nation will rise up and ....’। নিঃসন্দেহে ইহা একটি ঐতিহাসিক ভাষণ।

উপরে বিভিন্ন স্থাপনা, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন ভাষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত স্থাপনাগুলি যখন নির্মাণ করা হয় তখন সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিই মনে করেন নাই যে তাঁহারা ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছেন বা তাঁহাদের কর্ম ঐতিহাসিক। তাঁহাদের কার্যের বহু পরে পৃথিবীর সভ্যতার উপর সংশ্লিষ্ট কর্মের প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া ঐতিহাসিকগণ ঐগুলিকে ঐতিহাসিক গণ্য করিয়াছেন। এইভাবেই যুগে যুগে বিভিন্ন স্মৃতি নিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহ ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ঐতিহাসিক স্থান বা সমাধি সৌধ সংরক্ষণ সম্বলিত কোন অনুচ্ছেদ বা বিধান না থাকিলেও প্রায় প্রতিটি ষ্টেট্ এই সংক্রান্ত আইন পাশ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, ১৮৯৫ সনে কংগ্রেস Gettysburg National Military Park আইন প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশে সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদ ব্যতিরেকে তেমন কোন আইনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

পূর্বে স্মৃতিসৌধ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক অথবা শৈল্পিক তাৎপর্যমন্ডিত বস্তু রক্ষার্থে Ancient Monuments Preservations Act, 1904 (Act VII of 1904) ছিল। পরবর্তীতে

The Antiquities Act, 1968 (Act XIV of 1968) প্রণীত হয়। উক্ত আইন পাকিস্তানের ১৯৬২ সনের সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদের আওতায় প্রণীত হইয়াছে বলিয়া প্রস্তাবনায় বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা ভ্রমাত্বক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

বর্তমান রীট্ মোকাদ্দমায় সর্বমোট ৫টি ভাষণ ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। রমনা রেসকোর্স ময়দান, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই উক্ত ভাষণগুলি প্রদান করা হইয়াছিল। দরখাস্তকারীপক্ষে প্রার্থনা করা হয় যে একটি কমিটি মারফৎ উক্ত ভাষণ প্রদানের স্থানগুলি চিহ্নিত করতঃ ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ আন্তর্জাতিক মানে নির্মাণ করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করা।

প্রথমেই ১৯৪৮ সনের ২১ শে মার্চ তারিখে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র ভাষণ। জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান অর্জন সম্ভব হইয়াছিল। তাহাকে মাত্র এক নজর দেখিবার জন্য রমনা রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমাগম হইয়াছিল। জিন্নাহ নূতন দেশ পাকিস্তান সম্বন্ধে কিছু নীতি নির্ধারণী বক্তব্য প্রদান করেন কিন্তু তিনি যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা শুধুমাত্র উর্দু হইবে বলিয়া ঘোষণা প্রদান করেন তখন উপস্থিত বিশাল জনতা স্তম্ভিত হইয়া যায়।

উল্লেখ্য যে বাঙালি মুসলমানগণের ভোটের শক্তিদ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানগণের স্বার্থ রক্ষিত হইত। ১৯৪০ সনে সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ হইতে নির্বাচিত একমাত্র বাঙ্গলার বাঙালি প্রধানমন্ত্রী শেরে ই বাঙ্গলা এ কে ফজলুল হক বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব আনয়ন করেন। ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে পাকিস্তান ইস্যুতে বাঙ্গলার মুসলমানগণ ৯৭% ভোট মুসলিম লীগকে প্রদান করে। একইভাবে ১৯৪৬ সনে ভারতবর্ষে একমাত্র নির্বাচিত বাঙ্গলার আর এক প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী দিল্লী কন্ভেনশনে একক পাকিস্তানের প্রস্তাব রাখেন। পাকিস্তান স্বাধীন হইবার পর Constitutent Assembly তে পূর্ববঙ্গের অংশ হইতে ৬টি সদস্য পদ অবাঙালিদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তানের ৫৬% অধুষ্যিত জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাঙ্গলা ভাষাকেও পরিত্যাগ করিবার ঘোষণা শুনিয়া বাঙালি মানসে ৫০ বৎসর স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বিশাল একটি ধাক্কা খায়। স্বপ্নের পাকিস্তান সম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণা ছিল তাহাতে এই প্রথমবারের মত একটি মারাত্মক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া (Negative

impact) সৃষ্টি করে। এই ঘটনা হইতেই ভাষা আন্দোলন কোবান হয় পরবর্তীতে স্বায়ত্বশাসনের দাবী স্বাধীনতার দাবীতে পরিণত হয়।

এই সকল কারণে বাঙ্গালাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৮ সনের ২১ শে মার্চ তারিখে তদানীন্তন রমনা রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত জিন্নাহর ভাষণের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য রহিয়াছে।

তৎপর, ১৯৬৯ সনের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণকে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার পর হইতে এ দেশে কোন দিনই গণতন্ত্র চর্চা হয় নাই। জোড়াতালি দিয়া ১৯৫৬ সনে একটি সংবিধান রচিত হইল বটে কিন্তু দুই বৎসরের মাথায় দেশে প্রথম মার্শাল ল জারী হওয়ায় গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়। দেশে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হয় পূর্ববঙ্গের ন্যায্য অংশ প্রাপ্তির আশা। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৬ সনে শেখ মুজিব পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন পাইবার দাবী সম্বলিত ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন দুর্বার ভাবে গড়িয়া তোলেন। আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষায় ইহার জবাব দিবার হুঙ্কার প্রদান করেন। শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় এক নম্বর আসামি করা হয়, প্রমান হইলে যাহার শাস্তি ছিল মৃত্যু। বাঙ্গালার মানুষের প্রবল আন্দোলনের মুখে উক্ত মামলা পাকিস্তান সরকার প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়। শেখ মুজিব ১৯৬৯ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ লইয়া একটি ইউনিট করতঃ পূর্ব বাঙ্গালার সংখ্যা গরিষ্ঠতা খর্ব করা হইয়াছিল। ২৩শে ফেব্রুয়ারিতে রমনা রেসকোর্স ময়দানে তিনি এই সর্ব প্রথম জনসংখ্যার ভিত্তিতে (adult franchise) প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ নির্বাচন দাবী করেন। তিনি উভয় প্রদেশের মধ্যে পূর্বে আরোপিত সংখ্যা সাম্য বাতিল দাবী করেন এবং ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের দাবী জানান। উক্ত ভাষণেই তিনি ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবের আঙ্গীকে সর্ব প্রথম পাকিস্তানে কনফেডারেশনের ইঙ্গিত প্রদান করেন।

১৯৪৬ সনে অনুষ্ঠিত দিল্লী কনভেনসন হইতে একক পাকিস্তানের যে ভাবধারায় পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছিল ১৯৬৯ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের ভাষণ তাহা হইতে সম্পূর্ণ এক নূতন দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এই প্রথম পূর্ববঙ্গের সংখ্যা গরিষ্ঠতার

অধিকারের দাবী প্রবলভাবে উত্থাপিত হইল। এই সকল কারণে বাঙ্লার প্রেক্ষাপটে ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য রহিয়াছে।

তৎপর আমরা ১৯৭১ সনের ৩রা জানুয়ারি তারিখের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোকপাত করিব।

আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সনের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগ কর্তৃক দাবীকৃত পাকিস্তান ইস্যুর ন্যায় ১৯৭০ সনের নির্বাচনে ৬ দফা দাবী ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচন ইস্যু। এই ৬ দফার দাবীর ভিত্তিতেই পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশের জন্য দাবী করা হইয়াছিল। আওয়ামী লীগের এই বিশাল নির্বাচনী বিজয় ৬ দফার প্রতি এইদেশের মানুষের নিরংকুশ সমর্থন বলিয়া পরিগণিত হয়। কাজেই রাজনৈতিক দল হিসাবে ৬ দফা কার্যকর করণ এবং ৬ দফার ভিত্তিতেই সংবিধান প্রণয়ন আওয়ামী লীগের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সন হইতেই পাকিস্তানের রাজনীতি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে মসিলিপ্ত ছিল। এমনকি ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের ভূমিধ্বস বিজয়ের পরেও তদানীন্তন পূর্ব বাঙ্লায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা সম্ভব হয় নাই, অতি স্বল্পকাল মধ্যেই গভর্ণরের শাসন পূর্ব বাঙ্লায় আরোপ করিয়া গণতন্ত্র চর্চা পুনরায় নসাৎ করা হয়। এই সকল কারণেই শেখ মুজিব তাঁহার প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় ষড়যন্ত্র হইতে সাবধান করিয়াছেন।

১৯৭০ সনের নির্বাচনের সময় ও পরে মার্শাল ল চলিতেছিল। তাহার পরেও আওয়ামী লীগের এইরূপ ভূমিধ্বস নির্বাচনী বিজয় পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে ৬ দফা ও আওয়ামী লীগ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া তোলে। আওয়ামী লীগ নেতৃও উপলব্ধি করিতে পারে যে সামরিক জান্তা যে কোন উপায়ে এদেশের মুক্তি সূত্র ৬ দফা দাবীকে প্রতিহত করিতে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতে পিছপাও হইবে না।

এমত অবস্থায় আওয়ামী লীগ হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ যেন ৬ দফা দাবীর অঙ্গীকার হইতে কোন ভাবেই বিচ্যুৎ না হইতে পারেন সে কারণে প্রকাশ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে সকল নেতৃবৃন্দ ৬ দফাকে সমুন্নত রাখিবার জন্য শপথ গ্রহণ করেন।

এই শপথ গ্রহণের মাধ্যমে বাঙালির নিকট প্রতিশ্রুত ৬ দফা দাবী হইতে বিচ্যুৎ হইবার সকল পথ শেখ মুজিব সজ্ঞানে বন্ধ করেন।

৬ দফা দাবীর ব্যাপারে যে কোন প্রকার সমঝোতার অবকাশ নাই তাহা তিনি সকলকে পরিস্কার ভাবে উপলব্ধি করান।

এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর সামরিক জান্তা প্রমাদ গোনে যে ৬ দফা দাবী গৃহীত হইলে পাকিস্তান রাজনীতিতে তাহাদের প্রাধান্য লোপ পাইবে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর সামরিক জান্তা যে তাহার উপর ক্ষিপ্ত হইবে তাহা শেখ মুজিব ভালভাবেই জানিতেন কিন্তু তাহার পরেও এই পদক্ষেপ ইচ্ছাকৃত ভাবে গ্রহণ করিয়া ৬ দফা দাবীকে একটি point of no return পরিস্থিতিতে লইয়া আসেন যাহাতে হয় ৬ দফা পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতঃ বাঙ্গলা সম্পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন প্রাপ্ত হইবে অথবা ৬ দফা ১ দফায় পরিণত হইবে। তিনি এই ভাবে জনগণকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করিতে ছিলেন।

প্রকৃত পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক তাহাদের দাবী লইয়া এইরূপ প্রকাশ্য শপথ গ্রহণ করিবার কোন নজির পৃথিবীর রাজনীতির ইতিহাসে আর নাই। এখানেই এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক চরিত্র।

ইহার পর আসে ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ তারিখের ভাষণ প্রসঙ্গ। নিঃসন্দেহে ইহা পৃথিবী অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ।

১লা মার্চ তারিখে ৩রা মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জনগোষ্ঠি উপলব্ধি করে যে ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন সূদূর পরাহত। মূহুর্তে জনগণ নিজেরাই স্বতস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার দাবী লইয়া রাস্তায় নামিয়া আসে। এখানেই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক কৃতিত্ব ও সাফল্য। গত দুই যুগ ধরিয়া তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে যেভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রত্যাশা মতে বাঙালি সাধারণ জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা দাবী করিল।

এই দাবীর প্রেক্ষাপটে বিগত ২৩ বৎসরের বঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা করতঃ শেখ মুজিব ঘোষণা করিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সামরিক জান্তাকে সতর্ক হইবার সুযোগ না দিয়াই তিনি বাঙ্গলার জনগণকে এইভাবে স্বাধীনতার ডাক দিলেন।

"Friends, Romans, countrymen, lend me your ears;

....

Put a tongue.

In every wound of caesar, they should move.

The stones of Rome to rise and mutiny.”

নিঃসন্দেহে ইতিহাস সৃষ্টি হইল।

এবার ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি সভা প্রসঙ্গ। ১৯৭১র সনের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হইল। কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান তখনও পাকিস্তানের এক জেলখানায় ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসাবে অন্তরীণ ছিলেন। বিজয় হইয়াও বিজয় সম্পূর্ণ হয় নাই।

সমগ্র বিশ্বের চাপে অবশেষে পাকিস্তান সরকার ১৯৭২ সনের ৮ই জানুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবকে মুক্তি দান করিয়া লন্ডনে প্রেরণ করে। ১০ই জানুয়ারি তিনি দিল্লী হইয়া ঢাকায় আগমণ করেন। দিল্লী বিমান বন্দরে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে বাংলাদেশের জাতির জনক হিসাবে স্বাগত জানান।

দ্বিপ্রহরে ঢাকা বিমান বন্দরে তিনি আগমন করিলে স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ জনতা তাহাদের রাষ্ট্রপতিকে অতুলনীয় এক প্রাণ ঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। বাংলার বিজয় এইবার সম্পূর্ণ হয়।

উল্লেখ্য যে বাঙালির সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, কৃষ্টি, সর্বোপরি ইতিহাস যাহা একটি জনগোষ্ঠিকে জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেয় তাহার সব কয়টি উপাদান থাকা সত্বেও পাকিস্তান সামরিক জান্তা সবসময় বাঙালির জাতিস্বত্তা অস্বীকার করতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনী হিসাবে এই প্রদেশকে ব্যবহার করিত। শেখ মুজিব তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ হইতেই এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তৎপর ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনের দাবী ও তৎপর তাঁহার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।

বিমান বন্দর হইতে তিনি সরাসরি রমনা রেসকোর্স ময়দানে আগমন করেন। সেখানে অপেক্ষামান লক্ষ জনতার সম্মুখে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হিসাবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শ ঘোষণা করেন। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্তীতে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়।

বাংলার মানুষের এই নিখাদ প্রাণঢালা ভালবাসা এবং এই বিজয়ের মাধ্যমে ৭ই মার্চের 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই ঘোষণার সাফল্য মন্ডিত বিজয় ঘোষণা এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যত রূপরেখা ঘোষণা সম্পর্কিত ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারির জনসভা ও ভাষণ উভয়কেই ঐতিহাসিক তাৎপর্য প্রদান করিয়াছে।

অতঃপর, ১৯৭২ সনের ১৭ই মার্চের জনসভা। ঐদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকা আগমন করেন এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ প্রদান করেন।

১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে যখন মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন বাংলাদেশ ছিল সম্পূর্ণ একাকী। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে নিপীড়িত জনগণ বাংলাদেশের তিন দিকে অবস্থিত ভারতীয় প্রদেশগুলিতে প্রকৃত অর্থে নিঃস্ব অবস্থায় আশ্রয় লইতেছিল। ঐ সময় পাকিস্তান সামরিক জান্তার প্রবল প্রতিবাদের মুখেও ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার আর্তমানবতার ডাকে সাড়া দিয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করেন। বাংলাদেশের বক্তব্য উপস্থাপন এবং শেখ মুজিবের জীবন রক্ষা করিবার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তিনি ছুটিয়া বেড়ান। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তদানীন্তন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের পক্ষে তাঁহার বক্তব্য শুধু অগ্রাহ্য নয়, তাঁহাকে অবমাননাও করে। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের জন্য সেই অবজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের নিকট আবেদন রাখেন।

দুইশত বৎসর পূর্বে ফ্রান্স যে ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করিয়াছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও ভারত সরকার অনুরূপ সহায়তা প্রদান করে। প্রকৃত পক্ষে বাঙালি শরণার্থীগণের জীবন রক্ষা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অবদান অপরিসীম। উল্লেখ্য যে ভারত সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আরও উল্লেখ্য যে ইন্দিরা গান্ধীই প্রথম সরকার প্রধান যিনি বাংলাদেশে আগমন করেন।

তাহা ছাড়া, ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মাটিতে উপস্থিত হইবার পূর্বেই ১২ই মার্চ তারিখের মধ্যে মিত্র বাহিনীর শেষ সৈনিকটিও প্রত্যাবর্তন করে। ইন্দিরা গান্ধী কথায় ও কাজে ভারতকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু দেশ হিসাবে উপস্থাপন করিতে সক্ষম হন।

১৭ই মার্চ তারিখে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ মুজিবের স্বাগত ভাষণের উত্তরে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বিকশিত হইবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রকৃত পক্ষে ইন্দিরা গান্ধীর ঢাকায় আগমন এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে।

অতঃপর আমরা ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের বিজয় দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করিব।

২৬শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মাধ্যমে তাহা পূর্ণতা লাভ করে। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইতিহাসে উপরোক্ত দুইটি তারিখ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দুইটি তারিখই নিঃসন্দেহে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পশ্চিম রণাঙ্গণের যুদ্ধ জার্মানীর আত্মসমর্পনের মধ্যে সমাপ্ত হয়। তবে উক্ত আত্মসমর্পন অনুষ্ঠান ১৯৪৫ সনের ৭ই ও ৮ই মে তারিখে দুই দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই মে তারিখে ফ্রান্সের Rheims শহরের একটি স্কুল গৃহে জার্মানীর General Alfred Jodl আত্মসমর্পন দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কথায় পুনরায় ৮ই মে তারিখে বার্লিন শহরে আর একটি আত্মসমর্পন দলিল স্বাক্ষরিত হয়। এইবার জার্মান পক্ষে স্বাক্ষর করেন Field Martial Wilhelm Keital ও অন্য দুইজন। এই ঘটনাই ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবে স্হান করিয়া লইয়াছে। তবে ২য় মহাযুদ্ধ ও ইহার সমাপ্তির ইতিহাস শুধুমাত্র উপর্যুক্ত এই দুইদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের ঐতিহাসিকগণ ২য় মহাযুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া আবশ্যিক ভাবেই লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষের হত্যা যজ্ঞের বিবরণ প্রদান করিতে মোটেই কার্পণ্য করেন নাই। তাহারা যুদ্ধ জয় হইতে আর্ত মানবতার ধ্বংস লীলার বর্ণনা অকৃপণভাবে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহারা পোলান্ডে ও জার্মানীতে অনুষ্ঠিত Holocaust এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়া ইহাকে মানব সভ্যতার বর্বরতার ঐতিহাসিক নজীর হিসাবে উপস্হাপন করিয়াছেন। জার্মানী ও পোলান্ডে অবস্থিত অসংখ্য বধ্যভূমির উপর নির্মিত সমাধি সৌধগুলি সেই বর্বরতার চাক্ষুস ইতিহাসকে এখনও নগ্নভাবে প্রদর্শন করিয়া যাইতেছে এবং মানব সভতার নেতিবাচক দিকগুলিকে প্রকট ভাবে প্রতিফলিত করিতেছে। নিহত লক্ষ লক্ষ

অত্যাচারিত মানুষকে তাহারা অবহেলা বা অপমান না করিয়া তাহাদিগের মৃত্যুকে একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য প্রদান করিয়াছে। এমনকি একটি ১২ বৎসরের বালিকার কাঁচা হাতে লেখা ডায়েরীও ইতিহাসের অমূল্য সম্পদের মর্যাদা পাইয়া বিশ্বের প্রায় সকল প্রধান ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ২য় মহাযুদ্ধের সময় এ দেশেও যে সকল সৈন্য মৃত্যুবরণ করিয়াছিল ব্রিটিশ সরকার তাহাদের জন্যও সমাধি সৌধ নির্মাণ করিয়া এখনও রক্ষণাবেক্ষন করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে, ২য় মহাযুদ্ধে যাহারা প্রাণ হারাইয়া ছিলেন সেই সকল দেশের সরকার বিশ্বের সর্বত্র তাহাদের স্মৃতি সংরক্ষণ করিবার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও তাহাদের অনুগামীগণ যে অত্যাচার, নিপীড়ন, বর্বরতা প্রদর্শন করিয়াছে তাহা জেনারেল নিয়াজীর স্বীকৃত মতেই বুখারা ও বাগদাদে যথাক্রমে চেঙ্গীস খান ও হালাকু খানের বর্বরতার সঙ্গে তুলনীয়। ইহার সামান্য নজির হিসাবে উপরে কিছু বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে বটে কিন্তু প্রকৃত বর্বরতার ইহা খন্ডিতাংশ মাত্র।

ইহা স্বীকৃত সত্য যে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বহু জায়গায় গণহত্যা ও বধ্যভূমি রহিয়াছে। ইহার সামান্য কয়েকটির বিবরণ, যেমনঃ চুকনগর, পাহাড়তলী, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা উপরে প্রদান করা হইয়াছে।

এই সকল লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ ও হতভাগ্য মানুষের কংকালের উপর বিজয় দিবসের মঞ্চ স্হাপিত। আমরা তাহাদের স্মরণ করি বা না করি, সম্মান করি বা না করি তাহারা তাহাদের জীবন দিয়া ইতিহাসে স্হান করিয়া লইয়াছেন। শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা নয়, এই লক্ষ লক্ষ কংকালও ইতিহাস। তাহাদের অবহেলা করিয়া স্বাধীনতার কোন ইতিহাসই লেখা সম্ভব নয়। তাহাদের আর্তনাদকে অস্বীকার করিয়া কোনও বিজয় দিবস সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তাহারা তাহাদের রক্ত দিয়া, সম্ভ্রম দিয়া বিজয় দিবসের ইতিহাসের অংশ হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের অস্বীকার করিলে বাঙালি জাতি কৃতঘ্ন জাতিতে পরিণত হইবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একদিন উক্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন করিবার স্হান পরিদর্শন করিয়া বিপন্ন বিস্ময়ে গর্ববোধ করিবে যে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ এই বাংলাদেশ স্বাধীন করিবার জন্য তাহাদের জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গর্ববোধ করিবে

যে, আজ যে স্বাধীনতার সূর্য বিরাজমান তাহা তাহাদেরই অবিস্মরণীয় দান। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও উপলব্ধি করিবে যে, মুক্তিযোদ্ধাগন যে আদর্শের জন্য তাহাদের নিজেদের প্রাণ অম্লাণ বদনে বিসর্জন দিয়াছেন সেই আদর্শ অবশ্যই সমুন্নত রাখিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য বাংলাদেশের সকলের। তাহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মুক্তিযোদ্ধাগণ সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে তাহাদের জন্যই বাংলাদেশ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধাগণের সেই অতুলনীয় ত্যাগের দান-গ্রহিতা মাত্র। এই কারণেই যে সকল আদর্শের ভিত্তিতে এই বাংলাদেশ সৃষ্টি হইয়াছে, সে আদর্শ পরিবর্তন করিবার অধিকার কাহারো নাই। কারন এই দেশ অন্য কেহ সৃষ্টি করে নাই। এই দেশ মুক্তিযোদ্ধাগণ তাঁহাদের রক্তের বিনিময়ে সৃষ্টি করিয়াছেন। মুক্তিযোদ্ধাগণ স্বাধীনতা অর্জন করিয়া ভবিষ্যৎ প্রকৃত মুক্তির পথ-নির্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং প্রকৃত মুক্তি অর্জন করিবার দায়বদ্ধতা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর অর্পন করিয়া গিয়াছেন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের বিভিন্ন স্হানে পদচারনা করিয়া পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার মাত্র সাত মাস পর হইতে কিভাবে ধাপে ধাপে প্রথমে মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম, তৎপর স্বায়ত্বশাসনের জন্য সংগ্রাম, তৎপর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ এই দেশ স্বাধীন করিয়াছেন যেখানে তাহারা এখন গর্বিত বাঙ্গালি পরিচয়ে পদচারনা করিতেছে তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের এই গৌরবময় ইতিহাস জানিতে পারিয়া নিজেদেরকে একটি গর্বিত জাতির নাগরিক হিসাবে গর্ববোধ করিবে।

তাহারা এই সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে পদচারনা করিয়া বাঙ্গালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানিতে পারিয়া বিশ্বের আরো অনেক স্বাধীন দেশের নাগরিকদের ন্যায় অহংকার বোধ করিবে। তাহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের পিছনে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাদের কথা স্মরণ করিয়া প্রেরণা লাভ করিবে এবং মুক্তিযুদ্ধের কষ্টি পাথরে নিজেদের উৎস উপলব্ধি করিবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁহাদের পূর্বপুরুষগানের এই মহান কীর্তি স্মরন করিয়া বিজয় দিবসের স্মৃতিসৌধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবি শামসুর রহমানের সহিত উপলব্ধি করিবে ঃ

> "স্বাধীনতা তুমি
> রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
> স্বাধীনতা তুমি

কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা-
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি

এই প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্হানে অবস্হিত মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিক্ষেত্র এবং বধ্যভূমি চিহ্নিত করতঃ সংরক্ষণ করিবার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে নির্দেশ প্রদান করা হইতেছে। এই সকল বধ্যভূমি আমাদের মুক্তি যুদ্ধের সাক্ষ্য হিসাবে সমুন্নত থাকিবে। শতবর্ষ পরে হইলেও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই বধ্যভূমির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত তাহাদের পূর্বপুরুষগণের আত্মত্যাগকে সম্মান প্রদর্শন করিবে। এই সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তাহারা একটি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এই সকল বধ্যভূমির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপলব্ধি করিবে যে মুক্তিযোদ্ধাগণের রক্তের বিনিময়ে, সম্ভ্রমের বিনিময়ে তাহারা আজ গর্বিত জাতি। তাহারা স্মরণ করিবে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীরমদন, মোহনলালকে; তাহারা স্মরণ করিবে তীতুমীর, প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম, মাষ্টারদা সূর্য্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, ইলা মিত্রকে, তাহারা নীরবে স্মরণ করিবে আরো অসংখ্য নাম না জানা মুক্তিযোদ্ধাদের, তাহারা মনে মনে বলিবে --চুপ ! আস্তে ! ! খুব আস্তে, ধীরে, ‘ তিষ্ঠ ক্ষণকাল; এই স্হানে আমাদের বীরগণ চিরনিদ্রায় শায়ীত !! আমরা ভুলি নাই, আমরা তাহাদের আত্মত্যাগের কথা ভুলি নাই !! ভুলিতে পারি না !!

তাহা হইলেই শুধুমাত্র সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদের স্বার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

নিঃসন্দেহে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং যেস্থানে উক্ত অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেইস্থান ঐতিহাসিক স্থান। তাহাছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র যে সকল বধ্যভূমিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাহাদের ঘৃনিত অনুগামী শত শত নিরাপরাধ মানুষকে খুন করিয়াছিল সেই সকল বধ্যভূমিও ইতিহাসের অন্তর্গত, ঐতিহাসিক স্থান।

বর্তমান মোকাদ্দমায় আবশ্যিক ভাবেই বাংলাদেশ সৃষ্টির পটভূমি সম্পর্কে বেশ কিছুটা আলোকপাত করা হইয়াছে। এই সকল বর্ণনার বেশীরভাগ উপাদান বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র" এর ১৫ খন্ড সিরিজ গ্রন্থ এবং সংশ্লিষ্ট বহু পুস্তক ও তৎকালীন সংবাদ পত্র হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই রায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে ইহা একটি জনস্বার্থমূলক রীট্ মোকাদ্দমা। শুধু তাহাই নহে ইহা একটি ব্যতিক্রমধর্মী রীট মোকাদ্দমাও বটে। এই মোকাদ্দমার বিষয়বস্তু ও প্রার্থনার সহিত আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও আকো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে।

যে কোন একটি সাধারন মোকাদ্দমার আর্জি বা রীট্ মোকাদ্দমার দরখাস্তে বাদী বিবাদী বা দরখাস্তকারী ও প্রতিবাদীগণের সংশ্লিষ্ট অতীত ইতিহাস ও কার্যক্রম বর্ণনার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কারণ উক্ত ইতিহাস বর্ণনা ও পর্যালোচনা ব্যতিরেকে বাদী বিবাদী বা দরখাস্তকারীর বিরোধীয় বিষয় মামলার কারণ এবং ঈপ্সীত প্রতিকার কখনোই প্রদান করা আদালতের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বর্তমান ক্ষেত্রেও এই ব্যতীক্রমধর্মী রীট্ মোকাদ্দমার দরখাস্তকারীগণ এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে দাবী ও প্রার্থনা করিয়াছেন যাহার সহিত বাংলাদেশের ইতিহাস অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। এই জন্যই প্রকৃত প্রেক্ষাপটে দরখাস্তকারীর আবেদন হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজনে বাংলাদেশের ইতিহাস ও প্রার্থীত প্রতিটি তারিখের ভাষণ এবং অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও তাৎপর্য বিবেচনা করিবার জন্য আবশ্যিকভাবেই বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ইতিহাস পর্যালোচনা প্রয়োজন হইয়াছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইতিহাসও প্রেক্ষাপট আলোচনা ব্যতিরেকে এই রীট্ মোকাদ্দমার দরখাস্তকারীগণের বক্তব্য সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইত না। এখানে উল্লেখ্য যে বিশ্ববিখ্যাত Jurist ও যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি Justice Oliver Wendell Holmes ইতিহাস প্রসঙ্গে বলিয়া ছিলেন, "A page of history is worth a volume of Logic."

এ কারণেই যেমন একটি সাধারন মোকাদ্দমার বাদী বিবাদীর দাবীর পিছনের ঘটনাগুলি পূর্বাপর বর্ণনা করিতে হয় তেমনি বর্তমান রীট্ মোকাদ্দমায়ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সময়ের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে ১৯৪৮ সনের ২১ শে মার্চ তারিখে প্রদত্ত জিন্নাহ্‌র ভাষণ, ১৯৬৯ সনে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত শেখ মুজিবের ভাষণ, ৭ই মার্চের ভাষণ, ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারিতে প্রদত্ত শেখ মুজিবের ভাষণ এবং ১৭ই মার্চ তারিখে প্রদত্ত শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। উপর্যুক্ত প্রতিটি ভাষণ রমনা রেসকোর্স ময়দান, বর্তমান সোহ্‌রোয়ার্দী উদ্যানে প্রদান করা হইয়াছিল। তাহাছাড়া, ১৯৭১ সনের ৩রা জানুয়ারি তারিখের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানও সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিটি অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ও তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য যে সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের উপরোক্ত প্রতিটি স্থান রক্ষা করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করিয়াছে।

রমনা তথা সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান এলাকা নিছক একটি এলাকা নয়। এই এলাকাটি ঢাকা শহর পত্তনের সময় হইতেই এ পর্যন্ত একটি বিশেষ এলাকা হিসেবে পরিগণিত হইয়াছে এবং ইহার একটি ঐতিহাসিক ও পরিবেশগত ঐতিহ্য আছে। শুধু তাহাই নয়, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র এই এলাকা। এই পরিপ্রেক্ষিতেও সম্পূর্ণ এলাকাটি একটি বিশেষ এলাকা হিসাবে সংরক্ষণের দাবী রাখে। এখানে এমন কোন স্থাপনা থাকা উচিত নয় যাহা এই এলাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য বিন্দুমাত্র কে ম্লান করিতে পারে। পরিবেশগত দিক হইতে তাহা আরও বিধেয় নয় কারণ রমনার উদ্যান বা রমনা রেসকোর্স ময়দান ঢাকা শহরের দেহে ফুসফুসের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। কোনভাবেই ইহাকে রোগাক্রান্ত করা যায় না।

যেহেতু স্মরণ কাল হইতেই ইহা উদ্যান হিসাবে পরিচিত সেইহেতু ২০০০ সনের ৩৬ নং আইন অনুসারে সোহ্‌রাওয়ার্দী 'উদ্যান' সংজ্ঞার আওতাধীন এবং এই জায়গার শ্রেণী সাধারণভাবে অপরিবর্তনীয়। ইহাকে অনাবশ্যক স্থাপনা দ্বারা ভারাক্রান্ত করা অবৈধ হইবে।

এই সকল কারণে উক্ত উদ্যান হইতে সকল ধরণের স্থাপনা ও প্রতিবন্ধকতা অবিলম্বে অপসারণ করিবার দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতভাবে সরকারের উপর ন্যাস্ত।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হত্যাযজ্ঞের পর যে সকল স্থান বধ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছিল সেই সকল স্থানগুলিও মুক্তিযুদ্ধের পবিত্র স্মৃতিস্থান। স্তুপিকৃত কংকাল বিজয় দিবসকে সম্ভব করিয়াছিল। ঐ সকল বধ্যভূমিও সেই কারণে ঐতিহাসিক স্থান এবং সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদ ঐ সকল বধ্যভূমিগুলি রক্ষা করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করিয়াছে।

ইহা সত্য যে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ রাষ্ট্র পরিচালনা মূলসূত্র হইবে, কিন্তু এই সকল নীতি সাধারণতঃ আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নহে। কিন্তু কোন সরকার সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত মূলনীতি পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে না, করিলে আদালত অবশ্যই মূলনীতি সমুন্নত রাখিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাধ্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

আগ্রা শহরের বিভিন্ন স্থানে ৫১১ টি শিল্পকারখানা ছিল। উক্ত শিল্পকারখানাগুলি হইতে নির্গত পরিবেশ দুষক নির্গত কয়লার ধোঁয়া তাজমহলের মার্বেলের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা দিলে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট তাজমহলের অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া সংবিধানের সংশ্লিষ্ট মূলনীতি আরোপ করতঃ গ্যাস সংযোগ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ২৯২টি শিল্প কারখানা তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করে (M.C. Mehta V. Union of India, AIR 1997 SC 734) ।

বর্তমান দরখাস্তে ও মৌখিক বক্তব্যে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে যে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করিয়া উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন স্থান সমূহ বিকৃতি ও বিনাশ করা হইতেছে। সরকার পক্ষে এই অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারে নাই। এমত অবস্থায়, অত্র আদালত সংবিধানের ২৪ অনুচ্ছেদের আওতায় সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি হইতে সকল প্রকার স্থাপনা অপসারণ পূর্বক উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন ও তাৎপর্য মন্ডিত স্থান সমূহ রক্ষা করিবার জন্য সরকারের উপরে প্রাসঙ্গিক নির্দেশ প্রদান করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

একইভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বধ্যভূমি বেদখল, বিকৃতি বা বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিলম্বিত হইলেও রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হইল।

"The law hath not been dead, though it hath slept."

আদেশ ঃ

এইরূপ আইনগত অবস্থানে ১-৪ নং প্রতিবাদী সরকারকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহন করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইল ঃ

ক) এক বা একাধিক কমিটি গঠন মারফৎ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করণঃ

i) ১৯৪৮ সনের ২১ শে মার্চ তারিখে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ প্রদানের স্থান,

ii) ১৯৬৯ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ প্রদানের স্থান,

iii) ১৯৭১ সনের ৩রা জানুয়ারি তারিখে আওয়ামী লীগ দল হইতে জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদে নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের স্থান,

iv) ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ প্রদানের স্থান,

v) ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের স্থান,

vi) ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ প্রদানের স্থান,

vii) ১৯৭২ সনের ১৭ই মার্চ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ প্রদানের স্থান;

খ) এক বা একাধিক কমিটি গঠন মারফৎ নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করণঃ

i) সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বধ্যভূমি,

ii) বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর সৈনিকদের সমাধিক্ষেত্র ;

গ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হইতে বিদ্যমান সকল প্রকার স্থাপনা অপসারণ পূর্বক কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত স্থানগুলিতে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও বিবেচনা প্রসূত দৃষ্টি-নন্দন ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ করণ, তবে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের পূর্বের কোন স্থাপনা এবং বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত স্মারক, ভাস্কর্য, স্মৃতিফলক বা স্তম্ভ এই আদেশের আওতা বহির্ভূত হইবে, অন্য সকল স্থাপনা ব্যতিক্রমহীন ভাবে অবিলম্বে অপসারণ করিতে হইবে;

ঘ) কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত বধ্যভূমিগুলিতে মান সম্পন্ন ও বিবেচনা প্রসূত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ বা স্মৃতিফলক/ স্তম্ভ স্থাপন ও সংরক্ষণ করণ;

ঙ) কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর সৈনিকদের সমাধিগুলিকে মানসম্পন্ন ও বিবেচনা প্রসূত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ বা স্মৃতিফলক/স্তম্ভ স্থাপন ও সংরক্ষণ করণ ।

পর্যবেক্ষণ ঃ

দরখাস্তকারী ও প্রতিবাদী পক্ষে বক্তব্য শ্রবণকালে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হইয়াছে।

তিনি জাতির জনক। তাঁহার নামেই মুক্তিযোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধ করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিয়াছিল। তাঁহার সরকারই এই সকল পদক প্রবর্তন করিয়াছিল। তাঁহাকে এই পদক প্রদান করিয়া তাঁহাকে বরঞ্চ অবমূল্যায়ন করা হইয়াছে। তিনি সকল পদকের উর্দ্ধে।

"No ceremony that to great ones 'longs,

Not the Kings crown, nor the deputed sword."

বরঞ্চ সকল সেক্টর কমান্ডারগণকে তাহাদের বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ স্বাধীনতা পদক প্রদান করিতে আমরা সরকরের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।

১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ৯ (নয়) মাসে বাংলাদেশে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র বাঙালি হইবার কারণে চরম নির্যাতীত হইয়াছে এবং প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে তাহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখটি 'জাতীয় শোক দিবস' ঘোষণা করিবার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হইতেছে।

ইহাছাড়া, সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের যে অংশে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, উদ্যানের সেই অংশটিকে 'স্বাধীনতা উদ্যান' বা 'Liberty Square' নামকরণ করিবার জন্য আমরা সরকারকে আহ্বান জানাইতেছি।

উপসংহার ঃ

উপরোক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করতঃ অত্র রীট্ মোকাদ্দমায় জারীকৃত রুলটি এ্যাব্সলিউট্ করা হইল।

তবে এই রীট্ মোকাদ্দমাটি continuing mandamus হিসাবে অব্যাহত থাকিবে।

সমাপ্তি টানিবার পূর্বে .দরখাস্তকারীদ্বয়ের বিজ্ঞ এ্যাড্ভোকেট জনাব মনজিল মোরসেদসহ এই মোকাদ্দমায় অংশ গ্রহণকারী সকল এ্যাড্ভোকেট্ মহোদয়গণকে তাহাদের অবদানের জন্য সাধুবাদ প্রদান করা হইল।

এই রায়ের অনুলিপি অবিলম্বে ১-৪ নং প্রতিবাদী বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ঃ

আমি একমত।